ভারতীয় রহস্য

প্রথম খণ্ড।

আমার মহিষী।

নবাব রামহরি!

শ্রীভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রণীত।

"ত্বরিতগতির্ব্রজ যুবতী

তরণিসুতা, বিপিনগতা!

মুররিপুণা, রতিগুরুণা,

পরিরমিতা, প্রমদমিতা॥"

রাসলীলা।

কলিকাতা, ৪৬ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট হইতে

শ্রীসারদাপ্রসাদ নিয়োগী কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা।

মাণিকতলা ষ্ট্রীট—২৩নং যুগলকিশোর দাসের লেন।

নূতন বাল্মীকি যন্ত্রে

শ্রীউদয়চরণ পাল দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৪ সাল।

আমন্ত্রণ।

ভারতীয় রহস্যের প্রথম খণ্ড প্রচারিত হইল। এ খণ্ড যদি সাধারণের একটুও ভাল লাগে, দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশে বিলম্ব করা হইবে না। সেই খণ্ডে পাঠকমহাশয়েরা অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য, অনেক অপূর্ব্ব কৌতুকাবহ, অনেক শোকাবহ, দুঃখাবহ এবং মহিষী অপেক্ষাও নূতন নূতন কাণ্ড দেখিতে পাইবেন। শারদীয়া পূজার মধ্যেই পাঠকমহাশয়গণের অভিপ্রায় ও নামধাম জানিতে ইচ্ছা করি। প্রথম খণ্ড অপেক্ষা দ্বিতীয় খণ্ডের মূল্য অল্প হইবে।

এই এক নূতন!

বিলাতী গুপ্তকথা!!

অতিবড় নূতন আশ্চর্য্য!!!

হরিদাসের গুপ্তকথায় বাঙ্গালী হরিদাস দেখিতেছেন, বিলাতী গুপ্তকথায় বিলাতী হরিদাস পাইবেন। বাঙ্গালী হরিদাস অপেক্ষা বিলাতী

হরিদাসের কত তেজ, কত সাহস, কত বুদ্ধি, কত বিপাক, কতই অদ্ভুত অদ্ভুত মনস্বিতা ও নির্ভীকতা, কতই স্বভাবসিদ্ধ বীরত্ব এবং কতই দুর্ভাগ্যের সঙ্গে যুদ্ধ, বিলাতী গুপ্তকথায় তাহা পাঠ করিয়া সকলকেই চমৎকৃত হইতে হইবে। যে হস্ত হইতে বাঙ্গালী হরিদাসের উদ্ভব, সেই হস্ত হইতেই বিলাতী হরিদাস উদ্ভূত হইতেছে। বঙ্গভাষায় ইহারও আখ্যানকর্ত্তা শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। বিলাতী গুপ্তকথায় বিলাতী হরিদাসের যেমন কার্য্য বেশী, কীর্ত্তি বেশী, ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর কাণ্ড বেশী, মূল্য তত বেশী হইবে না। বিলাতী "যোজেফ্ উইল্‌মট্" পুস্তকের একটু একটু ছায়া লইয়া হরিদাসের গুপ্তকথার জন্ম, বিলাতী উইল্‌মটের সম্পূর্ণ সার লইয়া ছাঁকা বিলাতী গুপ্তকথা বাঙ্গালা অক্ষরে প্রদর্শন করা যাইবে। আগামী শারদীয়া পূজার মধ্যে পত্র লিখিয়া গ্রাহক হইলে বিনা ডাকমাশুলে পাইবেন।

নূতন পুস্তকখানির আকার হরিদাসের গুপ্তকথার দ্বিগুণ হইবার সম্ভাবনা। হরিদাস ডিমাই ৮পেজী ১০৯ ফর্ম্মায় সমাপ্ত, এখানি বোধ হয়

ডিমাই ৮ পেজীর ২০০ ফর্ম্মার কম হইবে না। মূল্যটী কিন্তু হরিদাসের গুপ্তকথার মুল্যের দ্বিগুণ অপেক্ষা অল্প হইবে।

পুস্তকখানি চারিখণ্ডে সমাপ্ত করিবার সংকল্প আছে। আমরা কাহারও নিকট অগ্রিমমূল্য গ্রহণ করিব না। প্রত্যেক খণ্ড মুদ্রিত হইবা মাত্রই ভেলুপেবল পোষ্টে প্রেরণ করা যাইবে। কার্ত্তিক মাসের সংক্রান্তির মধ্যেই প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইবে।

কলিকাতা,
৪৬নং মানিকতলা ষ্ট্রীট।
২রা ভাদ্র ১২৯৪। } শ্রীসারদাপ্রসাদ নিয়োগী।

ভারতীয় রহস্য।

প্রথম খণ্ড।

আমার মহিষী।

প্রথম কল্প।

নবাব রামহরি।

হুগলী জেলার একখানি অপ্রসিদ্ধ গ্রামে একটী ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার নাম রামহরি। এই রামহরি যথার্থ ব্রাহ্মণ ছিলেন কি না, গ্রামের লোকেরা তাহা ঠিক জানিত না। যে কথাটী গ্রামের লোকের অজ্ঞাত, সমস্ত জেলার লোকে, অথবা অন্যান্য দেশের লোকে অবশ্যই তাহা জানিবেন না, এ কথাটা আমাদের বলিয়া দেওয়াই বাহুল্য। রামহরির নামের পূর্ব্বে "নবাব" উপাধির সংযোগ থাকাতে কেহ কেহ তাঁহাকে মুসলমান বলিয়া অনুমান করিত। এরূপ অনুমানের হেতু এই যে, রামহরির পূর্ব্বপুরুষেরা এই গ্রামে বাস করিতেন না, সবেমাত্র দুই তিন বৎসর হইল, রামহরি স্বয়ং এই স্থানে আসিয়া একপ্রকার

উপনিবেশ করিয়াছেন। রামহরির অনেক টাকা ছিল। সেই টাকার খাতিরে গ্রামের কোনকোন ভদ্রলোক,—ভদ্রলোক অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বংশীয়েরা,—তাঁহার বাটীতে প্রায় সর্ব্বদাই গতিবিধি করিতেন। তাসখেলা হইত, দাবা চলিত, খোসগল্প হইত, এক এক দিন সখ্ করিয়া একসঙ্গে মাছ ধরাও হইত। প্রথম প্রথম দিনকতক শুদ্ধ কেবল পানতামাক ভিন্ন আর কোন প্রকার আহারব্যবহার চলিত না, জলযোগ পর্য্যন্তও না। গ্রামে একজন দলপতি ছিলেন। সকল গ্রামেই এক একজন দলপতি থাকেন। যে গ্রামে দলাদলীর বেশী ঘটা, সে গ্রামে দুই তিন জন দলপতি কোমর বাঁধিয়া দাঁড়ান। রামহরির ইতিহাসে একটী বড় নূতন কথা আছে। ব্রাহ্মণের সমাজে ব্রাহ্মণ দলপতি হন, কায়স্থের সমাজে কায়স্থ দলপতি হন, অন্যান্য জাতির পক্ষে যে জাতির সমাজ, সেই জাতির মধ্যে এক এক জন প্রধান লোক দলপতির স্থান অধিকার করেন। নিম্ন শ্রেণীর দলপতিগণকে মণ্ডল অথবা চাঁই বলে। রামহরির বাসগ্রামে ব্রাহ্মণের বাস বেশী, কায়স্থের বাস কম, তথাপি সেই ব্রাহ্মণের গ্রামে কায়স্থ দলপতি।

এইস্থলে পাঠকমহাশয়কে রামহরির সমন্বয় সম্বন্ধে গুটীকতক বাজেকথা শুনিতে হইবে। মাঝখানে একটা ধোঁকা থাকিয়া যাইতেছে। যে গ্রামে রামহরি উপনিবেশী, সে গ্রামের নামটী এ পর্য্যন্ত প্রকাশ হইল না। সেটা আমাদের ভুল নহে, আমরা ইচ্ছা পূর্ব্বক সেকথাটা অপ্রকাশ রাখিয়া আসিতেছিলাম। কেন না, নামটা অতি জঘন্য। এত জঘন্য যে, উচ্চারণ করিতে লজ্জা হয়। তা ছাড়া আরও গোল। নামের

অক্ষরগুলা, একসঙ্গে সাজাইয়া যন্ত্রযোগে উচ্চারণ করিতে হইলেও আমাদের রসনা-যন্ত্রের কল বিগ্‌ড়াইয়া যায়। এত বড় শক্তাশক্তি ব্যাপার, তথাপি কিন্তু রামহরির নূতন বাস-গ্রামের নাম চাই। নাম চাই, কিন্তু কি নাম?—আপনাদের দশজনের খাতিরে, দয়াময়ী কল্পনাদেবীর সানুগ্রহ-সাহায্যে আমাকে এই স্থানে একটী নূতন নাম বানাইয়া দিতে হইল। বোধ করুন,—আমি না,—রঙ্গিণী কল্পনাদেবী বলিয়া দিতেছেন, গ্রাম খানির নাম "হরিণবাড়ী।" এ নাম আপনারা কালেক্টরির তৌজিতে পাইবেন না,—বঙ্গীয় কোন জমীদারের সেরেস্তার জমাওয়াশীলবাকীর ফর্দ্দেও দেখিতে পাইবেন না,—দয়াময় ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের ইনকম্‌ট্যাক্সের খাতাতেও নাই,—ট্যাক্স-গ্রাহক মিউনিসিপালিটীর রেজেষ্টারীবহিতেও অদৃশ্য,—পল্লী-গ্রামের চৌকীদারি ট্যাক্সের সেহাবন্দীর পত্রমধ্যেও বন্দীনহে,—থানাওয়ালাদের ঘরসুমারি ফর্দ্দের মধ্যেও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না,—এ নাম আপনাদের জানাশুনা দলীল পত্রের মধ্যে কোথাও নাই, আছে কেবল ভারতবর্ষের রাজধানীর এক জেল খানার নাম হরিণবাড়ী। এ নামে, আর আমাদের প্রেমময়ী কল্পনাসতীর রসনা-নিঃসৃত হুগলি জেলার এক অপ্রসিদ্ধ পল্লীর নামে, অনেক তফাৎ। আমাদের তন্ত্রশাস্ত্রের গূঢ় মীমাংসার ন্যায় এই সামান্য গ্রামটীর নামসম্বন্ধে যখন এতখানি শক্ত মীমাং-সার গুপ্তকথা, তখন এ নাম পৃথিবীর ভূগোলে নাই, ইহা আপনারা অনায়াসেই বুঝিবেন। ইহার ভিতরেও ভারি একটী চমৎকার মজার কথা! এই হতভাগা দেশের বিদ্যা-শিক্ষার প্রতি ভারতের সর্ব্বমঙ্গলদাতা মঙ্গলময় ঈশ্বরপ্রেরিত ইংরেজ

রাজপুরুষগণের অসীম করুণা,—বড়ই অকপট আন্তরিক অনুরাগ! এতবড় অনুরাগের প্রশস্ত ক্ষেত্রমধ্যে বঙ্গদেশের ভূগোল নাই! হাওড়ার লোকে হয় ত জানিতে পারেন, হুগলী কোন্‌দিকে;—কিন্তু হুগলীর ফৌজদারি কাছারীর আশ্‌ পাশের লোকেরা অনেকেই হয় ত বলিয়া দিতে পারিবেন না, চুঁচুড়ার বারিক কোন্ দিকে!—বেশী কথা কি, কলিকাতার বহুবাজারে এমন অনেক লোক আছে,—আর একটু উত্তরে আসিয়া সিম্‌লাতেও আছে,—বহুবাজার অথবা সিমলা হইতে কোন্ পথে কোন্ দিক্ দিয়া বাগবাজারে যাইতে হয়, তাহা তাহারা জানে না!!! অহো! আমাদের মহাবিদ্যানুরাগী ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা-বিভাগের ইংরেজ ডিরেক্টর মহাপুরুষগণের কতই অনুগ্রহ! বঙ্গদেশ পালিত বঙ্গদেশে বঙ্গদেশের ভূগোল নাই!

অনেকটা বাজেকথা আসিয়া পড়িল। নবাব রামহরির সময়য়ের কথা বলিতে হইবে। রামহরির বাসগ্রামের নাম হরিণবাড়ী। বলা হইয়াছে, রামহরির বাটীতে গ্রামস্থ জন কতক ভদ্রলোকের সমাগম হইত। ক্রমে ক্রমে তাঁহারা রামহরিকে প্রকৃত ব্রাহ্মণ বলিয়াই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। চেষ্টা পাইবার হেতুবাদ এই যে, "রামহরি" নামটী কদাচ মুসলমানী নাম হইতে পারে না। রাম এবং হরি, দুটীই হিন্দুশাস্ত্রোক্ত দেবতার নাম। মুসলমান কখন এমন নাম রাখে না। তবে যে, রামহরির নামের পূর্ব্বে "নবাব" শব্দের ব্যবহার আছে, সেটা অবশ্যই কোন নবাবের দেওয়া মান বাড়ানো খেতাব। রামহরি নিজেও এ কথা স্বীকার করেন।

তিনি বলিতেন, তাঁহার এক জ্যাটামহাশয় বাঙ্গালার নবাবের সরকারে একটা বড় রকম কাজ করিতেন। নবাব তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। দস্তুরমত খেলাত দিয়া উপাধি দেন নাই বটে, কিন্তু আমোদ করিয়া নবাব বলিয়া সমাদর করিতেন। সেই আদরেই ব্যাপ্ত হয়, রামহরির জ্যাটামহাশয় একজন নবাব। জ্যাটামহাশয়ের পুত্রসন্তান ছিল না, কাজেই ঐ ভ্রাতুষ্পুত্র রামহরিই সেই আদুরে খেতাবের উত্তরাধিকারী হইয়াছেন। এ কথাটাও সত্য কি মিথ্যা, তাহা আমরা শপথ করিয়া বলিতে পারিব না।

টাকায় কি না হয়? নবাব রামহরির হাতে অনেক টাকা, ব্রাহ্মণ-কায়স্থেরা এমন ধনেশ্বরের গৃহে কেবল পানতামাক ছাড়া আর কিছুই সেবা করিবেন না, ইহা কি কখনো সম্ভব হইতে পারে? নূতনটা দিন কতক পুরাতন হইবার পরেই হরিণবাড়ীর পানতামাক-সেবী ভদ্রসন্তানেরা ডাব নারিকেল এবং বাতাসা পাটালী গোপনে গোপনে সেবা করিতে আরম্ভ করেন। সময়ে সময়ে নিশাকালে বন্ধুভোজের লুচিটা আস্‌টাও চলে। গোপনে গোপনে রন্ধনশালায় দুই পাঁচজনের সম্মুখে সুবাসিত আতপ-তণ্ডুলের অন্নভোগও নিবেদিত হয়। তাঁহাদের নিকটে নবাব রাম-হরি আর মুসলমানের সন্দেহ দোলায় দুলিলেন না। অন্নসেবীরা তাঁহাকে প্রকৃত কুলীন ব্রাহ্মণ বলিয়াই পাস্ করিতে আরম্ভ করিলেন। লুকা ছাপা কদিন থাকে? কথাটা দলপতির কর্ণে উঠিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, দলপতি এক জন কায়স্থ। শুদ্ধমাত্র কায়স্থ নহেন, দুই একখানা তালুক-মুলুকও আছে। জিনিস বন্ধকী তেজারতিও চলে। কাজেই তিনি একজন পল্লীগ্রামের বিখ্যাত

টাকাওয়ালা বুড়মানুষ নামে মান্যগণ্য। দলপতির নাম বিশ্ব-দুর্ল্লভ চৌধুরী।

নবাব রামহরির বাটীতে গ্রামস্থ ব্রাহ্মণের গুপ্তভোজ শ্রবণ করিয়া চৌধুরী মহাশয় ভয়ানক চটিয়া উঠিলেন। একঘ'রে করাটা এতদ্দেশের প্রায় সর্ব্ববাদীসম্মত, সর্ব্বপঞ্জিকাসঙ্গত এবং সামাজিক দলপতিবর্গের ঘরগড়া কুলমজানো আইনসঙ্গত। দলপতি বিশ্বদুর্ল্লভ চৌধুরীও সেই আইন অমান্য করিতে পারিলেন না। রামহরি ত একঘরে ছিলেনই, এখন আবার দল বাড়িল। যাঁহারা রামহরির বাটীতে অন্ন গ্রহণ করেন, তাঁহারা প্রথম শ্রেণীর একঘরে; যাঁহারা জল খান, তাঁহারা দ্বিতীয় শ্রেণী;—যাঁহারা পানতামাকে বাধ্য, তাঁহারা তৃতীয় শ্রেণী;—যাঁহারা তাস খেলেন, দাবা খেলেন, মাছ ধরেন, গল্প করেন, তাঁহারা চতুর্থ শ্রেণী। এই রকমে রামহরির সঙ্গে হরিণবাড়ী গ্রামের প্রায় ১০। ১৫ ঘর ব্রাহ্মণ "একঘরে" হইয়া পড়িলেন। রামহরি ছাড়া প্রায় সকলেই গরিব, সুতরাং কেহই আর মাথা তুলিতে পারেন না, দলপতির বিরুদ্ধে কাহারও উচ্চ বাচ্য নাই।

দায়ে পড়িয়া আবার বলিতে হইল, টাকায় কি না হয়? রামহরি প্রথমত এদেশে ইংরেজের প্রথম আমলের পেটমোটা হাকিমদিগের ন্যায় বিশ্বদুর্ল্লভ চৌধুরীকে গুপ্তভাবে তুষ্ট করিবার যোগাড়যন্ত্র চালাইতে লাগিলেন। এক শ হইতে পাঁচ শ হইল, দলপতির মন উঠিল না। পাঁচ শ হইতে হাজার;—হাজার হইতে এক কালে তুড়িলাফে দশহাজার। এখন আর দলপতি মহাশয় যান কোথা! এমন সুন্দর চাঁদপারা টাকার ফাঁদ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া অতি অল্প লোকেরই সাধ্যায়ত্ত। পল্লীগ্রামের

আমার মহিষী।

কুটিল কুতার্কিক দলপতি দূরে থাকুন, বড় বড় সহরের ৮৬ বড় বাবু ভায়া ও বড় বড় রাজা-রাজড়ারাও দলপতি অথবা গোষ্ঠী-পতির আসন গ্রহণ করিয়া টাকার লোভে অজাতকে জাত দিতে পেছুপা হন না।

"যে মুখে বলিয়াছিলে চ্যাঙ্ মুড়ি কানী।
সেই মুখে বল এবে জয় বিষহরী।"

বিশ্বদুল্লর্ভ চৌধুরী দশ সহস্র রজতমুদ্রা হস্তগত করিয়া রামহরিকে ফুলের মুখুটী বিষ্ণুঠাকুরের সন্তান বলিয়া পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। নবাব রামহরি এখন বাবু রামহরি মুখোপাধ্যায় নামে সুবিখ্যাত, নবাব রামহরি এখন হরিণবাড়ী গ্রামের সর্ব্বলোকের অর্চ্চনীয়।

এই খানে একটা তর্ক উঠিবে,—দুই তিন বৎসর একঘরে থাকিবার পর রামহরি অকস্মাৎ গ্রামের কায়স্থ দলপতিকে দশ হাজার টাকা ঘুস দিতে সম্মত হইলেন কেন? এই যে কেন, ইহার একটী সমাজঘটিত অতি সুন্দর উত্তর আছে। নবাব রামহরির জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ—উপাধি নবাব, সুতরাং সাধারণ সিদ্ধান্তে মুসলমান, অথচ রামহরি নিজে আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেন। এত বড় গোলযোগের সঙ্কটে কোন ব্রাহ্মণই রামহরির কন্যাকে বধূরূপে গ্রহণ করিতে সম্মত হন না। কন্যাটীও চতুর্দ্দশ বর্ষের সীমা অতিক্রম করে, বিষম বিভ্রাট! এ বিভ্রাট-সাগরে রজত-রূপী কাণ্ডারী ব্যতিরেকে সহজে পারাপার হওয়া নিতান্তই দুর্ঘট। রামহরি এখন মুখোপাধ্যায় হইলেন বটে, তথাপি কিন্তু উত্তরাধিকার পরিত্যাগ করিলেন না, তাঁহার নবাব উপাধি ঘুচিল না। উপাধিটীও থাকিবে, অথচ তিনি

মহামান্য কুলীন ব্রাহ্মণের ধন্য সন্তান বলিয়া পরিচিত হই-বেন। এই মীমাংসাই সার-মীমাংসা; তাহাই মঞ্জুর। একটী শুভ দিন দেখিয়া সমন্বয়ের আয়োজন হইল। এলাকাভুক্ত দল-পতি, গোষ্ঠীপতি ও সাবর্ণ-চৌধুরী মহাশয়েরা সগৌরবে সভাস্থ হইয়া মাল্য চন্দন গ্রহণ করিলেন। দুই এক দল গোস্বামী-প্রভুও রামহরির বাটীতে পদধূলি দিলেন। তর্কবাগীশ, ন্যায়বা-গীশ, বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণও ভাগিনেয়, দৌহিত্র ও চাকর-চাক্‌রাণীর সহিত উচ্চদরের বিদায় মারিলেন। শুপা-রীসি বিদায়ও নিতান্ত অল্প হইল না, রামহরির জয়-জয়-কার। ঘটক ও ভট্টরাজগণের বদনেও প্রতিধ্বনি হইল, রামহরির জয়-জয়-কার।

মহাসমারোহে অন্নমেরু-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া, নবাব রামহরি তখন কুলীন, অকুলীন, সমস্ত ব্রাহ্মণ মণ্ডলীর সমাজ-ভুক্ত হইয়া উঠিলেন।

কুলীন-চূড়ামণি নবাব রামহরি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার শুভ বিবাহ। কন্যাটী মাঝামাঝি রূপবতী, কন্যার নাম যোগমায়া। বলা হইয়াছে বয়ঃক্রম প্রায় চতুর্দ্দশ পরিপূর্ণ। মেয়েটী বেশ সুলক্ষণা, সামুদ্রিক ও হনুমান চরিত্রের গণকেরা তাহার হস্তরেখা দর্শনে গণনা করিয়া বলিয়াছেন, "এ মেয়ে বড় সামান্য মেয়ে নয়, এ মেয়ে রাজরাণী হইবে।" এমন যে রাজরাণী-চিহ্নধারিণী সুলক্ষণা যোগমায়া, অদ্য হইতে পঞ্চবিংশ দিবসে সেই সর্ব্বসুলক্ষণা যোগমায়ার শুভ বিবাহ॥

দ্বিতীয় কল্প।

এটী আবার কার মেয়ে ?

যোগমায়ার বিবাহের সাত দিন মাত্র বাকী, এমন সময় একদিন সন্ধ্যাকালে হরিণ-বাড়ীর একটী পুরাতন অশ্বত্থ-বৃক্ষ-তলে একাকিনী একটী কামিনী। পরিধান-বস্ত্র নিতান্ত মলিন, মুখখানি অতি-বিষণ্ণ, গণ্ডবাহী অশ্রুধারা, বয়স অনুমান সপ্তদশ বর্ষ। চুপ্ টী করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, অন্ধকারে রূপখানি বড় ভাল করিয়া দেখা যাইতেছে না, তথাপি একটু মন দিয়া দেখিলে আশু অনুমান হয়, যেন মেঘের কোলে বিদ্যুৎ। মলিন শুষ্ক পত্রে ঢাকা পদ্মফুল। যতটুকু দেখা যায়, তাহাতেই জ্ঞান হয়, এ কামিনী পরম সুন্দরী। এটী আবার কার মেয়ে ?

কার মেয়ে, এ কথার উত্তর এখন কে দিবে ? বিষাদিনী তরুতলে মৌনবতী। তাদৃশ বিজন-স্থলে নিজের পরিচয় নিজে না দিলে তাহা পরিজ্ঞাত হইবার কৌতূহল কিছুতেই চরিতার্থ হইবার সম্ভাবনা নাই। পল্লীগ্রামের সন্ধ্যা। পল্লীগ্রামের সন্ধ্যা কালে পল্লীগ্রামের পথে, ঘাটে, লোক জনের চলাচলটা নিতান্তই কম হয়। কেহই আসিতেছে না, কেহই যাইতেছেনা, কেহই নিকটে নাই, মৌনবতী কামিনী একাকিনী তরুতলে। বাতাসের সঙ্গে কথা হয় না। পাঠক মহাশয় হয়ত কখন

কখন আপন মনে বাতাসের সঙ্গে কথা কহিয়া থাকিবেন, কিন্তু বাতাস তাঁহার পরিচয় বহন করে না। আমরা এখন এ সমস্যার মীমাংসা করি কিসে?

মলিন বসনা অশ্রুমতী অনেকক্ষণ একাকিনী নীরবে দাঁড়াইয়া আছে। একটু দূরে, একটু গলাভাঙ্গা পঞ্চমের আওয়াজে অর্দ্ধ-উচ্চ বিকট শব্দ হইল, "হৈ—ই"!—হঠাৎ শুনিলে বোধ হয়, শৃগালের রব, কিন্তু এ রবটা সে রব নয়। পাড়ার ভিতর চৌকীদার হাঁকিতেছে। সন্ধ্যাকালে চৌকীদার?—আশ্চর্য্য জ্ঞান করিবেন না, অনেক পল্লীগ্রামের প্রথাই এই। অন্ধকারে সাপে খাইবে কি চোরে মারিবে, এই ভয়ে পাড়াগাঁয়ের চৌকীদারেরা সূর্য্যদেবের অস্তগমনের পরক্ষণেই দুই একটা হৈ হৈ দিয়া ঘাটি গরম করে, তাহার পর গৃহে অথবা উপগৃহে অকাতরে নিদ্রা যায়। এটা বরং অনেক পল্লীগ্রামের প্রশংসার কথা। আবার চৌকীদার ডাকিল "হৈ—ই"—একটু পরেই একটু সরু-মোটা আওয়াজে ধীরে উচ্চে ফুকরাইতে লাগিল, "দাস মশাই!—দাস মশাই!—ও দাস মশাই! খবরদার!" দাসমশাই গলা-খাঁকারি দিলেন, চৌকীদার আরও দুই তিনখানি বাড়ীর কানাচে দাঁড়াইয়া, ঐ প্রকারে টহল দিল, তাহার পর চুপ চাপ। রাত্রি প্রায় চারি দণ্ড। দূরে নিকটে বংশকাননে অর্থাৎ বাঁশবনে স্বভাবের নিশা-প্রহরী শিবাদলেরা কালোয়াতি সুরে হুয়া হুয়া হুঙ্কার ছাড়িল। সে হুঙ্কারটা গ্রাম্য চৌকীদারের প্রকৃতিসিদ্ধ হুহুঙ্কার অপেক্ষা অনেক পরিমাণে সুমিষ্ট।

কামিনী তরুতলে। ঠিক একভাবে এক মনে মৌন হইয়া

বিদেশিনী কামিনীটী তরুতলে। পরিচয় না লইয়াই কেন আমরা বিদেশিনী বলি, এ কথার মীমাংসা শীঘ্রই হইবে।

গ্রামের চৌকীদারটী ঘরে যাইতেছে। যে অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে ঐ বিষাদিনী কামিনী, সেই অশ্বত্থ-তল দিয়াই চৌকীদারের ঘরে যাইবার পথ। চৌকীদার সেই স্থানে উপস্থিত। অন্ধকার, পল্লীগ্রামের অন্ধকারে নিবিড় বন ছাড়া প্রশস্ত ময়দানের অনেক দূর পর্য্যন্ত এক রকম বেশ দেখা যায়। বৃক্ষতলে নারী মূর্ত্তি। যদিও মলিন বসন, তথাপি সে অন্ধকারে মানুষ চেনা চৌকীদারটীর পক্ষে বড় একটা অসাধ্য হইল না। চৌকীদার ভাবিল, রাত্রিকালে বৃক্ষ তলে মেয়ে মানুষ কেন? এ মেয়েমানুষ কে? হয় ত শাঁকচূন্নী। কিম্বা হয় ত সবে মাত্র বাহির হইতেছে, একটু পরে আলেয়া হইবে। এই ভাবিয়া প্রথমত তাহার শঙ্কা হইল, হন্ হন্ করিয়া যাইতেছিল, থমকিয়া দাঁড়াইল। নারীমূর্ত্তি, অচঞ্চলা, কথাও নাই বার্ত্তাও নাই, নড়েও না চড়েও না। সাহসে ভর করিয়া খানিকক্ষণ পরে চৌকীদার জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?"

কামিনীর কথা নাই। মৌনবতী সমভাবেই মৌনবতী। মৌনবতীর পরিচ্ছদটা যেন একটু খোট্টাই রকমের। খোট্টা মেয়ে বাঙ্‌লা কথা বুঝিল না, প্রতিভা-বলে মনে এইটী স্থির করিয়া চৌকীদার আবার খোট্টা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোম্ কোন্ হ্যায়?

তথাপি রমণীর বদনে বাক্য নাই! চৌদারের একটু একটু ভয় ঘুচিল, একটু একটু সন্দেহ আসিল। চাকরীসিদ্ধ দর্প ভরে একটু জোর করিয়া বলিল, "চোর!" কামিনীকে সম্বোধন

করিয়া হাকিমী গর্জ্জনে আবার বলিল, "যদি কথা না কও, ফাঁড়িতে ধরিয়া লইয়া যাইব।"

তথাপি বাক্য নাই। ব্যাপার কি? মেয়েটী কি তবে বোবা? চৌকীদার সাহসে ভর করিয়াছে,—সাহসে ভর করিয়া কথা কহিতেছে, কিন্তু নিকটে যাইতে সাহস করিতেছে না। কতক্ষণই বা দাঁড়াইয়া থাকে? পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিল, "তুমি কে?"

কামিনী এইবার অঞ্চল হইতে একখানি কাগজ বাহির করিয়া চৌকীদারের হাতে দিল। চৌকীদার সেই কাগজখানির মোড়ক খুলিয়া দেখিল, লেখা আছে,—পড়িতে পারিল না! চৌকীদার লেখাপড়া জানে না, দুই তিনবার এপিঠ ওপিঠ করিয়া দেখিল,—নাকের নিকটে লইয়া শুঁকিল, কাগজে কোন প্রকার চোর-ডাকাতের গন্ধ পাইল না! এমন সময় এ বিপদে তাহাকে পরিত্রাণ করে কে? ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই উপায় না পাইয়া, ধীরে ধীরে দুই এক পদ অগ্রসর হইল। কামিনী হস্ত বিস্তার করিল; কিয়ৎক্ষণ ইতস্তত করিয়া কাগজখানি সেই হস্তে প্রত্যর্পণ করিতে যাইতেছিল, হস্ত-সঞ্চালনে,—মস্তক-সঞ্চালনে, কামিনী বক্রগ্রীবায় ইসারা করিয়া দেখাইল, "কাগজ চাহি না,—লোকালয়ে যাইবার ইচ্ছা।" চৌকীদার তখন নিশ্চয় করিয়া বুঝিল, মেয়েটা বোবা। হস্ত-সংঙ্কেতে ইসারা করিয়া ডাকিল, "সঙ্গে এসো।" একবার ভাবিল, হাতখানি ধরিয়া লইয়া যায়;—আবার কি ভাবিয়া সে সংকল্প পরিত্যাগ করিল। সংঙ্কেতে ডাকিল, "সঙ্গে এসো।"

চৌকীদার অগ্রসর, কামিনী অনুবর্ত্তিনী। লোকালয়ের দিকে পাড়াগেঁয়ে চৌকীদারদের বড় একটা আস্থা-যত্ন থাকে

হয়, কে যেন জলাশয়ের চারিদিকে সারি সারি সবুজবর্ণ গালিচা পাতিয়া রাখিয়াছে! সূর্য্যদেব যখন পশ্চিমে হেলিয়া পড়েন, জলাশয়ের পশ্চিমদিকের সোপানাবলী সেই সময় বেশ শীতল হয়;—রৌদ্রের উত্তাপ উপরে থাকে, সেখানে আইসে না। বসিবার আসনের উপর সুশীতল ছায়া। বন-নলিনী প্রতিদিন অপরাহ্নে সেই ক্ষুদ্র জলাশয়ে বারম্বার জলপান করিয়া সেই সোপানাবলীর একস্থানে উপবেশনপূর্ব্বক একটু একটু শ্রান্তিদূর করে। একদিন ঐসময় ঠিক ঐ ভাবে বসিয়া আছে, এমন সময় সুন্দর পরিচ্ছদধারী একজন সুপুরুষ ধীরে ধীরে তীর হইতে নামিয়া, বনবালার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বনবালা কিছুই জানিল না। আগন্তুক যুবাও প্রায় অর্দ্ধদণ্ডকাল নিঃশব্দ নিশ্চেষ্টভাবে, ঠিক এক স্থানে দাঁড়াইয়া বনবালার মোহনরূপ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

যথার্থই বনবালার মোহন রূপ।—রূপখানি দেখিলেই সানন্দে নয়নযুগল সমাকৃষ্ট হয়। বালার এই মোহনরূপ দেখিয়াই বোধ হয় এই বনবালাটীর নাম রাখা হইয়াছে বন-নলিনী। যথার্থই আমাদের হৃদয়-তাপিনী অভাগিনী বনবালাটী নেত্র-মোদিনী বন-নলিনী।

রূপমুগ্ধ যুবা-পুরুষের সতৃষ্ণ নয়নযুগল অনেকক্ষণ প্রচ্ছন্ন থাকিয়া, সাধ মিটাইয়া, বন-নলিনীর সুনলিন মোহনরূপ চুমুকে চুমুকে পান করিল। হৃদয় যেন উন্মত্ত মাতোয়ারা হইয়া উঠিল। আর অধিকক্ষণ প্রচ্ছন্ন থাকাটা, সেই রূপপিপাসী যুবাপুরুষ তখন দুঃসাধ্য বলিয়া মনে করিলেন। বিস্ময়ভাবটী লুকাইলেন;—হাসির ভাবটীও আসিতে দিলেন না;—ছল করিয়া

গম্ভীর ভাবও ধরিলেন না;—সমান প্রফুল্লভাবে সমান প্রফুল্ল-বদনে সম্মুখে যাইয়া দর্শন দিলেন।

বনবালা আড়ষ্ট!—জীর্ণ বসনে যথাসাধ্য অঙ্গ গোপন করিয়া, শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। চলিয়া যাইবার উপক্রম;—চলিয়া যাইতে পারিল না। অভাবনীয় ভয়ে,—অভাবনীয় লজ্জায়,থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তখন আগন্তুকের হাসি পাইল। তিনি বনবালার নাম জানিতেন না, কস্মিন্‌কালে কোথাও তাহাকে চক্ষেও দেখেন নাই, তথাপি যেন বনবালার রূপমাধুরী তাঁহাকে সেই মুহূর্ত্তেই কবির আসন প্রদান করিয়া, অকস্মাৎ মুখ ফুটাইয়া নাম বলাইল,—"বনবালা!"

বনবালার বনবালা নামের পরিচয় এই প্রথম। ইহার পূর্ব্বে কেহই তাহাকে বনবালা বলিয়া ডাকিতেন না,—এখনও কেহ বনবালা বলিয়া ডাকেন না। রূপ দেখিয়া এই মেয়েটীর মাতা-পিতা নাম দিয়াছিলেন, বন-নলিনী।—এ নামটী মাসীমার মনঃ-কল্পিত নহে। ষোড়শবর্ষ বয়সে একজন আগন্তুক যুবাপুরুষের বদনে বন-নলিনীর নূতন নামকরণ হইল, বনবালা।

যুবা ডাকিলেন, "বনবালা!"—যুবা সস্নেহে জিজ্ঞাসা করি-লেন, "বনবালা! কোথায় যাও?"

বনবালা শুনিতেও পায় না, কথা কহিতেও পারে না,—চলিয়া যাইবার জন্য আপন মনেই ক্ষণে ক্ষণে কম্পিত চরণ সম্মুখে বাড়াইবার চেষ্টা পাইতেছে। পশ্চিমের আসনে দাঁড়াইয়া ছিল, মুখখানি উত্তরদিকে। রূপমুগ্ধ রসিক ভ্রমর সেই পদ্মমুখখানি তখন ভালরূপে দেখিতে পাইতেছে না। যুবা শশব্যস্তে এক বেষ্টন অতিক্রম করিয়া, আবার সেই কম্পিতা বালার মুখের দিকে

দণ্ডায়মান। বনবালা কম্পিতপদে পশ্চাতে সরিয়া দাঁড়াইল। অন্য দিকে মুখ ফিরাইল। যুবা পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসিলেন, "বনবালা! ভয় কি?—ভয় পাইতেছ কেন?—আমাকে দেখিয়া কি তোমার কোনপ্রকার বিপদের শঙ্কা আসিতেছে?"

বনবালা নিরুত্তর। যুবা ইহার ভাবার্থ কিছুই বুঝিলেন না। যদি লজ্জা হইত, তাহা হইলে হয় ত ছুটিয়া পলাইত। এ লক্ষণ ভয়ের।—কিন্তু কেনই বা সে ভয়?—মনে মনে এইপ্রকার তর্কবিতর্ক করিয়া, নবীন প্রশ্নকর্ত্তা তৃতীয়বার প্রশ্ন করিলেন, "বনবালা!—কোথায় যাইতে চাও? কোথায় থাক তুমি? দেখ, আমার কথার উত্তর দাও! যদিও সেসব কথা না বল, অন্যদিকে মুখ রাখিয়াই একটীবার বল, তোমার নামটী কি?"

তথাপি উত্তর নাই।—বনবালা কালা,—বনবালা বোবা! যেদিকে মুখখানি ঘুরিয়াছিল, যুবাপুরুষ আবার সেই দিকেই গিয়া দাঁড়াইলেন। সূর্য্যদেবের অস্তগমনের তখন বড় বেশী বিলম্ব ছিল না। বনবালা পশ্চিমে মুখ ফিরাইয়া, উর্দ্ধে অঙ্গুলী তুলিয়া, সূর্য্যদেবকে দেখাইল।—বুঝাইল,—বেলা নাই, সায়ংকাল সমাগত। অরও বুঝাইল, উপরে যে তিনটী ছাগী চরিতেছে, সেই তিনটীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া শীঘ্র শীঘ্র ঘরে যাইবে।

যুবা তখন একটু একটু বুঝিলেন; মেয়েটী বোবা।—গৃহে যাইতে অনুমতি দিলেন, আপনিও নয়ন ইঙ্গিতে, অঙ্গুলীসঙ্কেতে একটী নূতন প্রশ্ন বুঝাইলেন, "কল্য আবার দেখা হইতে পারে কি না?"—বনবালাও অঙ্গুলীসঙ্কেতে সূর্য্যদেবকে দেখাইয়া, দুই তিনপ্রকার অঙ্গুলীসঙ্কেতে বুঝাইল, "আজ যেমন সময় আসা

হইয়াছে, কল্য ইহার একটু পূর্ব্বে আসিলেই, এই স্থলেই দেখা হইতে পারিবে।”

যুবা উৎফুল্ল হইলেন। উভয়েই চলিলেন।—অগ্রে আগন্তুক, পশ্চাতে বনবালা। কাননে উপস্থিত হইয়া, ছাগীতিনটীকে সঙ্কেতে ডাকিয়া, বনবালা আপন মনে পশ্চিমদিকে চলিল। অভ্যাসবশে ছাগীরাও অনুবর্ত্তিনী।

যুবার কৌতূহল মিটিতেছে না। তাঁহার ইচ্ছা হইল, দেখিয়া আসিবেন, বনবালা কোথায় যায়!—বনের ভিতর গুপ্তভাবে পাছু লইবার কিছুই ব্যাঘাত ঘটে না। কৌতূহলী আগন্তুক গুপ্তভাবে কাননে কাননে বন-মলিনীর পাছু লইলেন। বনবালারও বুকে ভয় আছে।—যাইতে যাইতে বারম্বার পশ্চাতে চাহিয়া দেখিতেছে, আগন্তুক আসিতেছে কি না!—খানিকদূর গিয়াই গুপ্তচরের বিভ্রাট!—প্রায় পঞ্চাশ হাত স্থানটুকু তরুশূন্য মুক্তক্ষেত্র।—সেখানে পাছু লইতে গেলেই ধরা পড়িতে হইবে! যুবার মন সে বাধা মানিল না।—তিনি ভাবিলেন, “ক্ষণকাল লুকাইয়া থাকি, একদৃষ্টে চাহিয়া থাকি, দেখি, কোন্ দিকে যায়! একটু অগ্রপথে অল্প অল্প অদৃশ্য হইলেই ধারে ধারে গুঁড়ি মারিয়া সঙ্গ লইব!”—তাহাই করিলেন। তখনও আলো। তখনও তপনদেব আকাশে।

বনবালাও পূর্ব্ববৎ চাহিতে চাহিতে যাইতেছে; মনটাও সন্দিগ্ধ;—মনের সঙ্গে নয়ন দুটীও সন্দিগ্ধ। এইবারে, একবার চাহিয়াই তৎক্ষণাৎ চিনিল, গুঁড়িমারা আগন্তুক!—তৎক্ষণাৎ ফিরিল। যতদূরে গুঁড়িমারা আগন্তুক, ততদূর দ্রুতপদে ছুটিয়া গিয়া, সচকিতে হস্তসঞ্চালনে বারম্বার বুঝাইয়া দিল, “ফিরিয়া

যাও,—ফিরিয়া যাও!—এদিকে আসিতে নাই!—ভয় আছে! বিপদ আছে!—কল্য দেখা হইবে,—জলাশয়কূলে।”

অতিকষ্টে যুবাপুরুষ সম্মত হইলেন;—সূক্ষ্ম সঙ্কল্প হইতে ফিরিলেন। যতক্ষণ তিনি গ্রাম্যপথে অদৃশ্য না হইলেন, বন-নলিনী ততক্ষণ সেই পূর্ব্বস্থানেই দাঁড়াইয়া রহিল। যখন বুঝিল, আর ফিরিবার সম্ভাবনা নাই, তখন দ্রুতপদে ছাগী লইয়া মাসীর কুটীরে উপস্থিত হইল।

সকলেই বলেন,—শাস্ত্রেও লেখা আছে, বটবৃক্ষ চিরদিন শান্তিপ্রদ।—বটবৃক্ষের নাম মঙ্গলবৃক্ষ;—বটবৃক্ষ সকলকেই মঙ্গল-উপকারে উপকৃত করে। কথাটীও যথার্থ;—কিন্তু বন-নলিনীর কপালে অযোধ্যাপুরীর সেই প্রাচীন বটবৃক্ষটী একটুও মঙ্গলচিহ্ন দেখাইল না।—বন-নলিনীর ভাগ্যে সুখময় বট-বৃক্ষ,—মঙ্গলময় বটবৃক্ষ আজ ভয়ঙ্কর দুঃখ আনিয়া ফেলিল, ভয়ঙ্কর অমঙ্গল ঢালিয়া দিল!

তপস্বিনী হইয়াও মাসীমা কাঁদিতেছেন। বেলা দুই প্রহ-রের পর তিনি সংবাদ পাইয়াছেন, অযোধ্যায় যে রাত্রে বজ্রা-ঘাতে বন-নলিনী আপনার যথাসর্ব্বস্ব ভ্রাতা-জননী হারাইয়াছে, যে রাত্রে অভাগিনী বন-নলিনী বজ্রাঘাতে বধির হইয়াছে, বোবা হইয়াছে, সেই দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে বন-নলিনীর স্নেহময় পিতা কাণপুরের গঙ্গায় নৌকাডুবিতে প্রাণ হারাইয়াছেন! সেই দুঃখেই মাসীমা কাঁদিতেছেন। কুটীরে প্রবেশ করিয়া অবধি বন-নলিনী একদিনও মাসীমার চক্ষে জল দেখে নাই। আজ অকস্মাৎ তাঁহাকে অশ্রুমতী দেখিয়া, অকস্মাৎ তাহার বিস্ময় জন্মিল। ছাগীদের খোঁয়াড়িতে বন্ধন করিবার অগ্রেই, মাসীমার

কাছে ছুটিয়া যাইয়া, দুই হস্তে নেত্রজল মুছাইয়া দিতে লাগিল। আপনিও মাসীমার অপেক্ষা অধিক উষ্ণ অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। মাসীমা কেবল কাঁদিয়াই উত্তর দিলেন। কথা কহিয়া উত্তর দিলেও বন-নলিনী বুঝিত না। কান্না দেখিয়াও উত্তর বুঝিল না। অনেকক্ষণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া, অনেক অশ্রুপাত করিয়া, উভয়েই আপনা হইতে শান্তভাব ধারণ করিল।

দুঃখের যামিনী দুঃখে দুঃখেই প্রভাত হইয়া গেল। আবার নূতন সূর্য্য উদয় হইলেন। সূর্য্য কখনই নূতন হন না।—সূর্য্য-দেব যে পুরাতন, সেই পুরাতন।—পৃথিবীর জীবগণ নিত্য নিত্য নবীন প্রাতঃকালে সকৌতুকে নবীন সূর্য্য দর্শন করে।—মেঘশূন্য পূর্ব্বাকাশে রক্ত-মাখা নবীন সূর্য্য।

আবার এক প্রহর আসিল। আবার বন-নলিনী ছাগল চরাইতে বনগামিনী হইল। আবার দুই প্রহর আসিল। আবার অপরাহ্ণ দেখা দিল। বন-নলিনী আবার যৎকিঞ্চিৎ বিশ্রামলাভের অভিলাষে বন-সরসীর পশ্চিমকূলবর্ত্তী সুকোমল দূর্ব্বাসনে বসিল।—বনমাঝে বন-নলিনীর দর্শন-কৌতূহলে আবার সেই পূর্ব্বদিনের আগন্তুক যুবা সেই সরসীকূলে বন-নলিনীর আসন-সমীপে দর্শন দিলেন।—নয়নে নয়নে মিলন হইল।

আজ আর বন-নলিনীর ভয় হইল না।—একটু একটু লজ্জা হইল বটে, কিন্তু শঙ্কার চিহ্ন কিছুই নাই। যুবাপুরুষ ক্ষণকাল সতৃষ্ণনয়নে বন-নলিনীর রূপমাধুরী দর্শন করিলেন। ওষ্ঠপ্রান্তে মৃদু হাস্যের মৃদু রেখা দেখা দিল।—মৃদু হাস্য করিয়া রূপরাশি-পিপাসী, রূপ-লালসা-পাগল, অপরিচিত যুবা যেন কতই অপূর্ব্ব

সাহসে, বন-নলিনীর পার্শ্বে গিয়া বসিলেন। বক্রনয়নে একবার সেই দিকে চাহিয়াই, লজ্জাশীলা বনবালা সচকিত শশব্যস্তে তথা হইতে দুই হাত তফাতে সরিয়া বসিল।

বনবালার রূপখানি আজ যেন আরও চমৎকার! নূতন পারিপাট্য কিছুই নাই,—গাত্রে তৈলবিন্দুও উঠে নাই,—বিমলিন ছিন্নবস্ত্রও ঘুচে নাই, তবুও যেন কতই সুন্দর দেখাইতেছে! সজ্জার মধ্যে বেশীর ভাগে বনবালা আজ এলোকেশী!—রুক্ষ রুক্ষ চামরের মত দীর্ঘ দীর্ঘ কেশগুলি উভয় কর্ণের উভয় পার্শ্ব বাহিয়া, নিশ্চলা উপবিষ্টা মৌনবতী বালার কোলে আসিয়া মিশিতেছে। সেই বিলম্বিত কেশজালের মধ্যস্থলে বনবালার সেই প্রেমপূর্ণ পদ্মমুখখানি যেন, আধ আধ ফুটিতেছে। কবিরা বলিতে পারিতেন, দুদিকে নীল মেঘ, মাঝখানে চাঁদ! মেঘেরা যেন সরিয়া সরিয়া আসিয়া, দুদিক দিয়া চাঁদখানির দুটী পাশ অল্পে অল্পে ঢাকা দিয়া ফেলিতেছে! বন-নলিনীর রূপের আজ বড়ই চমৎকার খোল্‌তা।—চমৎকার বাহার! বন-নলিনী এলোকেশী!

গত কল্যই যুবাপুরুষ বুঝিয়া গিয়াছিলেন, এ মেয়েটী বোবা।—বোবা হইলেই কালা হয়!—কালা হইলেই বোবা হয়, এটী প্রায় অবিসম্বাদী নিয়ম। কতক কতক প্রমাণেও যুবাপুরুষের প্রতীতি জন্মিয়াছিল, বোবা বনবালাটীও নিশ্চয়ই কালা। অনুমানটীও ঠিক্। কালা হইলেই বোবা হয় কেন, এ সমস্যাটী ভাল করিয়া বুঝাইতে হইলে, অনেকগুলি বেশীকথা বলিতে হয়। ততখানি বেশীকথা এই বর্ত্তমান প্রসঙ্গে অবশ্যই অপ্রাসঙ্গিক হইয়া দাঁড়াইবে। বিশেষতঃ ওকথাটা "জন্ম-কালা" ও

"জন্ম-বোবার" পক্ষেই প্রসিদ্ধ।—অযোধ্যার বনবালা কি প্রকারের "বোবা-কালা," পাঠকমহাশয় তাহা ইতিপূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছেন। সুতরাং "বোবা-কালার" মূল-তর্কের মীমাংসাটী এস্থলে নিষ্প্রয়োজন বুঝিলাম।

যুবাকে এখন ঠারে ঠোরে কথা কহিতে হইবে।—একবার আপনার বুকে হাত দিয়া, মুখে হাত দিয়া, অঙ্গুলীদ্বারা আপনার চক্ষু দেখাইয়া, প্রেম-পিপাসী যুবা সেই বিমুগ্ধা বনবালাকে লজ্জা পরিত্যাগের অনুরোধ বুঝাইলেন। বনবালাকে তিনি যে ভালবাসিয়াছেন, ঠারে ঠোরে সেটুকুও বুঝাইয়া দিলেন। এই-স্থলে বনবালার নেত্রসমীপে একখানি ক্ষুদ্র পত্র প্রদর্শিত হইল। বনবালা লেখাপড়া জানে না। আজন্ম বনবাসিনী,—নবমবর্ষ বয়সে রসনা নিস্তব্ধ,—শ্রবণ বধির। লেখাপড়া শিখিবার অবসর কোথায়?—সম্ভাবনাই বা কোথায়?—বনবালা সে পত্র পড়িতে পারিল না;—কিছুই বুঝিল না;—কেবল যেন উন্মনা হইয়া, ফ্যাল্-ফ্যাল্-চক্ষে পত্রপ্রদর্শকের নয়নপানে চাহিয়া রহিল। তখন যেন তাহার চক্ষে আগেকার ততখানি লজ্জা-সরমের কিছু-মাত্র চিহ্নই রহিল না। পত্রপ্রদর্শক হাস্য করিলেন না।—মুখে হাসিলেন না,—মনে মনে হাসিয়া আবার পূর্ব্বরূপ অঙ্গুলিভঙ্গী, বদনভঙ্গী, নয়নভঙ্গী, সমস্ত ভঙ্গীই আরম্ভ করিয়া দিলেন। ভঙ্গীতে ভঙ্গীতে বুঝাইলেন, সে পত্রে অপর আর কোন কথাই নাই, কেবল তাঁহার নিজের নামটীমাত্র লেখা আছে। নামের সঙ্গে নিবাস, নিবাসের সঙ্গে যতটুকু পরিচয় আবশ্যক, তাহাই মাত্র লেখা;—তাহার মানেই কেবল "নাম।"

বন-নলিনীর নলিন-বদন একটু অবনত হইয়া গেল,

একটু মুদিত মুদিত দেখাইতে লাগিল।—মুদিত,—অথচ কিন্তু, একটু একটু হাসিমাখা প্রফুল্ল। পত্রখানি কম্পিতহস্তে গ্রহণ করিয়া, একটু যত্নপূর্ব্বক মুটী পাকাইয়া, কৌতুকিনী বন-নলিনী আপনার ছেঁড়া কাপড়ের আঁচলে বাঁধিয়া লইল;—মুটো করিয়া ধরিল। আবার তখনি তখনি কি যেন ভাবিয়া,—মনে মনে কি যেন তর্কবিতর্ক করিয়া, আস্তে আস্তে আঁচলের গেরোটা খুলিয়া ফেলিল। বিকম্পিতহস্তে পত্রিকাখানি বাহির করিয়া, আগন্তুকের সমীপদেশে ডানহাতখানি প্রসারিত করিয়া দিল। যুবাপুরুষ বিস্ময়াপন্ন।—কেনই বা যত্নপূর্ব্বক অঞ্চলে বন্ধন, কেনই বা অযত্নে বাহির করিয়া প্রত্যর্পণের আকিঞ্চন, সেটী তিনি কিছুই বুঝিলেন না—ভাব বুঝিতে পারিয়া, বনবালা আবার ভ্রূকুটিভঙ্গীতে ছোট ছোট ইসারা ধরিল। ইসারা করিয়া বুঝাইল, এখন লইব না।—যদি লইতে হয়, যখন সৌভাগ্যবশে সময় আসিবে, তখন লইব।

বিমর্ষবদনে যুবাটী সেই পত্রখানি প্রতিগ্রহ করিলেন।—বিমর্ষ, অথচ যেন কিছু ভবিষ্যৎ আশায় আশ্বস্ত।

প্রভাকর অস্তগমনের উপক্রম করিলেন। বনবালা আকাশ-পানে চাহিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইল। যুবাকে ইসারা করিয়া বলিল, "চলিলাম।" যুবাও পূর্ব্ববৎ ইঙ্গিত-কৌশলে জিজ্ঞাসিলেন, "কল্যও কি সাক্ষাৎ হইতে পারিবে?"

বনবালা উত্তর দিল না।—উত্তর না দিয়াই ধীরে ধীরে সেই তীরভূমি অতিক্রম করিয়া, কাননের সমতল ভূমিতে উঠিল। যুবাটীও সঙ্গে সঙ্গে অনুগামী। যুবাপুরুষ পুনর্ব্বার ইসারায় প্রশ্ন করিলেন, "কল্যও কি সাক্ষাৎ হইতে পারিবে?"

বনবালা আপন বক্ষদেশে বামহস্ত অর্পণ করিল;—আকাশ-পানে দক্ষিণহস্ত উচুঁ করিয়া,—সূর্য্যদেবের গতি বুঝাইল; আবার অবনতবদনে পদতলের তৃণাসন প্রদর্শন করিয়া, ঊর্দ্ধ-দৃষ্টিতে মস্তকে হস্তার্পণ করিল। কে জানে কি বিষাদে অকস্মাৎ দুটী চক্ষে দুই দুই ফোঁটা জল গড়াইল। তাহার পর আর যুবাপুরুষের প্রতি চাহিয়া দেখিতে পারিল না। অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। পরক্ষণেই ভিন্ন ভিন্ন পথে উভয়েরই ভিন্ন ভিন্ন দিকে মৃদু মৃদু গতিসঞ্চার।—ছাগী তিনটী বন-নলিনীর অনুবর্ত্তিনী;—যুবাপুরুষ একাকী।

এই রকমে প্রায় একমাস।—কেহই কিছু জানিল না, কেহই কিছু শুনিল না, কেহই কিছু দেখিল না,—শুধু কেবল দুজনেই দুজনের মনোভাব জানিলেন,—দুজনেই কেবল দুজনের রূপ দেখিয়া ভুলিলেন। গোপনে গোপনে উভয়ের হৃদয়েই নবপ্রেমের নবীন অঙ্কুরের উৎপত্তি;—উভয়ের মনেই নবীন প্রণয়ের নবীন অনুরাগের নবীন সঞ্চার। উঃ! মাসীমাও এই অভাবনীয় নবীন পবিত্র প্রণয়ের বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিলেন না।

যাঁহারা বিধাতার নির্ব্বন্ধ মানেন না, তাঁহারা বনবালার আকস্মিক প্রণয়ের কথা শুনিয়া, আমাদিগকে হয় ত অজ্ঞান মনে করিবেন। কেন না, বনবালা চিরদিন বনবাসিনী,—নবম বর্ষ বয়সে সংসারে মাতৃ-পিতৃ-বিহীনা একাকিনী,—একজন আগন্তুক পুরুষ দর্শনে ইহার হৃদয়ে অকস্মাৎ নব-প্রণয়ের অঙ্কুর জন্মিবে,—প্রণয়ের মুকুল মঞ্জরিত হইবে,—প্রণয়ের কুসুম ফুল ফুটিবে, এ কথা কাহার মনে ছিল? আমরা অদৃষ্টবাদী। বিধাতাই

না। থানাঘর ও ফাঁড়িঘর তাহাদের ভাতঘর। পথ দেখাইয়া দেখাইয়া, চৌকীদার সেই মৌনবতী কামিনীটিকে নিকটবর্ত্তী ফাঁড়িঘরে লইয়া গেল। ফাঁড়িতে একজন চৌগোঁফ্ফা মুসলমান ফাঁড়িদার একখানা খাটিয়ায় বসিয়া গুড়্গুড়ি টানিতেছিল। চৌকীদার মোতায়েনে আসামী দর্শন করিয়া আহ্লাদে বলিয়া উঠিল, "কেয়া খবর ?"

চৌকীদারমজুকুর দস্তুরমত এজেহার দিল,—যাত্রাদলের চতুরা দূতীর মত প্রকাশ করিয়া বলিল, "কথা কয় না, ইসারা করে।"—ফাঁড়িদার বুঝিল, ছেনাল। দুইজন বরকন্দাজের প্রতি আসামীর পাহারায় থাকিবার হুকুমজারী করিতে যাইতেছিল, ঠিক সেই সময় চৌকীদার ঐ কামিনীদত্ত কাগজখানা তাহার হাতে দিল। কাগজখানা নিতান্ত ছোট নহে, দিব্য লম্বাচওড়া, দুই পৃষ্ঠে ঠাস্ লেখা; একদিকে নাগরী, অন্য দিকে বঙ্গাক্ষর। হরিণবাড়ীর ফাঁড়িদার এই দুই ভাষাতেই পরম পণ্ডিত! ফাঁড়িদারও চৌকীদারের মত কাগজখানার এপিঠ ওপিঠ দেখিয়া, দুই তিনবার আঘ্রাণ লইল। শিকারী কুকুরেরা আঘ্রাণ লইয়া শিকার করে, হরিণবাড়ীর ফাঁড়িদার আঘ্রাণ লইয়া শিকার করিতে পারিল না! গোঁফ ফুলাইয়া চৌকীদারকে জিজ্ঞাসা করিল, "পার্সী মে কুছ্ দলীল হ্যায় ?"

চৌকীদার উত্তর করিল, "সবে মাত্র ঐ।"—ফাঁড়িদার মহা ফাঁপরে পড়িয়া গেল। বারকতক হস্তপ্রসারণে পক্ক শ্মশ্রুতে তরঙ্গ খেলাইয়া, খুব জোরে জোরে গুড়্গুড়ি টানিয়া, দুই একবার নয়ন মুদ্রিত করিল। একবার চায়, একবার অন্ধ

হয়। হঠাৎ চমক ভাঙ্গিয়া গেল;—চৌকীদারকে বলিল, "যাও, তরুণবাবুকো বোলাও!—জল্‌দি!"

থানাদার ও ফাঁড়িদারদের আদব-কায়দা বেশ!—আসামীর প্রতি বসিবার হুকুল হইম না। বিষাদিনী রমণী কম্পিতগাত্রে, অবনত বদনে, একস্থানেই স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। চৌকীদার চলিয়া গেল। একটু পরেই তরুণবাবুকে লইয়া চৌকীদারের পুনঃপ্রবেশ।

তরুণবাবু কাঁচাঘুমে উঠিয়া আসিয়াছেন, বিরক্ত হইয়াই আসিয়াছেন,—মুখে কিছুই বলিলেন না,—মুখের ভঙ্গীতেই সেই বিরক্তিলক্ষণটা বিলক্ষণ বুঝা গেল।

তরুণবাবু তরুণবয়স্ক যুবা-পুরুষ। শরীরে ও মনে তরুণ-বয়সের উপযুক্ত একটু একটু তেজ আছে। ফাঁড়িদারকে তিনি কহিলেন, "এত রাত্রে কি দরকার?"

"ফাঁড়িদার বাঙ্গালা করিয়া উত্তর করিল, "দলীল পরিতে হইবে। সোবে হয়, চোড়া-মাল।"

তরুণবাবু মাঝে মাঝে ফাঁড়িতে আসিয়া ফাঁড়িদারের নামের পরওয়ানা ইত্যাদি পড়িয়া দিয়া যাইতেন,—ফাঁড়িদারের সঙ্গে তাঁহার একটু একটু বন্ধুত্বও ছিল;—ঘুম ভাঙ্গানো অপরাধে চৌকীদার অপরাধী;—ফাঁড়িদার নহে;—কিম্বা ফাঁড়িদারের হুকুমে চৌকীদার সেই দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে;—সুতরাং ফাঁড়িদার নিজেই অপরাধী।—মানসিক কল্পনায় এইরূপ আলোচনা করিয়া, তরুণবাবু পূর্ব্ববৎ বিরক্তভাবেই একটু উগ্রস্বরে কহিলেন, "কি দলীল?—কৈ দলীল?—কিসের দলীল?—দেখি!"

খাটিয়ার হাত চাপড়াইয়া ফাঁড়িদার কহিল, "বয়েন!"

তরুণবাবু জানিতেন, মুসলমানের গা-ঘেঁসিয়া বসিলেই পেঁয়াজের গন্ধ নাকে আসে। তরুণবাবু পেঁয়াজ খাইতেন না, পেঁয়াজের দুর্গন্ধ তাঁহার পক্ষে নিতান্তই অসহ্য বোধ হইত। তিনি ফাঁড়িদারের সমাদর মান্য করিলেন না, বসিলেন না, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই তাচ্ছিল্যভাবে কহিলেন, "দাঁড়াইয়া দলীল-পড়া আমার অভ্যাস আছে, বসিতে হইবে না, দাঁড়াইয়াই পড়িয়া দিতেছি।"

দলীলখানি হস্তান্তর হইল। ফাঁড়িদারের হস্ত হইতে তরুণবাবুর হস্তে গেল।—আসামীস্থলাভিষিক্তা বিষাদিনী কামিনী এই সময় নতবদনে বক্রকটাক্ষে নির্নিমেষে তরুণবাবুর দিকে চাহিয়া রহিল। তরুণবাবু দলীল পড়িবার চেষ্টা করিলেন। এ চেষ্টাটীও বিভ্রাটশূন্য হইল না। কাগজের যে দিক্‌টী তাঁহার নেত্রসমীপে অগ্রে উপস্থিত হইল, সে দিক্‌টীতে নাগ্‌রী লেখা;—নাগ্‌রীতে তরুণবাবুর বর্ণ-পরিচয় নাই। তিনি ভাবিলেন, বৃথা কষ্ট।—উচ্চারণ করিলেন, "বৃথা ডাকা হইয়াছে, নাগ্‌রী আমি জানি না।"

হাস্য করিয়া ফাঁড়িদার কহিল,"পর পিঠ ধরেন, "পরিষ্কার বাঙ্‌লা পাবা।"

তরুণবাবু কাগজখানা উল্‌টাইয়া ধরিলেন। দেখিলেন, বেশ স্পষ্ট স্পষ্ট বাঙ্‌লা লেখা। সর্ব্বাগ্রে মনে মনে দুই বার পাঠ করিয়া, কতকটা আয়ত্ত করিয়া লইলেন। শেষে দস্তুরমত ডাক ছাড়িয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন। সে পড়াটাও জড়িবটী পড়ার সামিল।—কোথায় কর্ম্ম, কোথায় কর্ত্তা, কোথায় ক্রিয়া, কোথায় ছেদ, কোথায় বিচ্ছেদ, কিছুই রাখিতে পারিলেন না।

পড়িতে হয়,পড়িয়া দিলেন মাত্র!—বুঝিতে হয়, ফাঁড়িদার তাহা বুঝিল মাত্র। যাহার দলীল, সেই অভাগিনী আসামী-বালা সমস্তই হয় ত জানিত,—সমস্তই বুঝিল না;—আর কেহই হয় ত কিছুই বুঝিতে পারিল না। যিনি পড়িলেন, তিনিও না। কাগজখানি ফিরাইয়া দিয়া, ফাঁড়িদারকে সেলাম ঠুকিয়া, তরুণ-বাবু বিদায় হইলেন। পথে পথেই ঘুম তাঁহাকে বড়ই অবসন্ন করিয়া ফেলিল। যথাস্থানে প্রবেশ করিয়া তিনি, কাঁচা ঘুমকে পাকাইবার উপক্রম করিলেন।

এখন আমরা করি কি?—দলীল ত পড়া হইয়া গেল,—এখন পাঠকমহাশয়কে বুঝাই কি? একটুমাত্র ভরসা আছে। তরুণ-বাবুর নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা সেই দলীলের বাঙ্‌লা ভাবার্থটুকু একটু একটু বুঝিয়াছি। অতিমাত্র-সংক্ষেপে এক প্রকাণ্ড ইতিহাস!—এ রাত্রে সে ইতিহাস গল্প করিয়া সমাপ্ত করা যাইবে না;—তত সংক্ষেপে বলিয়া দিলেও পাঠকমহাশয় বুঝিবেন না। আমাদের নিজের ভাষায় একটু বিস্তৃত করিয়া বলিবার প্রয়োজন হইবে। এখন কেবল স্থূল স্থূল গুটীকতক সার-কথা বুঝাইয়াই এই কল্পের উপসংহার করি।

মেয়েটী অযোধ্যা হইতে আসিয়াছে। নগরীতে ইহার বাস নহে,—মেয়েটী বনবাসিনী। শ্রবণশক্তি-বাক্‌শক্তি, উভয়ই ছিল, সপ্তমবর্ষ বয়ঃক্রমকালে, কোন এক দৈব-দুর্ঘটনায় শ্রবণশক্তি, বাক্‌শক্তি, উভয়ই রহিত হইয়াছে। ইহার মাতাপিতা কে, তাহা নিঃসংশয়ে প্রকাশ নাই। মাতৃপিতৃ-বিয়োগে, একটী বনবাসিনী বৃদ্ধা মাসীর আশ্রয়ে প্রতিপালিতা হইয়াছে। সপ্তমবর্ষাবধি যৌবন-কাল পর্য্যন্ত বনে বনে ছাগল চরাইয়া বেড়াইয়াছে; মাসীও

এখন মরিয়াছেন। বনমধ্যে কোন এক যুবাপুরুষের সহিত হঠাৎ ইহার সাক্ষাৎ হয়। তখন ইহার তরুণ যৌবন। রূপ আছে, লাবণ্য আছে, নয়নেও দিব্য আকর্ষিণী শক্তি আছে। হইল হইল বোবা, তাহাতে কি?—সেই যুবাপুরুষের প্রতি ইহার অনুরাগ সঞ্চার হয়। বনমধ্যে মাল্য-বিনিময়ে এক প্রকার মনোগত বিবাহও হয়। সেই যুবাপুরুষ ইহার হস্তে ক্ষুদ্র একখানি পত্র দিয়া যান। সেই পত্রের সহিত যোগ করিয়া, বনবালার জীবন-কাহিনী এই তরুণবাবুর পঠিত দলীলে সংক্ষেপে সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। স্থূল কথা, মেয়েটী অযোধ্যাবাসিনী, ইহার পিতা শ্রীবৃন্দাবনধামের এক জন ব্রজবাসী। রামচন্দ্রের লীলাক্ষেত্র দর্শনাভিলাষে সস্ত্রীক অযোধ্যাপুরীতে আসিয়াছিল। তদবধি আর বৃন্দাবনে ফিরিয়া যায় নাই। অযোধ্যার অরণ্য-মধ্যেই এই বনবালার জন্ম হয়, অযোধ্যার বনমধ্যেই বিবাহ হয়। বিবাহের পর এক মাসমাত্র স্বামী-সহবাস ঘটিয়াছিল, এখন গর্ভবতী। বিবাহকর্ত্তা এ বৃত্তান্ত জানেন না;—বিবাহের এক মাস পরেই উভয়ের পরস্পর আকস্মিক বিচ্ছেদ ঘটে।—স্বামীর উদ্দেশেই এই বিরহিণী বিষাদিনী কামিনী বঙ্গদেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কত স্থান ভ্রমণ করিয়াছে, এ দলীলে তাহা লেখা নাই। এখন দেখিতেছি, বনবালা হুগলী জেলায়। বনবালার জীবনকাহিনীর গর্ভস্থ বিবরণ অত্যন্ত অদ্ভুত;—কেমন অদ্ভুত, পাঠকমহাশয় তৃতীয় কল্পে তাহা দর্শন করুন।

তৃতীয় কল্প।

বন-নলিনী।

তরুণবাবু যে দলীলখানি পাঠ করিয়া গেলেন, সেখানি খোলসা বাঙ্গালা;—তরুণ-বাবুর পড়িবার দোষে আমরা সেই খোলসাটীকে কতক কতক অ-খোলসা করিয়া বুঝিয়াছি। এই গেল এক দফা;—দ্বিতীয় দফার কৈফিয়তে পূর্ব্ব-কল্পেই আমরা একটু আভাস দিয়াছি, পত্রখানি নিতান্তই সংক্ষিপ্ত। সেই সংক্ষিপ্তকে এখন বিস্তৃত করিবার প্রয়াস পাইতে হইবে। কেবল বিস্তৃত করিলেই চলিবে না, সকলে যাহাতে ঐ হরিণ-বাড়ীর ফাঁড়িঘরের মধ্যবর্ত্তিনী কামিনীর পরিচয়টী সম্ভবমত বুঝিয়া লইতে পারেন, সংক্ষেপের উপর সেই চেষ্টাই আরও কিছু বেশী আবশ্যক। এই কারণে কল্পটী যদি কিছু দীর্ঘ হয়, পাঠকমহাশয়েরা ক্ষমা করিবেন। অধীর হইবেন না,—বিরক্ত হইবেন না,—রস পাইবেন।

দলীল বলিতেছে, এই কামিনীটী অযোধ্যাবাসিনী। অযোধ্যা-বাসের যেরূপ হেতুবাদ পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে, তাহাই মান্য করিয়া মঞ্জুর করা গেল, বনবালাটী অযোধ্যাবাসিনী। ইহার যখন সপ্তমবর্ষ বয়ঃক্রম, সেই সময়, ইহার পিতা কোন একটী বিশেষ কার্য্যান্তরে দাক্ষিণাত্য-প্রদেশে গমন করেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী, (এই বনবালার গর্ভধারিণী জননী) পতির বিদেশ-যাত্রার সময় সহসা জিজ্ঞাসা করেন, "কত দিনে ফিরিবেন?"

পতি উত্তর দেন, "পূর্ণ দুই বৎসর বিচ্ছেদের পর, অদ্য হইতে তৃতীয় বর্ষের এমন দিনে ফিরিব।" এই প্রবীণ দম্পতীর অকৃত্রিম নিঃস্বার্থ প্রণয়, তাঁহাদের উভয়কেই যেন এক প্রকার ঐশ্বরিক সত্যপাশে আবদ্ধ করিয়াছিল;—পতি যখন পত্নীকে যে কথাটী বলিতেন, ঠিক সেই বাক্যানুসারেই সত্যপালন করিতেন। পত্নীও ঐরূপ। বনবালার পিতা যেদিন ফিরিয়া আসিবেন বলিয়া গেলেন, পতির প্রথমযাত্রার দিবস হইতে বনবালার মাতা সেই বিনির্দ্দিষ্ট ফিরিবার দিনটী নিত্য নিত্য গণনা করিতে আরম্ভ করিলেন।—মাঝে মাঝে ভাবেন, যেন সেই শুভ দিন সমীপবর্ত্তী। দিন আসিবার যখন ছয় মাস বাকী, সেই সময় সাধ্বী সতী এক দিন নিশাকালে স্বপ্ন দেখেন, দিন আসিয়াছে, তিনি যেন পতির পার্শ্বে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন;—পতি তাঁহাকে বিদেশ-ভ্রমণের চমৎকার চমৎকার গল্প শুনাইতেছেন; বনবালার শুভবিবাহের দিনস্থির হইতেছে।—অপূর্ব্ব স্বপ্ন!—প্রেমময় স্বপ্ন!—দেবদুর্ল্লভ স্বপ্ন!—পতিব্রতার পুণ্য হৃদয়ে এমনি এমনি শুভস্বপ্নই দিবানিশি জাগিয়া জাগিয়া খেলা করে!

ছয় মাস গেল।—দিন আসিল।—পতি যখন গৃহ হইতে শুভযাত্রা করেন, পতিব্রতা তখন পতির সহচারিণী হইয়া অৰ্দ্ধ-ক্রোশ পথ পর্য্যন্ত অনুগামিনী হইয়াছিলেন। অৰ্দ্ধক্রোশের মাথায় একটী বহুকালের প্রাচীন বট-বৃক্ষ। সেই বটবৃক্ষতলে উভয়ের প্রেমাশ্রুধারে উভয়েই অভিষিক্ত হন। সেই বটবৃক্ষতলেই সেই সুধাময়ী দম্পতীর অচিরস্থায়ী,—কিম্বা হয় ত চিরস্থায়ী,—এই চিরাচিরের মীমাংসাটী কেবল ভগবান্ জানেন;—স্থূল কথা, এই বটবৃক্ষতলেই সেই সুধাময়ী দম্পতীর পরস্পর বিচ্ছেদ ঘটে।

বনবালার জননী সেই বিচ্ছেদকালের মধ্যে মাসে মাসে প্রায় দুইতিনবার সেই বিচ্ছেদমূল বটবৃক্ষমূলটী দর্শন করিয়া আসিতেন। যেদিন নিশ্চয় ফিরিবার কথা, সেই দিন উষা-কালেই বনবালার জননী যেন, উল্লাসে উন্মাদিনী হইয়া, দুঃখপ্রদ বৃক্ষকে সুখপ্রদ ভাবিয়া, দ্রুতপদে ছুটিয়া ছুটিয়া, সজীব আগ্রহে সেই বটবৃক্ষতলে গমন করিলেন।

বলিতে ভুল হইয়াছে, বনবালার একটী ভাই ছিল। পিতা যখন দাক্ষিণাত্যে যাত্রা করেন, তখন সেই শিশুটীর বয়ঃক্রম এক বৎসরমাত্র। এখন সেটী তিন বৎসরের হইয়াছে। বন-বালার মাতা সেই তিন বৎসরের শিশুকে নবমবর্ষীয়া ভগিনীর কাছে ফেলিয়া রাখিয়া, পতির সহিত শুভ-সম্মিলন-কামনায় পতির উদ্দেশে চলিয়া গিয়াছেন। বালিকা-সুলভ স্নেহবশে বনবালা ঐ ছোট ভাইটীকে কত প্রকার আদর করিয়া, অঙ্গুলী চুষাইয়া,—ঘন ঘন দুধ খাওয়াইয়া,—কত প্রকার খেলায় ধূলায় ভুলাইয়া রাখিতেছে।

বেলা দুই প্রহর। জননী ফিরিলেন না। শিশুটী আধ আধ স্বরে দুইতিনবার যেন বিমর্ষ হইয়া, বনবালাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা কোথায়?—মা কেনু এলো না?"—বনবালাও বিমর্ষ হইয়া উত্তর দিল, "তুমি চুপ্ কর,—মা এলো বোলে!"

সন্ধ্যা হইল। জননী ফিরিলেন না। নবম-বর্ষীয়া বালিকা বনবালা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, ভাইটীও ধূলায় পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে গড়াগড়ি খাইতে লাগিল। সহসা আকাশ-মণ্ডল ঘোর ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গেই জোর বাতাস;—বাতাসের একটু পরেই বৃষ্টি;—মুষলধারে

বৃষ্টি !—সে বৃষ্টিতে সাপের মুখ ছিঁড়িয়া যায় !—ভারি দুর্যোগ ! গগনে জলদমালার ঘোরতর হুহুঙ্কার ;—সর্ব্বজীবের নয়নদাহন ক্ষণপ্রভার ভয়ঙ্কর চক্‌মকী ! শূন্যপথে ভীষণ বজ্রপাতধ্বনি ! বোধ হইল যেন, এককালে দশদিক ব্যাপিয়া অনবরতই বজ্রপাত হইতেছে ! নিকটের একটা বিপর্য্যয় বজ্রাঘাতধ্বনিতে বনস্থলী কাঁপিয়া উঠিল !—বনবালাদের ঘরের চাল ফুঁড়িয়া, ঘরের ভিতরেই বজ্রপাত হইল !—সেই জীবকম্পন বিভীষণ শব্দেই বনবালার ভাইটী মরিয়া গেল ! বনবালারও বাক্‌শক্তি, শ্রবণশক্তি, দুটী ইন্দ্রিয়ের দুটী শক্তিই, সেই ভীষণ অশনি-নিনাদে, অকস্মাৎ স্তম্ভিত হইয়া, তৎক্ষণাৎ রহিত হইয়া গেল !!! এত বড় হৃদয়-বিদারণ, লোমহর্ষণ, ভয়ঙ্কর ঘটনা অতিবড় শত্রুরও যেন না হয় ! বনবালার অভাগিনী জননীও আর একটী মহাবজ্রাঘাতে সেই বটবৃক্ষমূলেই প্রাণত্যাগ করিলেন !!! পুত্র-কন্যার কি দশা হইল, কিছুই জানিলেন না ;—পতিও আর ফিরিবেন কি না, তাহাও ভাবিলেন না। অযোধ্যার বনবাসে বনবালার চক্ষে সমস্ত পৃথিবীই অন্ধকারময় বোধ হইতে লাগিল ! আদরের ভাইটী বজ্রাঘাতে জীবনশূন্য হইয়া, ভূমিতলে পড়িয়া রহিয়াছে ! ভীষণধ্বনিতে যতক্ষণ মূর্চ্ছা ছিল, বনবালা ততক্ষণ এ দুর্দ্দশা দেখিতে পায় নাই ! যখন চৈতন্য হইল, তখন দেখিল, মরা ভাই !—ডাক ছাড়িয়া কাঁদিবার জন্য বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল, কাঁদিবার শক্তি নাই। বজ্রাঘাতে বাক্‌রোধ হইয়া গিয়াছে ! উঃ ! কি ভীষণ যন্ত্রণা ! চক্ষের জলে সর্ব্ব শরীর ভাসিয়া যাইতেছে ;—কাটা ছাগলের মত ভূতলে পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছে ;—বনবালা কাঁদিতে পারিতেছে না !

আমিও বলিতে পারিতেছি না।—চিরদুঃখিনী বনবালার নূতন দুঃখের যন্ত্রণার কথা, বনবালা যেমন কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রকাশ করিতে পারিতেছে না,—কাঁদিতে না পারিয়া, বালিকা বনবালার হৃদয়ে যে, কি ভয়ানক যন্ত্রণানল গুমিয়া গুমিয়া জ্বলিতেছে, তদনুসারে বনবালার বুকের ভিতরের দুঃখের কথা আমিও আর বলিতে পারিতেছি না!

পাঠকমহাশয়! ভাবিয়া দেখুন,—ক্ষণকাল মনে মনে চিন্তা করুন—কল্পনার পদে আশ্রয় গ্রহণ করুন, অভাগিনী বনবালার তখনকার দুর্দ্দশার কথা, অবশ্যই, আপনা হইতেই, হৃদয়পটে আসিয়া সমঙ্কিত হইবে।

সংসারে বনবালা একাকিনী!—বনবালা থাকিয়াও বনবালা এত দিন বরং একটু একটু গৃহবালা হইয়া ছিল, এখনকার বনবালা যথার্থই নিঃসহায়িনী বনবালা!

যে সময়ের কথা হইতেছে, সে সময় যদিও এদেশে দিল্লী-শ্বরের দোহাই চলিত, তথাপি কিন্তু, প্রতাপ-কুহকশালী বণিক্-বেশী ইংরেজের চিত্র-বিচিত্র ধ্বজাপতাকা তখন বঙ্গদেশের চতু-র্দ্দিকেই ফুরফুর করিয়া উড়িতেছিল। বেশীর ভাগ হুগলীতে আর মুরশীদাবাদে।—কেন না, তাহার অতি অল্প দিন পরেই অভাগা সিরাজকে নিহত করিয়া, পলাসীর যুদ্ধে লর্ড ক্লাইবের জয়ডঙ্কা বাজিয়া উঠে। সেই সময় বঙ্গদেশে একবার কাপড়ের কারবারে আগুন লাগে! তন্তুবায়-প্রধান শোভারাম বসাকের শোচনীয় দুর্দ্দশা-নাটকের অভিনয় হয়! সেই সময় দিনাজপুরের এরাটুন সাহেবের ত্রিশলক্ষমণ লবণপূর্ণ নুনের গোলা ইংরেজেরা লুট করে। সে দিনটী যে, ভারতবর্ষের কেমন দিন, আমাদের

শ্রদ্ধাস্পদ ভবিষ্যপুরাণকর্ত্তা পণ্ডিত মহাশয়েরা ত্রেতা দ্বাপরের রামযুধিষ্ঠিরাদির সময়ের সহিত ভাবী যীশুখ্রীষ্টের জন্মের পর এক সহস্র সাত শত সপ্তপঞ্চাশত্তম অব্দের সম্মিলন-সামঞ্জস্য করিয়া দেখিলেই সর্ব্বসাধারণকে সেটী বিলক্ষণরূপে বুঝাইয়া দিতে পারিতেন।

কেহ কেহ হয় ত হাসিবেন,—কেহ কেহ হয় ত উল্লাসে বগল বাজাইবেন,—কেহ কেহ হয় ত সিরাজ-উদ্দৌলার হস্ত হইতে পরিত্রাণের নিমিত্ত লর্ড ক্লাইবের নামে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ অর্পণ করিবেন। এখন যাঁহারা ইংরেজের আফিসে ঘন ঘন কেরাণীগিরি চাকুরী পাইতেছেন, তাঁহারা ত সেই শুভদিনকে বঙ্গের জন্মতিথির ন্যায় পূজা করিয়া, সভক্তি পুষ্পাঞ্জলি উপহার সমর্পণ করিবেন, সন্দেহ নাই। আমরাও এদেশে ইংরেজ-রাজপতাকা দর্শন করিয়া নিত্য নিত্য সুখী হইতেছি। ভারতের রাজভক্তি সর্ব্বত্রই সুপ্রসিদ্ধ।

এত কথা বলিবার প্রয়োজন কি?—প্রয়োজন আছে।—বনবালার কাহিনী কহিতে কহিতে পলাসীর যুদ্ধের ইতিহাস আসিয়া পড়িল কিজন্য!—জন্যটীও দূরবর্ত্তী নহে।—কথাটা হাস্যকর হইলেও নিতান্ত নিষ্ফল ভাবিবেন না। বনবালাকে আমরা বনবাসিনী বলিয়া পরিচয় দিতেছি। বনবালার মাতাপিতা অযোধ্যায় আগমন করিয়া বনবাস আশ্রয় করিয়াছিলেন। এই প্রমাণেই বুঝিতে হইবে, ধর্ম্ম-কামনায় বনবাস আশ্রয় করা ভারতে অনেক সাধু-পুরুষের ও সাধুপ্রকৃতির নিত্যব্রত ছিল। প্রাচীনকালে প্রবীণ ঋষি-তপস্বীগণের বনবাস আশ্রয় ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। প্রাচীন প্রাচীন রাজারাও পুত্রকে

যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বনবাসী হইতেন। আরও অনেক স্থলে অনেক প্রকার ভিন্ন-ভিন্নাশ্রমী বনবাসীর উল্লেখ পুরাণ-শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। এটী ছিল সাধারণতঃ প্রাচীন কালের প্রথা। এখন এপ্রকার দৃষ্টান্ত নিতান্তই বিরল দেখিতে পাইবেন। বিরল হইলেও স্বীকার করিতে হইবে, স্থানে স্থানে আছে। এই কারণেই ইতিহাস-মিলনের জন্য একটী সময় নির্ণয় করা আবশ্যক।—পলাসীর যুদ্ধের উল্লেখ করিয়া আমরা সেই সময়-নির্ণয়ের একটু ভূমিকা করিয়া রাখিলাম মাত্র। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যার অরণ্যে বনবাসীর আশ্রম দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। বনবালার পিতা কত দিন পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন, তাঁহার পরিবারের ঘটনাবলীর কথাটা কত দিনের কথা, কোন পাঠকের হৃদয়ে এই প্রশ্নটী উত্থিত হইবামাত্রই, এই পলাসীযুদ্ধের বর্ণনাটুকু তাহা ঠাণ্ডা করিয়া দিবে।

সংসারে বনবালা একাকিনী।—কাঁদিবার শক্তি নাই! কাঁদিবার জন্য সমস্ত রাত্রি কোমল কণ্ঠদেশে রাশি রাশি বাষ্প [illegible] করিল, একবারও কাঁদিতে পারিল না!

রজনী প্রভাত হইয়া গেল। সূর্য্যদেব আগমন করিলেন। বালিকা বনবালা অশ্রুধারে ভাসিয়া করজোড়ে সূর্য্যদেবকে প্রণাম করিল। আধ আধ মন্ত্র পড়িয়া স্তব করিতে পারিল না! অঙ্গুলী নির্দ্দেশে সূর্য্যদেবকে মৃত শিশু দেখাইল! চক্ষের শতধারার উপর, আরও যেন সহস্রধারা বাড়িল! সূর্য্য তাহার শৈশব-লোচনের জলধারা দেখিলেন, দয়া করিলেন না!—সকলেরই চক্ষে জলধারা দেখেন,—যাহারা কাঁদিতে জানে, সূর্য্য তাহাদের সকলেরই চক্ষে জলধারা দেখেন, দয়া করেন না!

অহো! পরমদয়াল দেবতারাও এক এক সময় নির্দ্দয় হন! বনবালার দুঃখ দেখিবার জন্য সূর্য্যদেব ক্ষণকালও একস্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন না।

সূর্য্যদেব চলিলেন।—চলিতে চলিতে মানুষের মাথার উপর আসিয়া দেখা দিলেন। বনবালার যেন ক্ষুধাতৃষ্ণা, সমস্তই ফুরাইয়া গিয়াছে!—ক্ষণকাল স্থির হইয়া কি যেন চিন্তা করিল, কি যেন মনে পড়িল,—এলোকেশে, ধূলিধূসরিত অঙ্গে, বনবালা দ্রুতপদে গৃহ হইতে ছুটিয়া বাহির হইল। বনে বনে অনেক দূর গেল।—কতদূর গেল, বনবালা তাহা জানিত। লক্ষ্যস্থলে উপস্থিত হইয়া, একটী বৃদ্ধা তপস্বিনীকে সঙ্গে করিয়া আনিল। বালকের মৃতদেহ দর্শনে তপস্বিনী বিস্তর অনুতাপ করিলেন। অনুতাপের কিছুই ফল নাই, তপস্বিনীর শীতল হৃদয় সেই মীমাংসায় প্রবুদ্ধ হইয়া, অল্পক্ষণমধ্যেই শান্তভাব ধারণ করিল। তপস্বিনী নিজহস্তে গর্ত্ত খুঁড়িয়া, সেই দুগ্ধপোষ্য আদরের পুতুলটীকে কিঞ্চিৎ দূরে মাটীর ভিতর পুতিয়া রাখিলেন!!! বনবালাকে সঙ্গে করিয়া তিনি আপন আশ্রমে লইয়া গেলেন। বনমধ্যে বনবালার পিতৃগৃহখানি শূন্য পড়িয়া রহিল!

বনবালাকে বার বার বনবালা বলিয়া পরিচয় দেওয়াতে বোধ হয়, শ্রুতি-লালিত্যের কিছু ব্যাঘাত হইতেছে। বনবালাকে আর সর্ব্বদা বনবালা বলিব না। বনবালার একটী চমৎকার নাম পাওয়া গিয়াছে। ঐ আশ্রয়দায়িনী প্রাচীনা তপস্বিনীই সেই নামটী বাহির করিয়া দিয়াছেন। বনবালার নাম বন-নলিনী। এই স্নেহময়ী তপস্বিনীটী আমাদের বন-নলিনীর মাসী হন। মাসীর আশ্রয়েই বন-নলিনী সম্ভবমত যত্নে প্রতিপালিতা হইতে

থাকিল। তপস্বিনীর তিনটী ছাগী ছিল।—তিনটীই দুগ্ধবতী। একেকালে দুগ্ধ হয় না,—ঠিক পর পর উত্তম সামঞ্জস্য থাকে। তপস্বিনী দিবারাত্রির মধ্যে কেবল সেই ছাগীদুগ্ধ ভিন্ন আর কিছুমাত্র আহার করেন না। বন-নলিনীর প্রতি সেই ছাগী-তিনটীকে পার্শ্ববনে চরাইয়া আনিবার ভার হইয়াছে। বন-নলিনী নিত্য নিত্য আমোদিনী হইয়া সেই কাজ করে। বেলা এক প্রহরের পর আহার করিয়া বনে যায়, সন্ধ্যা হইবার ঠিক পূর্ব্বক্ষণেই ঘরে ফেরে। তপস্বিনী তাহাকে খুব ভালবাসেন, যথেষ্ট স্নেহ করেন।

দিন কখনই দ্রুতগামী নহে,—দিন কখনই ধীরগামী নহে, দিন সর্ব্বদাই সমগামী।—দিন শীতকালেও বড় হয় না, গ্রীষ্মকালেও ছোট হয় না। বনবালার দুঃখের দশা পড়িয়াছে, তাহার দিন ঘন ঘন যাইতেছে,—কিম্বা থাকিয়া থাকিয়া চলিতেছে,—একথাটী বলিবার যো নাই। দিন যেমন যাইবার, ঠিক তেমনিই যাইতেছে, কেবল সুখী-দুঃখীর হৃদয়েই হ্রস্বদীর্ঘ বোধমাত্র। বনবালার দিন যাইতেছে। বনবালা ষোড়শী।

বন-নলিনী যেদিকে ছাগী চরায়, সেই দিকে বনের ভিতর একটী ক্ষুদ্র জলাশয় আছে। তাহার তীরভূমি দিব্য দিব্য নবীন তৃণদলে পরিশোভিত;—বসিয়া জুড়াইবার স্থান। তীরভূমি কিছু উচ্চ;—উপরে মানুষ দাঁড়াইলে নীচের মানুষকে শীঘ্র শীঘ্র দেখিতে পায় না। জলাশয়ের সমতল হইতে তীরভূমির উচ্চভাগ পর্য্যন্ত একভাবে ঢালু নহে। মাঝে মাঝে সোপান-মঞ্চের ন্যায় ঠিক যেন স্বভাবসিদ্ধ বসিবার স্থান। তাহার উপরেও নব নব তৃণদল বিরাজিত। হঠাৎ দেখিলেই বোধ

অদৃষ্টের বিধাতা,—এই জন্যই আমরা জোর করিয়া বলিব, বনবালার প্রণয়-সঞ্চারটী বিধাতার নির্ব্বন্ধ।

একমাস অতীত হইয়া গিয়াছে। একদিন অপরাহ্নে, বনবালা একটী গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া,—সেই কাননমধ্যস্থ সরসী-সোপানে একজন আশু পরিচিত যুবাপুরুষের মস্তকে যেন ছত্র ধারণ করিয়া রহিয়াছে। যুবাও মাঝে মাঝে রহস্য করিয়া, তরুণীর করধৃত তরুশাখাটী স্নেহাদরে আপন করে ধারণ করিয়া, ছত্রধারিণীর মস্তকের উপর ছায়া দান করিতেছেন। উভয়ের ওষ্ঠাধরেই মৃদু মৃদু প্রেমের হাসি। একটী গোড়ার কথা ভুলিয়া যাইতেছি। বনবালা আজ বনমালা পরিয়া অপূর্ব্ব বনবালা সাজিয়াছে! মাল্যগ্রন্থিত পুষ্পগন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত করিতেছে। বনবালা আবার বিচঞ্চলহস্তে যুবাপুরুষের হস্ত হইতে শাখা-ছত্রটী আকর্ষণ করিয়া, নিজেই আবার ছত্রধারিণী হইয়াছে। সব ভাল, কেবল একটীমাত্র আক্ষেপ। বনবালার কথা কহিবার শক্তি নাই!—বনবালা বোবা!—কথা কহিবার শক্তি থাকিলে, এই সুনবীন প্রণয়ক্ষেত্রে কতই আনন্দমঞ্জরী বিকসিত হইত!—বনবালার কথা কহিবার শক্তি থাকিলে, এই সুনবীন বিজন প্রণয়সাগরে যে কতই সুবিমল আনন্দলহরী খেলা করিয়া বেড়াইত, পাঠকগণের মধ্যে যাঁহারা প্রেমতত্ত্বের নবীন পথিক, তাঁহারা সেটী অনুভবে বুঝিয়া লইতে পারিবেন।

বনবালার আজ আর সূর্য্যপ্রতি দৃষ্টি নাই। সরসীতীরে ছাগী চরিতেছে, সে কথাও যেন মনে নাই। বিলম্ব হইলে মাসী মা ব্যস্ত হইয়া অন্বেষণে আসিবেন, তাহা ভাবিয়াও কিছু মাত্র শঙ্কা আসিতেছে না। জীবনের মধ্যে কখনো একদিন

যতটুকু আমোদিনী হয় নাই, বন-নলিনী আজ তার চেয়েও বেশী আমোদিনী;—নবীন প্রণয়ে উন্মাদিনী হইয়াই আমোদিনী। সূর্য্যদেব অনেকক্ষণ অস্ত গিয়াছেন। আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে; চাঁদের কিরণে বনভূমি আলো হইয়াছে। বনবালা কিছুই দেখিতেছে না। যাঁহাকে দেখিয়া, কিছুই দেখিতেছে না, যাঁহাকে দেখিয়া, সংসারের সমস্ত বস্তুই ভুলিয়া রহিয়াছে, তিনিও যে, ঐ নয়নমোহিনী বন-নলিনী ছাড়া, প্রশস্তচক্ষে প্রকৃতি-বক্ষে আর কিছু দেখিতেছেন, সে তর্কটাতেও আমাদের সমূহ সন্দেহ। কতক্ষণ সন্ধ্যা হইয়াছে, কতক্ষণ চাঁদ উঠিয়াছে, রাত্রিই বা কত হইয়াছে, বনবালা অথবা বনবালার পার্শ্ববর্ত্তী যুবার মানসিক জ্ঞানে তাহা সম্পূর্ণরূপে অপরিজ্ঞাত। রাত্রিও বাস্তবিক বড় বেশী হয় নাই। অনুমান বড় জোর চারিদণ্ড মাত্র। ইঙ্গিতের কৌতুকে পলকে পলকে প্রেমিক-প্রেমিকা, উভয়েই একপ্রকার বিমুগ্ধ।—এই বিমুগ্ধাবস্থায় বিমুগ্ধা বালা একবার সস্নেহ প্রেমপূর্ণনয়নে সেই নবীন প্রেমিকের সাশ্রু-নয়ন অবলোকন করিল;—আপনিও অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়া ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে মনোভাব দেখাইল। যুবা এই অবকাশে বনবালার গলা হইতে একছড়া ফুলমালা গ্রহণ করিয়া, সহাস্যবদনে আপন গলদেশে ধারণ করিলেন। হাস্য করিয়া বনবালা নতমুখী। যুবা পুনর্ব্বার আপন কণ্ঠ-মাল্য উন্মোচন করিয়া বনবালার কণ্ঠদেশে পরাইয়া দিলেন। বনবালার কণ্ঠে পাঁচছড়া মালা ছিল। তাহার ভিতর হইতে আর একছড়া তুলিয়া লইয়া, যুবা দ্বিতীয়বার আপনার সমুৎসুক কণ্ঠের শোভাবর্দ্ধন করিলেন। কেবল কণ্ঠ-শোভা নহে, মনোশোভাও বিকসিত হইল। মাল্যস্পর্শে যেন

তাঁহার তপ্তহৃদয় স্তরে স্তরে জুড়াইল। কৌতুকে উন্মত্ত হইয়াই তিনি যেন, লজ্জাবতী যুবতী বন-নলিনীর আরক্ত বিম্বাধরে ক্ষুদ্র একটী চুম্বন উপহার সমর্পণ করিলেন। বন-নলিনী শিহরিল। সমুজ্জ্বল নয়নদুটী বিমুদ্রিত হইয়া গেল। অবনত পদ্মমুখখানি আরও যেন অবনত হইয়া পড়িল। প্রেমিকের চক্ষে এ শোভাটী বড়ই চমৎকার!

মালা-বদলেই একপ্রকার বিবাহ সিদ্ধ হয়। বনের মধ্যে সরোবরকূলে বনবাসিনী বনবালার সহিত একটী অপরিচিত যুবা-পুরুষের বিবাহ হইয়া গেল। ইঙ্গিতে ইঙ্গিতেই দেবতা সাক্ষী, ইঙ্গিতে ইঙ্গিতেই সত্যপ্রতিজ্ঞা,—ইঙ্গিতে ইঙ্গিতেই প্রতি-গৃহ্লামি,—ইঙ্গিতে ইঙ্গিতেই শুভদৃষ্টি। স্ত্রীআচার হইল না, শঙ্খধ্বনি হইল না, সম্প্রদান হইল না, বাসরঘর হইল না, কিছুই হইল না;—বিবাহ হইয়া গেল। সম্প্রদানের মধ্যে উভয়ে পরস্পর পরস্পরের পাণিগ্রহণ। যুবাপুরুষ বনবালাকে সম্প্রদান করিলেন আত্মদেহ;—বনবালা যুবাপুরুষকে সম্প্রদান করিল আপনার মনঃপ্রাণ।

বিবাহ হইয়া গেল। উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন করিলেন! পরক্ষণেই বিদায়। ছাগীরা ব্যস্ত হইয়া ম্যা ম্যা রব করিতে করিতে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছিল, বনবালা তাহাদিগকে সাদরে সহচারিণী করিয়া কুটীরাভিমুখে যাত্রা করিল, যুবাও অতিকষ্টে প্রণয়িনীর সঙ্গছাড়া হইয়া, বিষণ্ণগতিতে লোকালয়ের দিকে প্রস্থান করিলেন। বিদায়কালে বনবালা গুটীকতক ছোট ছোট ইঙ্গিত করিয়াছিল। সেই সকল ইঙ্গিতের সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য এই যে, নিত্য নিত্য এইখানে সাক্ষাৎ।

কুটীরে পৌঁছিতে রাত্রি হইল ছয় দণ্ড। শঙ্কিতহৃদয়ে বনবালা ভাবিল, মাসীমা হয় ত কতই লাঞ্ছনা করিবেন, কতই লজ্জা পাইব, কতই কাঁদিতে হইবে!—ভাবিতে ভাবিতে কুটীরে প্রবেশিল। দেখিল, কুটীর শূন্যময়,—মাসীমা গৃহে নাই!

বনবালার মহাবিস্ময়।—ভয়ের সঙ্গে বিস্ময়,—চিন্তার সঙ্গে বিস্ময়,—সন্দেহের সঙ্গে বিস্ময়। সরলা একবার ভাবিল, মাসীমা হয় ত তাহারিই অন্বেষণে বনমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। আহা! না জানি, কতই তাঁহার কষ্ট হইতেছে। আবার ভাবিল, তাহা নয়;—অন্বেষণে যান নাই;—অন্বেষণে গেলে অবশ্যই দেখা হইত। দেখা ত হইল না!—তবে কি?—তবে কোথায়?—বোধ করি, কদলীকুঞ্জে ধ্যানে বসিয়াছেন। সেইখানেই তবে যাই; সেইখানে গিয়াই দেখি।

তাহাই ঠিক।—তপস্বিনীর কুটীরপ্রাঙ্গণের এক ধারে সারি সারি,—সারি সারি অথচ মণ্ডলাকারে আট দশটী ছোটবড় কদলীবৃক্ষ রোপিত ছিল। খোপে খোপে নানাজাতি সুন্দর সুন্দর পুষ্পবতী লতা। স্থানটী সর্ব্বক্ষণ সুশীতল,—সর্ব্বক্ষণ শান্তিময়।—মণ্ডলমধ্যে দুটী লোকের বসিবার স্থান;—সুবিমল সুবিচিত্র তৃণাসন। বনবালা বিচক্ষলে ছুটিয়া গিয়া দেখিল, মাসীমা যেন সংজ্ঞাশূন্য হইয়া, সেই কদলী কুঞ্জে নিমীলিতনয়নে ইষ্টদেবতার ধ্যানে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছেন।

নূতন লোকে সহসা সে মূর্ত্তি দর্শন করিলে ভয় পায়। বনবালার ভয় হইল না। মাসের মধ্যে অতিকম পাঁচ সাতবার মাসীমার ঐ প্রকার অচেতন-মূর্ত্তি বনবালার নেত্রপথে নিপতিত হইত। দেখিয়া দেখিয়া, সহিয়া গিয়াছে। অভ্যস্ত দর্শনে

বনবালা ভয় পাইল না। দ্রুতপদে নিকটে ছুটিয়া গেল। নিকটে গিয়া মাসীমার কোলের কাছে হাঁটু গাড়িয়া বসিল; দক্ষিণ হস্তের কচি কচি অঙ্গুলিগুলি শশব্যস্তে মাসীমার নাসিকাগ্রে ধরিল;—নিশ্বাস পড়িতেছে,—কিন্তু, অনেকটা বিলম্বে বিলম্বে।—নাসিকাগ্রে অঙ্গুলিস্পর্শে ধ্যানবতীর ধ্যান-ভঙ্গ হইল না।—বনবালা তখন যেন একটু কাঁদো কাঁদো মুখে কোমল করপল্লবে মাসীমার ললাটদেশ স্পর্শ করিল।—ললাটে ঘর্ম্ম নাই।—ললাট হইতে ক্রমে ক্রমে, বনবালা ধীরে ধীরে, একে একে, মাসীমার সর্ব্বাঙ্গ পরীক্ষা করিয়া দেখিল। দেহখানি নিতান্ত উষ্ণও নয়, নিতান্ত শীতলও নয়;—অঙ্গের কোন স্থানেই একটুও ঘর্ম্মবিন্দু অনুভূত হইল না। বনবালা নিজে কিন্তু অনবরত ঘর্ম্মজলে স্নান করিতেছে!

প্রায় অর্দ্ধদণ্ড পরে মাসীমার চৈতন্যসঞ্চার হইল। যুগল কদলীবৃক্ষে পৃষ্ঠদেশ সংরক্ষণ করিয়া, তপস্বিনীঠাকুরাণী ঈষৎ বক্রভাবে, অর্দ্ধশয়িতাবস্থায়, সংজ্ঞাশূন্য হইয়া, অবস্থান করিতেছিলেন, সহসা চৈতন্যসঞ্চারে নয়ন উন্মীলনপূর্ব্বক, সহসা যেন, বনবালার নবীন বনবালা বেশ দর্শন করিলেন। যুগল আরক্তনয়নে দুই তিনবার অপত্যস্নেহে প্রেমাশ্রুধারা ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইল। স্নেহবতী আস্তব্যস্তে একটু সোজা হইয়া বসিয়া, ক্রোড়বর্ত্তিনী বন-নলিনীর হাত দুখানি ধরিলেন। বনবালা কাঁদিয়া ফেলিল। আহা! বনবালার রোদনে শুধু কেবল অশ্রুধারা ভিন্ন আর কোন বাহ্য নিদর্শন নাই।—বনবালা কথা কহিতে জানে না,—বনবালা মুখ ফুটিয়া কাঁদিতে পারে না,—বনবালা বোবা!

আপনার অশ্রুকে অবহেলা করিয়া, দয়াময়ী তপস্বিনী আপনার গৈরিকবসনের ক্ষুদ্র অঞ্চলে স্নেহময়ী বন-নলিনীর নয়নাশ্রু মুছাইয়া দিলেন; বনবালার কণ্ঠদেশে করার্পণ করিয়া, যেন কতই আদরে, অনাথিনীর ললাটে ও কপোলে স্নেহভরে পরিচুম্বন করিলেন। এই শোকাবহ,—শোকাবহ অথচ স্নেহাবহ অভিনয়ের পর, ক্ষণকাল ইসারায় ইসারায় পরস্পরের গুটীকতক কথোপকথন হইল। কত রাত্রি হইয়াছে, মাসীমা তাহার কিছুই জানিতেন না,—কিছুমাত্র জিজ্ঞাসাও করিলেন না, বনবালার যেন মস্ত একটা ফাঁড়া কাটিয়া গেল। শুভমিলনের প্রেমামোদে, কুটীরে ফিরিয়া আসিতে অনেকক্ষণ বিলম্ব হইয়াছিল, বনবালার পক্ষে সেটা বড়ই লজ্জার কথা।—মাসীমা তাহার কিছুই জানিতে পারিলেন না, ইহাকেই নবপ্রেমিকা বনবালার "মস্ত একটা ফাঁড়া কাটা" বলিয়া, এই স্থলে ইচ্ছাপূর্ব্বক একটু কৌতুক করা গেল।

আপনার কাঁধের উপর মাসীমার শরীরের ভার রাখিতে ইঙ্গিত করিয়া,—দক্ষিণহস্তে তাঁহার বামহস্তখানি সযত্নে ধারণপূর্ব্বক, বিষাদিনী বনবালা আস্তে আস্তে মৃদুপদসঞ্চারে মাসীমাকে বিরাম-কুটীরে লইয়া গিয়া, শোয়াইয়া রাখিল। বলাই হইয়াছে, মাসীমা কেবল একটু একটু ছাগীদুগ্ধ পান করিয়া জীবনধারণ করেন। বনবালা এই সময় একপোয়া আন্দাজ দুগ্ধ আনিয়া, স্নেহবশে মাসীমাকে খাওয়াইয়া দিল।

ছাগীতিনটী ছাড়া, তপস্বিনীর তিনটী ভেড়া ছিল।—কুটীরের বাহিরে,—অতি নিকটেই তাহারা বাঁধা থাকিত।—মানুষের অপেক্ষাও তাহারা বরং একটু বেশী রকম পোষ মানিতে শিখিয়াছে।

গরুকে,গাধাকে,আর ভেড়াকে যাঁহারা অহরহ অপকৃষ্ট নির্ব্বোধের উপমাস্থলে গ্রহণ করিয়া আমোদিত হন, সেই সকল প্রবীণ তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিত মহাশয়েরা যে তাঁহাদের সেই উপমাটীর যথার্থ সদ্ব্যবহার করেন, নির্ভয়ে আমরা তাঁহাদের সেই সিদ্ধান্তটীকে অভ্রান্ত সুসিদ্ধান্ত বলিয়া অনুমোদন করিতে পারি না। বনবালা তাহার মাসীমার ভেড়া তিনটীকে খোঁয়াড়িতে বন্ধন না করিয়াই, মুক্ত উঠানে মুক্ত ছাড়িয়া রাখিয়াই,—তাড়াতাড়ি কদলীকুঞ্জে মাসীমাকে খুঁজিতে গিয়াছিল; অনেকক্ষণ ধরিয়া, মাসীমার সেবা-শুশ্রূষায় ব্যস্ত রহিয়াছিল;—ভেড়ারা পলায়ন করে নাই;—খোদ-হাকিমীতে খোঁয়াড়িমধ্যে প্রবেশ করিয়া, সুখস্বচ্ছন্দে শুইয়াও থাকে নাই,—যেখানে অচেতনা মাসীমা আর অশ্রুমতী বনবালা, ভেড়া তিনটী এতক্ষণ সেই কদলীকুঞ্জের সন্নিকটেই, চুপ্ টী করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল;—শয়ন করিবারি তাগাদা জানাইয়া, কাতরে একটীবারও মিহি আওয়াজে "মেহি মেহি" করিয়া ডাকেও নাই। বনবালা যখন মাসীমার হাত ধরিয়া কুটীরমধ্যে লইয়া আইসে, ভেড়ারাও সেই সঙ্গে, চুপি চুপি পশ্চাৎ পশ্চাৎ হাঁটিয়া, কুটীরের দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বনবালা সেই বনসখী-তিনটীকে কতই আদর করিয়া,—তিনটী মুখে তিনটী তিনটী চুমো খাইয়া, খোঁয়াড়িতে লইয়া, বাঁধিয়া আসিল। মাসীমা ত দুধ খাইলেন;—বনবালা নিজে যাহা খায়, বনমধ্যে কেবল বনবালা নিজেই তাহা জানে;—প্রায় অর্দ্ধরাত্রিসময়ে বনবালা আপনার অভ্যাসসিদ্ধ যৎকিঞ্চিৎ জীবনধারণ-পান-ভোজন করিয়া, মাসীমার পার্শ্বে, স্বতন্ত্র একখানি তৃণশয্যায় মনের সুখে শয়ন করিয়া নিদ্রা গেল। নিশাদেবীর যতক্ষণ

ভোগ, শীঘ্রই তাহা ফুরাইয়া আসিল। শীঘ্রই প্রভাত হইল বনবালা জাগিয়া উঠিল।

আজিকার প্রভাত যেন বনবালার নয়নে সুবিমল নবীন প্রভাত। শীঘ্র শীঘ্র গৃহকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া,—শীঘ্র শীঘ্র যৎসামান্য পানভোজনাদি সমাধা করিয়া, বনবাসিনী বন-নলিনী বিজন বনমধ্যে ছাগল চরাইতে বাহির হইল। নির্দ্দিষ্ট সময়ে নবীন প্রণয়পাত্রের সহিত সাক্ষাৎ হইল। এখানেও একপ্রকার হর্ষবিষাদ!—শুভপরিণয়ে সুনবীন হর্ষ, অথচ, মুখে সে হর্ষ প্রকাশ করিবার শক্তি নাই! ইসারায় ইসারায় হর্ষবিকাস! নয়নে, ওষ্ঠে, অঙ্গুলীতে, গ্রীবাভঙ্গীতে, হৃদয়গত আহ্লাদ-আমোদের যতটুকু লক্ষণ প্রকাশ করা সুসাধ্য হইতে পারে, কালা-বোবা বন-নলিনী আপনার স্বভাবসিদ্ধ তীক্ষ্ণবুদ্ধিপ্রভাবে তাহা অপেক্ষা বরং বেশী আনন্দ দেখাইল। নবীন প্রেমিকপুরুষ অবশ্যই কথা কহিতে পারেন, কথা কহিলে বন-নলিনী তাহা শুনিতে পাইবে না, এই দুঃখে তাঁহাকেও অগত্যা ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে প্রেমানন্দপ্রকাশে বাধ্য হইতে হইল। পুরুষ অমোদিত, প্রকৃতি আমোদিনী,—সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বিচ্ছেদ।

এই রকমে প্রায় একমাস।—একদিন বৈশাখমাসের শেষবেলায় পবিত্র প্রেমাধার নবীন দম্পতী বন-সরসীর তৃণ-সোপানে উপবেশন করিয়া, সুস্নিগ্ধ প্রেমভাবে, কতই আনন্দ বিনিময় করিতেছেন, তাঁহাদের অন্তরাত্মাই তাহা জানেন। প্রথম সাক্ষাতের দিন আগন্তুক যুবাপুরুষটী কোন কারণে উৎসাহিত হইয়া, বনবালার হস্তে একখানি পত্র প্রদান করেন, বনবালা তাহা আদরে গ্রহণ করিয়া, যত্নে আঁচলে বাঁধিয়া,

তৎক্ষণাৎ আবার কি ভাবিয়া, আস্তে আস্তে ফিরাইয়া দেয়; একথাটী বোধ হয়, পাঠকমহাশয়ের স্মরণ আছে। আজ আবার সেই পত্রিকাখানি বন-নলিনীর অঞ্চলে।—আজ আর বন-নলিনী তাহা ফিরাইয়া দিল না। আজ আবার আমোদিনী বন-নলিনী একটু একটু মুখ টিপিয়া টিপিয়া, একটু একটু কটাক্ষপাতে, ধীরে ধীরে মধুর মধুর হাসিল।

বিশুদ্ধ প্রেমের মহিমা বড় বিচিত্র!—মধুর মধুর হাসির সময় দুটীতে তাঁহারা এতই উন্মত্ত,—এতই অন্যমনস্ক হইয়াছিলেন যে, যুগলমূর্ত্তির যুগল যুগল নয়নচারিটী পরস্পরের প্রগাঢ় অনুরাগে এতদূর সমাকৃষ্ট হইয়াছিল যে, তাঁহাদের কাছের গোড়ায় কত কি কাণ্ড ঘটিয়া যাইতেছে, সেদিকে কিছুতেই তাঁহাদের ভ্রূক্ষেপ ছিল না!

দুটীতে পাশাপাশি হইয়া বসিয়া ছিলেন।—এটীর চক্ষু ওটীর দিকে,—ওটীর চক্ষু এটীর দিকে!—হাতে হাতে মিলিতেছে। হাতেরাও যেন হাসিতেছে, ঠোঁটেরাও হাসিতেছে, সকলের উপর টেক্কা দিয়া নয়নেরাও বেশ মিষ্ট মিষ্ট হাসিতেছে। গোলাপফুলের সঙ্গে সে হাসির উপমা হয় না,—শরৎকালের পদ্মফুলের সঙ্গে সে হাসির তুলনা হয় না,—শরতের মেঘশূন্য পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রের সঙ্গেও সে হাসির উপমা দিতে লজ্জা হয়।—বনের মাঝে, পুকুর ধারে, সুনবীন প্রেমিকপ্রেমিকার নবীন নবীন হাসির ঘটা দেখে কে?

দেখে কে?—কথাটাও যেন সত্য;—কিন্তু, পশ্চাতে দাঁড়াইয়া দেখিতেছে একজন। কে সেই একজন, এখন আমরা তাঁহাকে চিনিব না। একদণ্ডকাল গুপ্তভাবে দাঁড়াইয়া, সেই অজ্ঞাত

ব্যক্তি ঐ প্রকার তামাসা দেখিতেছেন। কথার তামাসা নহে, ইসারার তামাসা।

দেখিতে দেখিতে সেই আগন্তুক সহসা সহাস্যবদনে, উভয়ের মধ্যস্থলে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। ভয়ে, লজ্জায়, জড়ীভূতা হইয়া, বনবালা যেন আতপ-তাপিত কদলীপত্রের ন্যায় ঘন ঘন কাঁপিতে লাগিল;—প্রণয়পাত্রের হাত ছাড়িয়া দিয়া, শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল;—যেখানে ছিল, অবনত-বদনে সেস্থান হইতে প্রায় তিন হাত তফাতে সরিয়া গেল। লজ্জামাখা সুমধুর মূর্ত্তি!

আগন্তুক সে মূর্ত্তি দেখিলেন।—ঈষৎ হাস্য করিয়া, যুবা-পুরুষটীকে কহিলেন, "মিত্রবর! এই বেশ!"

ঈষৎ হাস্য করিয়া মিত্রবর কহিলেন, "কি বেশ মাখনলাল?"

"রামসীতা দর্শনে আসিয়া বনবাসিনী নবীনা সীতামূর্ত্তি দর্শন করিতেছ, ইহাই বেশ!"

একটু লজ্জা পাইয়া, যুবাপুরুষ কহিলেন, "তুমিও কি প্রকৃতির শোভা দেখিতে ভালবাস না? এমন বিমলাসুন্দরী নরবালাকে বনে, বিজনে, দেব-বালার ন্যায় নয়নগোচর করিলে তোমারও কি আনন্দ হয় না?"

"হয়।—না হইলেও, তোমার আনন্দেই আমার আনন্দ। কিন্তু, বাটী হইতে চিঠী আসিয়াছে।"

চিঠীর কথা শুনিয়া, শিহরিয়া উঠিয়া, যুবাপুরুষ কহিলেন, "চিঠী তুমি রাখিয়া দাও, আমি শুনিব না, আমি যাইব না।"

হো হো করিয়া হাসিয়া,—বার কতক চক্ষু ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া, দ্বিতীয় যুবা কহিলেন,—"হরিবোল হরি!

"এত সাধের তরু আমার শুকালোরে তপনে !"

"কোন্ তরু প্রিয়সখে?—তোমার কোন্ তরুটী অকস্মাৎ তপন-তাপে শুকাইয়া গেল?"

"এইটী!"—যিনি নূতন আসিছেন, পুরাতনের দিকে অঙ্গুলী হেলাইয়া, হাসিতে হাসিতে তিনি কহিলেন, "এইটী!"

"কোন্‌টী?"

"তুমি!"

"আমি?—আমিই তোমার সাধের তরু?—আমিই তোমার তপনতাপে শুকাইলাম?"

"তা না ত কি?—দেখ দেখি, কি ছিলে, কি হইয়াছ! হক্‌-কথা ভাই!—জন্মাবধি একদিনও তোমাকে আমি এমন কাহিল দেখি নাই!"

কাহিলের কথা শুনিয়া, কাহিল পুরুষ আপনার দেহপ্রতি ঘন ঘন দৃষ্টিসঞ্চালন করিতে লাগিলেন;—কোন্ অঙ্গটী সরু, কোন্ অঙ্গটী মোটা, একে একে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। মুখখানি যেন বুকের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। দ্বিতীয় যুবা এই অবকাশে অদূরবর্ত্তিনী বন-নলিনীর সরল পবিত্র চেহারাখানি আড়নয়নে দুই তিনবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইলেন।—বন-নলিনীর সে দিকে দৃষ্টি ছিল না,—কুটিলের কুটিল কটাক্ষ দেখিতে পাইলেন না। সুতরাং আগেকার লজ্জার উপর, একটুও বেশী লজ্জা আসিল না।—বনবালা মনে মনে স্থির করিয়া লইল, দুজনে যখন ততখানি হাসিখুসি চলিতেছে,—ভঙ্গীতে ভঙ্গীতে যখন ঠাট্টাতামাসা বুঝাইতেছে, তখন

অবশ্যই এই নূতন লোকটী ইহাঁর চেনা-লোক হইবেন, এই ভাবিয়া, বনবালা তথা হইতে পলায়ন করিল না।

"মিত্রবর" সম্বোধনে পাঠকমহাশয়রা নিশ্চয়ই বুঝিয়াছেন, আগন্তুক-দুটীতে বন্ধুত্বভাব আছে। উভয়েই উভয়ের বন্ধু। কেহ একথা বলিয়া না দিলেও, অনুমান পুরোবর্ত্তী হইয়া, ঠিক ঐ কথাটী বুঝাইয়া দেয়। বনবালাও সেই অনুমানের সাঙ্কেতিক উপদেশে তৎক্ষণাৎ মীমাংসা করিল, দুজনেই দুজনের বন্ধু।

বন্ধুতে বন্ধুতে মৃদুস্বরে অনেকগুলি কথা হইল। কথার সঙ্গে হাতমুখ কাঁপিল,—অঙ্গুলী নড়িল, চক্ষুও অনেকবার ঘুরিল; বনবালাও বক্রকটাক্ষে এক একবার নূতন মূর্ত্তি দর্শন করিল; কথাবার্ত্তা কিছুই শুনিতে পাইল না, ইসারার লক্ষণে কিছু কিছু আভাস পাইল মাত্র।

পশ্চিমগগন আরক্ত। তপনদেব পাটে বসিতে চলিলেন। বনবালা আর বনমাঝে বিলম্ব করিতে পারিল না। ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে বিদায় লওয়া হইল। একটীবার সকৌতুক সতৃষ্ণনয়নে প্রেমাধারের নয়নদুটী নিরীক্ষণ করিয়া, বনবালা অবনতবদনে ধীরে ধীরে তথা হইতে প্রস্থান করিল।—ছাগী তিনটী সঙ্গে আসিতেছে কি না, তাহাই যেন দেখিবার জন্য, সেই ছলে এক একবার পশ্চাৎদিকে ফিরিয়া চাহিতেছে, প্রেমিকের নয়নে নয়ন পড়িতেছে,—তখনি তখনি আবার লজ্জা আসিতেছে, সলজ্জভাবে মুখ ফিরাইয়া লইয়া, আবার মৃদুপদে অগ্রগামিনী হইতেছে।—এই রকম প্রায় পাঁচ বার!

দূর হইতেও ইসারা চলে।—বনবালার ভালবাসা-ধনটী একটু একটু দূর হইতেও মধুর মধুর ইসারা চালাইলেন;

বনবালা দেখিল, বনবালা বুঝিল, হাসি আসিবারও বলবৎ হেতু উপস্থিত হইল, কিন্তু বনবালা হাসিল না।—হাসিল না কিম্বা হাসিতে পারিল না, তাহা কেবল বনবালা ভিন্ন আর কাহারও জানিবার সম্ভাবনা নাই,—বোধ করি অধিকারও নাই। না হাসিবার একমাত্র কারণস্থলে আমাদের এইমাত্র অনুমান হয় যে, দ্বিতীয় যুবাই অন্তরায়।

সন্ধ্যা হইবার বিলম্ব নাই।—বনবালা হন্ হন্ করিয়া হাঁটা দিল। ছাগী তিনটীও গুড়্ গুড়্ করিয়া ছুটিল। আকাশে সূর্য্যদেবও গুড়্গুড়্ করিয়া অস্ত গেলেন। দৃশ্য অন্ধকার আসিয়া সুন্দর বনস্থলীকে অন্ধকার বনে ঢাকা দিয়া ফেলিল। বনবালা আর বনবালার প্রাণাধিকটীকে দেখিতে পাইল না! দুই পক্ষের কেহই না! বন-নলিনীর নলিন-নেত্রে দুই ফোঁটা অশ্রু দেখা দিল। সে অশ্রু কেবল অন্ধকারি বনের অন্ধকার গাছেরাই দেখিল।—দেখা যদি সম্ভব হয়, শাখীবাসী পাখীরাও সেই অশ্রুবিন্দু দেখিল। বনবালার কথা নাই, বনবালা কেবল অশ্রু দেখাইয়া কাঁদিল,—পাখীরাও বনবালার দুঃখে ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে পারিল না!

বিচ্ছেদটা বড়ই দুরন্ত! বনবালা জানিয়া যাইতেছে, "বিবাহের পর অবধি রোজ রোজ যেমন নিশাকালে বিচ্ছেদ হয়, তেমনি বিচ্ছেদ হয় ত আজিও।"—যদি আজিও, তবে কেন বনবালার প্রাণ কাঁদে?—ভগবান জানেন।

বনবালা কুটীরে গেল।—এখানে আবার এ কি সর্ব্বনাশ! মাসীমাটী একাকিনী কুটীরমধ্যে মরিয়া রহিয়াছেন!!!

বনবালা সব জানে।—জানে, কিন্তু কথা কহিতে পারে না!

মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।—পথে একবার দুইবিন্দু অশ্রু দেখা দিয়াছিল, এখানে সে বিন্দু আর গণিতে পারা গেল না! আপনার বক্ষে সজোরে করাঘাত করিয়া, কম্পিতহস্তে তিনবার তৃণাসনশায়িনী মাসীমার বক্ষদেশ স্পর্শ করিল। প্রকৃতির উপদেশে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিল, জীবন নাই! নিশ্চয় বুঝিল, মাসীমা আর এজন্মে পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিবেন না!—দাঁড়াইয়া কাঁপিয়া, বসিয়া পড়িয়াছিল, এবারে আছাড় খাইয়া শুইয়া পড়িল!—আহা! বোবা মেয়ে! যে রাত্রে প্রাণাধিক ভাইটী বজ্রাঘাতে মরে, নিজেও সেই রাত্রে বোবা হয়!—ভাইটী হারাইয়া, একবারও ফুকরিয়া কাঁদিতে পারে নাই!—আজ আবার তাহার পৃথিবীর যথাসর্ব্বস্ব মাসীমাটী জন্মের মত তাহাকে একাকিনী ফেলিয়া গেলেন! এ শোক যে, অভাগিনী বনবালার হৃদয়ে কতবড় বজ্রতুল্য শোক, মুখ ফুটিয়া কাঁদিয়া বনবালা তাহা জগৎকে জানাইতে পারিল না! এখনকার জগৎ কেবল ঐশ্চর্য্যমদেই প্রমত্ত, বনবাসিনী কাঙ্গালিনী বনবালার শোক এ জগতে কেই বা শুনিতে চায়?—কেই বা গ্রাহ্য করে?—সে আশাটা মিথ্যা আশা!—অভাগিনী বনবালা আজ স্নেহময়ী মাসীমার শোকে সুকোমল পবিত্র হৃদয়ে যেপ্রকার গুরুতর ভীষণ বেদনা প্রাপ্ত হইল, মুখ ফুটিবার শক্তি নাই বলিয়া, সেই নিদারুণ বেদনাটী বনবাসী তরুলতাগণকেও জানাইয়া রাখিতে অক্ষম হইল!

তবে বনবালা করিল কি?—মাসীমার শোকে ধৈর্য্যহারা হইয়া বনবালা তখন মর্ম্মবেদনা প্রকাশ করিল কিসে?—ধূলাতে আর মাটীতে!—আবার শোক প্রকাশ করিল, এ পাশ ওপাশ

আছাড়িতে পিছাড়িতে! আরও প্রকাশ করিল, বুক চাপ্‌ড়ানীতে আর চুল ছেঁড়াতে! পুনঃপুন প্রকাশ করিল, দীর্ঘ দীর্ঘ নিশ্বাসে আর নেত্রজলে!

এ সকল করিলে কি হয়?—মরামানুষ ফিরিয়া আসে না! বোবারা গুমরিয়া গুমরিয়া কষ্ট পায়, অ-বোবারা মাটী কাঁপাইয়া কাঁদে,—মরামানুষ ফেরে না! বনবালার মাসীমা মরিয়া গিয়াছেন, বনবালার নির্ব্বাক যন্ত্রণায় কাতরা হইয়া, সেই মরা মাসীমা আর ফিরিয়া আসিলেন না!

বনবালা জানে সব। ভাইটী মরিলে যেমন ধাঁ করিয়া বনের ভিতর ছুটিয়া গিয়াছিল, মাসীমার মৃতদেহটী শূন্যকুটীরে ফেলিয়া রাখিয়া, অশ্রুমতী বনবালা আবার আজ অজস্র অশ্রু-বর্ষণ করিতে করিতে, ঠিক তেমনিভাবে, ভোঁ করিয়া ছুটিয়া বাহির হইল!—গেল কোথা, সে কথাটী বোধ হয় কেবল বনবালা ছাড়া, কেহই এখন জানিতে পারিবেন না।

রাত্রি যখন পাঁচদণ্ড কি ছয় দণ্ড, সেই সময় দুজন বনবাসী তপস্বী আর ভৈরবীমূর্ত্তিধারিণী একটী বৃদ্ধা যোগিনী আমাদের বনবালার মাসীমার আবাস-কুটীরের দ্বারদেশে উপস্থিত।—এই ত্রিমূর্ত্তি সম্পূর্ণরূপেই অপরিচিত,—সম্পূর্ণরূপেই নূতন। সঙ্গে কিন্তু বনবালা নাই! বনবালা তবে গেল কোথা?—একটু পরেই বনমালা হস্তে বনবালা আসিয়া উপস্থিত হইল।

ভৈরবীদেবী বনবালার হস্ত হইতে ফুলমালা গ্রহণপূর্ব্বক একাকিনী কুটীরমধ্যে প্রবেশিলেন। প্রাণবায়ুশূন্য তপস্বিনীর গলদেশে সেই পুষ্পমাল্য পরাইয়া দিয়া, নিকটে উপবেশন-পূর্ব্বক, ভৈরবীঠাকুরাণী করজোড়ে কয়েকবার পরমপিতার স্তব

পাঠ করিলেন ;—অনন্তর শবদেহে বসনাচ্ছাদনপূর্ব্বক, তিনি পূর্ব্বকথিত তপস্বীযুগলের সাহায্যে কুটীরের প্রাঙ্গণমধ্যেই মৃতদেহটীর সমাধি দিলেন।—সমাধির উপর আছাড় খাইয়া পড়িয়া, এলোকেশী বনবালা কতক্ষণ কতই গড়াগড়ি দিল! ধূলিধূসরিত কোমল অঙ্গের স্থানে স্থানে, পুনঃপুন নখাঘাতে কতই রক্তবিন্দু বাহির হইতেছে!—অনবরত চক্ষের জলে ধূলামাখা অঙ্গের কতই স্থান কাদামাখা হইয়া গিয়াছে! পাঠক মহাশয়! এতক্ষণ আপনারা, যে বনবালাকে দেববালা বলিয়া আদর করিতে অভিলাষী হইতেছিলেন, সেই বনবালার মুর্ত্তি আজ এখন যে কতখানি বিকৃত,—সেই বনবালার শোচনীয় দুর্দ্দশা এখন যে কিরূপ, তাহার স্বরূপ চিত্র করিয়া বুঝাইয়া দিতে পারি, আমরা আমাদিগকে তেমন সুনিপুণ চিত্রকর বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারি না।

মাসীমার সমাধি হইল।—বনবালা অনাথিনী হইল! বনবালা ভাবিল, আজি অবধি মানবজগতে তাহার হয় ত জীবনের সমস্ত শান্তিসুখ ফুরাইয়া গেল! গেল কি না গেল, তাহা আমরা এখন কি করিয়া বলি?—বনবালা অনাথিনী হইল, জানিয়া শুনিয়া, দশজনের কাছে এ রকম মিথ্যাকথাটা প্রকাশ করিতেও অবশ্য সঙ্কোচ আইসে। বনবালার বিবাহ হইয়াছে। ঠাকুর সাক্ষী করিয়া না হউক,—অগ্নি সাক্ষী করিয়া না হউক, প্রাজাপত্যশাস্ত্রসম্মত মন্ত্র পাঠ করিয়া না হউক, গান্ধর্ব্ববিধানে মাল্যবদল করিয়া বিবাহ হইয়াছে। বনবালা সনাথা।—হিন্দুশাস্ত্রসম্মত অষ্টপ্রকার বিবাহের মধ্যে গান্ধর্ব্ববিবাহও বহুস্থানে পবিত্র বিবাহ বলিয়া গণ্য। বোবা বনবালার পতি আছেন।

ভারতের সাধ্বী সতীরা ভক্তিভাবে পতিকে "নাথ" বলিয়া সম্বোধন করেন। ইহাতেই সপ্রমাণ হইল, বনবালা অনাথা নহে, বনবালা সনাথা।

বনবালার কুটীরে ভৈরবী আসিয়াছেন।—মাসীমার কুটীরকে এখন বনবালার কুটীর বলা হইল কেন? এই "কেনটী" বড় একটা শক্ত "কেন" নহে।—কেন না,—তপস্বিনী মাসীমার পরিত্যক্ত যোগিনীযোগ্য সমস্ত সম্পত্তিতেই এখন একমাত্র বনবালাই অধিকারিনী।—অধিকার বিচার করিয়াই বলা হইল, বনবালার কুটীর।—বনবালার কুটীরে ভৈরবী আসিয়াছেন। বনবালাকে তিনি আপনার আশ্রমে লইয়া যাইতে চাহিলেন, বনবালা রাজী হইল না।

ইহাও এক বিষম বিভ্রাট!—এক্ষেত্রে এখন হয় কি? বনবালা যুবতী।—আজীবন তপস্বিনী-পালিতা তপস্বিনী হইলেও, বনবালা যুবতী।—তপস্বিনী যুবতী।—ইহাকে বনমধ্যে বিজন কুটীরে একাকিনী থাকিতে দেওয়া, কখনই সৎপরামর্শ হইতে পারে না;—অথচ বনবালা স্থানান্তরে যাইতে চাহে না!

এমন সঙ্কটস্থলে এক্ষেত্রে এখন উপায় কি?—বন-নলিনী স্বামিসহবাসিনী হইবে, ইহাই বা নিশ্চয় করিয়া কে বলিতে পারে?—বনবালার বিবাহ হইয়াছে, ভৈরবী তাহা জানেন না;—কেহই জানে না;—মাসীমাও জানিয়া যাইতে পারেন নাই।—বনবালার পতি আবার বনবালার কুটীরে ফিরিয়া আসিবেন, এ কথাই বা কে বলে?—বনবালার কুটীরখানি তিনি চিনিতে পারিবেন কি না, সেইখানেই এক প্রবল সন্দেহ। কেন না, বনবালার সহিত আলাপ হইয়া অবধি, সেই নবীন

যুবাপুরুষ একটী দিনও বনবালার বাসস্থান দর্শন করেন নাই। ইহার উপর আরও একটা প্রকাণ্ড সমস্যা।—বনবালার স্বামীর একজন বন্ধু আসিয়া, বনবালার ক্রোড়দেশ হইতে বনবালার ভালবাসা বিহঙ্গটীকে একপ্রকার হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন।—যদি দূরদেশে লইয়া যান, তাহা হইলে ত বহুদিনের বিচ্ছেদপাঠের সূত্রপাত!—তাহা হইলে ত নূতন মিলনের নূতন আশালতাটী শিশির-শঙ্কিতা পদ্মিনীলতার ন্যায়, অগাধ জলে ডুবিয়া থাকিবে!—অনাথা না হইয়াও, বনবালা অনাথা। অনাথা বনবালার দশা এখন হয় কি?

ভৈরবীদেবীর তিনটী প্রবীণা পরিচারিকা ছিল। ভৈরবীদেবী দয়া করিয়া, তাহাদের মধ্যে একটীকে বনবালার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিলেন। সেই পরিচারিকার হাতে হাতে বনবালার ভালমন্দ সঁপিয়া দিলেন।—পরিচারিকা পাইয়া, স্বভাবসরলা বনবালাসুন্দরী আপনার চিরাভ্যাসমত সুখসচ্ছন্দে দিনযাপন করিতে লাগিল।—সুখ সচ্ছন্দেই যাপন করিতে লাগিল বটে, কিন্তু ছাগল চরানো ঘুচিল না।—ছাগল-চরানোতে বন-নলিনীর মনে একটু একটু সুখ ছিল;—বিদেশী যুবাপুরুষের সহিত সম্মিলিত হইয়া অবধি, বন-নলিনী যেন সেই সুখটীকে আরও অনেকদূর বেশী বেশী ভাবিত।—সে সুখ এখন কমিয়াছে! মাসীমা মরিয়াছেন;—আশ্রমের যৎকিঞ্চিৎ সুখটুকু মাসীমাই যেন, সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছেন!—সুখ একেবারেই ফুরাইয়াছে!—বাকী ছিল পতিসমাগমের স্বর্গীয় সুখ!—সে সুখটুকুও এখন অন্ধকার। মাসীমার মরণাবধি বনস্থলে পতির সহিত সতীর আর সাক্ষাৎলাভ হয় না!—তিনি আর আসেন না।

একটী সূক্ষ্মকথা এইস্থলে ভাঙ্গিয়া দিতে হইতেছে। অপরিচিত যুবাপুরুষের নাম-ধাম-লেখা ক্ষুদ্র পত্রিকাখানি বনবালার আঁচলে আঁচলেই ফেরে!—সমস্ত বস্তুই ভবিতব্যের সঙ্গে গাঁথা।—পত্রিকাখানি বনবালার আঁচলে আঁচলেই ফেরে! বনবালার এত সাধের,—এত যত্নের,—এত আদরের সেই পত্রিকা, কিন্তু অহো!—যে ধনের অত আদর, বনবালার কাছে সে ধনের ব্যবহার নাই!—বনবালা পড়িতে পারে না।—পড়িতে জানে না বলিয়াই যে পড়িতে পারে না, বোধ করি এমন সিদ্ধান্ত এক্ষেত্রে সমুত্থিত হইতে পারিবে না। কেন না, পড়িতে জানিলেও পড়িতে পারিত না।—কেন না, বনবালা বোবা!

তবে এখন হয় কি?—বনমধ্যে একটী নূতন লোক আসিয়া উপস্থিত হইয়া; একটী বনবাসিনী বোবা মেয়ের হাতে আপনার নাম ধাম-লেখা পত্র দিয়া গেলেন,—একটী বনবাসিনী বোবা মেয়ের রূপমাধুরীদর্শনে মোহিত হইয়া পড়িলেন,—ঠারে ঠোরে—ইসারায় ইসারায় একটী বনবাসিনী অবোলা অবলার মনঃপ্রাণ চুরি করিয়া, কে জানে কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গেলেন!—বনবাসিনী বোবা মেয়েটীও বিশ্বমোহন মোহন ফাঁদে ধরা পড়িয়া, সেই অজ্ঞাতকুলশীল আগন্তুক যুবার সহিত আপন ইচ্ছামত চিরজীবনের জন্য পরিণয়পাশে বাঁধা পড়িলেন! অথচ, সেই অভাগিনী জীবন-সঙ্গিনীটী প্রণয়বিমুগ্ধ জীবন-সঙ্গীর নাম-ধাম পর্য্যন্ত পরিজ্ঞাত হইল না!—কেহই জানিল না!—পত্রিকাখানি ক্ষণকালের জন্যও প্রণয়িনীর আঁচল ছাড়া হইল না!—আঁচলের যত্নে সেই পত্রিকাখানি ক্ষণকালের জন্যও অন্য লোকের চক্ষে পড়িল না!—তবে এখন হয় কি?

আমরাই পড়িয়া দিব।—দিই না দিই, অন্ততঃ নিজের জন্যও পড়িয়া লইতে হইবে।—কেন না, যে লোকটীর সহিত বনবালার জীবনকাহিনীর অবিচ্ছেদ সম্বন্ধ, ততবড় গণনীয় লোকটীকে অনবরত "আগন্তুক, অপরিচিত, সেই যুবা, নবীন যুবা, আগন্তুক যুবাপুরুষ" ইত্যাকার অন্ধকার নামে পরিচয় দেওয়াটা, বড়ই অন্যায় কার্য্য হয়।—পাঠকমহাশয় ও হয় ত এই অপরাধে আমাদের উপর ক্ষেপিয়া উঠিতে পারেন।। কাজ নাই অত গোলমালে!—আমরাই পড়িব।—যে পত্র বনবালা পড়িতে পারিল না, স্বার্থপরবশ হইয়া, সে পত্রখানি আমরাই পড়িয়া দিব।

আগন্তুক যুবাপুরুষের নাম—গান্ধর্ব্ববিবাহে স্বয়ম্বরা বন-নলিনীর আত্মসমর্পিত বরের নাম ভোগানন্দ ঠাকুর।—নিবাস মগধে।—ইংরেজেরা এখন যাহাকে বেহার বলেন, সেই স্থানটীই প্রাচীন "মগধরাজ্য"।—একটীমাত্র লোকের ঠিকানার কথায় সমগ্র "মগধরাজ্য" বলিলে নিরূপণ হইবে কি, তাহা ঐ পত্রিকাগর্ভেই বিশেষ করিয়া লেখা আছে।—গ্রাম, থানা, মহল্লা, রাস্তা, ইত্যাদি বিশেষ নিদর্শনগুলি সমস্তই ঐ পত্রের গর্ভস্থ।—সেপ্রকার ভূগোলসম্মত পোষ্টাল গাইডের পাঠগুলি হয় ত বন-নলিনীর প্রয়োজনে আসিতে পারে, আমাদের প্রয়োজন নাই।—আমরা কেবল মোটের উপর এইটুকুমাত্র জানিয়া রাখিলাম, বন-নলিনীর বরের নাম ভোগানন্দ ঠাকুর,—পিতা আত্মানন্দ ঠাকুর,—নিবাস মগধরাজ্য।—বোধ হয়, পাঠক-মহাশয়েরও ঐ টুকু পর্য্যন্ত দরকার।

যাঁহার নামধাম লইয়া এতখানি আঁটাআঁটি করা হইল,

বড়ই দুঃখিত হইতেছি, তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনীটী এ কল্পে ধরিল না। এটীও দীর্ঘ, সেটীও দীর্ঘ।—অতএব এই স্থলে এই কল্পটীর বিচ্ছেদ করা হইল।

চতুর্থ কল্প।

দলীলের গোড়া।

ভোগানন্দ ঠাকুর অযোধ্যায় যাইতেছেন।—গিয়াছিলেন সেই অযোধ্যায়,—ছিলেন এতক্ষণ অযোধ্যায়,—আসিয়াছেন অযোধ্যায়,—তবে আবার " ভোগানন্দ ঠাকুর কেন অযোধ্যায় যাইতেছেন," এ কথাটা কেমন হইল ?

হইল ভাল।—ছিলেন এতক্ষণ অযোধ্যার কাননে, যাইতেছেন এখন অযোধ্যার সহরে।—ভারতীয় পূজ্য পূজ্য কবিগণ ভারতের যে স্থানটীকে " অযোধ্যাপুরী " বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, সেই স্থানটীকে প্রধানতঃ "অযোধ্যানগরী" বলিয়াই বুঝিয়া লওয়া উচিত মনে করি।—নদ-নদী-ক্ষেত্র-কাননাদি পরিপূরিত সমস্ত অযোধ্যারাজ্যটীকে "অযোধ্যাপুরী" বলিয়া পরিচয় দিলে, সাধারণতঃ যেমন দোষ হয় না, শুদ্ধমাত্র অযোধ্যা-নগরীকেই "অযোধ্যাপুরী" বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেও তেমনি

কিছুমাত্র দোষ ঘটিবে না।—এই কারণেই বলা হইয়াছে, ভোগানন্দ ঠাকুর অযোধ্যায় যাইতেছেন।

ভোগানন্দ ঠাকুর অযোধ্যায় যাইতেছেন।—সঙ্গে সেই নব-সমাগত বন্ধুটী।—উভয়েই অশ্বারোহণে গমন করিতেছেন। ভোগানন্দ ঠাকুরের অশ্ব ছিল —বনবালার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইবার সময়, কাননপ্রান্তে একটী পারুল বৃক্ষমূলে তিনি সেই অশ্বটীকে বাঁধিয়া রাখিয়া, পদব্রজেই শান্ত তপোবনে প্রবেশ করিতেন। শকুন্তলার সহিত প্রথমদর্শনের শুভসূচনায়, প্রকৃতি-সতীর সম্মানরক্ষার্থ, মহাকবি কালিদাস রাজা দুষ্মন্তের মুখ দিয়া সুমধুরস্বরে বলিয়া গিয়াছেন, "তপোবনে বিনীতবেশেই প্রবেশ করা ভাল।"—ভোগানন্দ ঠাকুর হয় ত ঐ উপদেশ পালন করিয়াই, বিনীতবেশে বনবালার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। এখন তিনি অশ্বারোহী।

উভয়েই অশ্বারোহণে যাইতেছেন।—কানন হইতে কানন-পথেই বহুদূর;—তাহার পর মাঝে মাঝে সরু পথ;—দুইধারে সুনবীন শস্যশোভিত শ্যামল ক্ষেত্র;—খানিক দূরেই আবার বন।—মিত্র-সহচর অশ্বারোহী ভোগানন্দ ঠাকুর এই প্রকার আরণ্যপথে, অদ্রুতগতিতে গমন করিতেছেন,—লোকালয়ে পৌঁছিবার তখনও অনেকটা বিলম্ব,—অনেকটা পথ বাকী, এমন সময় পথের ধারে একটী পরমসুন্দর রাখাল-বালক তাঁহার নয়নগোচর হইল। বালকটীর দিব্য চেহারা। বর্ণটুকু গৌর না হইলেও দিব্য সুস্নিগ্ধ;—চক্ষুদুটী বেশ বড় বড়।—যাঁহারা মুখের চেহারা দেখিয়া, মানুষের দোষ-গুণ নির্ণয় করিতে জানেন, রাখাল-বালকের চক্ষু দেখিলে, তাঁহারা নিশ্চয়ই

মুক্তকণ্ঠে বলিবেন, "বালকটী পরম সুচতুর,—বীর্য্যবতী বুদ্ধির একান্ত প্রিয়ম্বদ।—এমন যে সুবুদ্ধিসম্পন্ন চতুর রাখাল-বালক, ভোগানন্দ ঠাকুর অযোধ্যার ক্ষেত্রপথে, কিঞ্চিৎ দূর হইতে, সেই রাখাল-বালকটীকে দেখিতে পাইলেন।—কি জানি কি আগ্রহে, কি কৌতূহলে, সেই বালকটীকে নিকটে পাইবার অভিলাষে, ভোগানন্দ ঠাকুর শীঘ্র শীঘ্র ঘোড়া ছুটাইয়া দিলেন।—সমান দ্রুতবেগে বন্ধুটীও অনুগামী।

ভোগানন্দ ঠাকুর সেই রাখাল-বালকটীকে ধরিলেন।—অশ্ব হইতে নামিলেন।—অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন;—সর্ব্ব-শরীর হইতে অনবরত ঘর্ম্মধারা বিনির্গত হইতেছিল;—কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামলাভের ইচ্ছা।—বিশ্রামলাভের ইচ্ছাও বটে, বালকটীকে দেখিবার ইচ্ছাও বটে.--দুটী ইচ্ছাই প্রবলা;—তথাপি বিশ্রাম-লাভের ইচ্ছা অপেক্ষা, ঐ পরমসুন্দর বালকদর্শনের ইচ্ছাটীই অধিক বলবতী।

দুটী ইচ্ছাই চরিতার্থ হইল।—বালকটী তাঁহাকে বিশ্রাম লাভের স্থান দেখাইয়া দিতে প্রস্তুত হইল।—নিজেও সঙ্গে সঙ্গে চলিল।—বদন যাহার প্রফুল্ল, হৃদয় তাহার কখনই অপ্রফুল্ল থাকে না।—রাখাল-বালক প্রফুল্লহৃদয়ে,—প্রফুল্লবদনে, সেই পথশ্রান্ত বন্ধুদুটীকে (অশ্বসহ) অদূরবর্ত্তী একখানি দোকানে লইয়া গেল।—ভোগানন্দকে, আর তাঁহার সহচর মিত্রবরকে দোকানের একটী শীতল নির্জ্জন স্থানে বিশ্রামার্থ বসাইল; শ্রান্তিদূর করিবার উপযুক্ত উপকরণগুলিও যোগাইয়া দিল; অশ্বদুটীকে বাহিরের দুটী বৃক্ষে বন্ধন করিয়া, কিছু কিছু দানা খাইতে দিল;—স্বহস্তে জল তুলিয়া ঘোড়াদুটীকে জলপান

করাইল,—চমৎকার দয়া!—চমৎকার সেবা!—দয়াল বালক নিকটে দাঁড়াইয়া, ঘোড়াদুটীর দানাখাওয়া দেখিতেছে, কখন কি প্রকারে গ্রীবা সঞ্চালন করে, কখন কি প্রকারে লেজ নাড়ে, বিলক্ষণ করিয়া তাহাও পরীক্ষা করিতেছে, এমন সময় ভোগানন্দ ঠাকুর তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।—ঘোড়াদেখা ছাড়িয়া, বালক তখনিই ভোগানন্দ দেখিতে ছুটিয়া গেল।

বালক বলিয়া ক্ষুদ্র শিশু নহে,—বালকের বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বর্ষ।—মুখখানি সর্ব্বদাই হাসি হাসি;—স্বভাব ধীর;—এক এক সময় বড়ই চঞ্চল হয়।

ধীর অথচ চঞ্চল,—এমন যে সুচতুর রাখাল-বালক, সেই বালক এখন দোকানঘরের ভিতর ভোগানন্দ ঠাকুরের নিকটে গিয়া বসিল। রাখাল-বালকের বয়স ধরিয়া দেওয়া হইয়াছে। ভোগানন্দের বয়সের কথা কিছুই বলা হয় নাই। উভয়ে যখন কোনপ্রকার আলাপ হইবার সম্ভাবনা বুঝা গেল, তখন উভয়ের বয়সটা এক সঙ্গে ভাঙ্গিয়া না দিলে, কেমন খাপছাড়া লাগিবে। এতক্ষণ যিনি শুদ্ধমাত্র "আগন্তুক যুবা-পুরুষ" বলিয়া, চলিয়া আসিতেছিলেন, এতক্ষণের পর তাঁহার নাম বাহির হইয়াছে। এসময় তবে আর তাঁহার বয়সের কথাটী অপ্রকাশ রাখিবার হেতু কি?—হেতু কিছুই নাই; এই সময় ভাঙ্গিয়া দেওয়াই ভাল। ভোগানন্দ ঠাকুরের বয়স প্রায় পঞ্চবিংশতি অসম্পূর্ণ;—সুচিহ্নসম্পন্ন পরমরূপবান যুবা-পুরুষ। গলদেশে যজ্ঞসূত্র আছে, ইহাতেও সপ্রমাণ হয় ব্রাহ্মণ,—নামের উত্তরে উপাধিতেও পরিচয় আছে ঠাকুর, ইহাতেও সপ্রমাণ হইতেছে ব্রাহ্মণ। যেটীকে গুপ্তভাবে

বিবাহসূত্রে বন্ধন করিয়া, বনের মাঝে ফেলিয়া আসিলেন, সেই বোবা মেয়েটীও ব্রাহ্মণের মেয়ে। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে, অভাবনীয়রূপে, এই বন-দম্পতীর ভাগ্যে আশ্চর্য্য জাতিমিলন সংঘটিত হইয়াছে।—এখন হইবে রাখাল-বালকের সহিত ভোগানন্দের গুপ্তকথা।—সাক্ষী কেবল ভোগানন্দের অজ্ঞাত নাম, নূতন আগত সহচর বন্ধু।

ভোগানন্দ কেন যে, সেই রাখাল-বালককে ডাকিয়া পাঠাই-য়াছেন, সে প্রসঙ্গটী মূলেই উঠিল না।—বালকের নাম, ধাম, বংশ, জাতি, ব্যবসা, ইত্যাদি সামাজিক বহু প্রশ্নোত্তরেই প্রায় এক দণ্ড অতিবাহিত হইল।

বালকের নাম নহবংলাল।—ভোরে নগরে যখন নহবং বাজে, সেই সময় ইহার জন্ম হয়;—সেই জন্যই ইহার নামের সঙ্গে নহবতের নাম যোগকরা।—নিতান্ত নূতন প্রথা নহে, তথাপি কিন্তু, ভাল করিয়া ধরিতে গেলে, এটীও একটী প্রশংসার অঙ্গ।—বালকটী বেশ ঠাণ্ডা,—বেশ মোলায়েম,—বেশ বুদ্ধিমান,—বিলক্ষণ সুচতুর। বালকটীর স্বভাব খুব খাঁটী, ইত্যাদি প্রশংসাবাদেও প্রায় অর্দ্ধদণ্ড অতিক্রান্ত। সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেকপ্রকার বাজেকথা।

পরিশেষে গোড়ার কথায় টান পড়িল।—ভোগানন্দ ঠাকুর একটু হাস্য করিয়া, নহবংলালের হাতে একটী মোহর দিলেন।—নহবংলাল পাকাছেলে ছিল,—দেখিবামাত্রই চিনিয়া লইল, মোহর;—পাইবামাত্রই ছিন্নবসনের ধড়ার খুঁটে খুব শক্ত করিয়া বাঁধিয়া লইয়া, সানন্দকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "মোহর পাইলাম!"

ভোগানন্দের বন্ধু এই উপহারটীর সানন্দ আদানপ্রদান দর্শন করিলেন,—নিগূঢ় ভাবার্থ কিছুই বুঝিলেন না ;—একবার ভোগানন্দের, একবার নহবতের মুখপানে বিস্মিতনয়নে চাহিয়া দেখিলেন।—তিনি হয় ত বুঝিলেন, রাখালটী তাঁহাদিগকে বিজন পথে আশ্রয় দেখাইয়া, বিশ্রামলাভের জোগাড় করিয়া দিয়াছে, সেই উপকারের প্রত্যুপকারস্বরূপই হয় ত এই মোহর-উপহারটী প্রদত্ত হইল।—যিনি যাহা বুঝেন, এই গোলমালের সময় তাহাই আমাদের ভাল।

ভোগানন্দ কিন্তু কিছুই গোলমাল বুঝিলেন না।—বালককে আরও নিকটে সরাইয়া বসাইয়া, সাগ্রহ-সস্নেহবচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নহবৎ!"

"আজ্ঞে!"

"আচ্ছা নহবৎ, তোমারে একটী ভালকথা জিজ্ঞাসা করিব, উত্তর দিতে পারিবে কি?"

"যদি জানি, অবশ্য উত্তর দিব।—কোথাকার কথা?"

"দক্ষিণের বনের।—পারিবে কি?"

"আজ্ঞা করুন।"

এই স্থানে বোধ হয়, ভোগানন্দের বন্ধুটীর নাম বাহির করিবার প্রয়োজন হইতেছে।—ক্রমাগত পুনঃপুন "বন্ধুটী বন্ধুটী" করিয়া পাঠক-পাঠিকার কর্ণগুলিকে জ্বালাতন করা আর আমাদের উচিতকার্য্য হইতেছে না।—ভোগানন্দ নিজে কেবল এক একবার বন্ধুটীকে আদর করিয়া, রহস্যচ্ছলে "মাখনলাল" বলিয়া সম্ভাষণ করিতেন। বাস্তবিক মাখনলালের অন্য একটী প্রকৃত নাম আছে।—এ আখ্যায়িকার কোন স্থলেই

তাহা প্রকাশ নাই। ভোগানন্দের বন্ধুর নাম সদাশিব মিশ্র। সদাশিবের নিবাস মগধে নহে, ইনি বঙ্গদেশের নবদ্বীপ-নিবাসী।—সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্রে ইহাঁর সবিশেষ ব্যুৎপত্তি আছে।—বড়দরের দার্শনিক-পণ্ডিত হইয়াও তিনি, ভোগানন্দের তখনকার প্রশ্নের ভাবটীর আসল ভাবটী কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না।—পূর্ব্ববৎ ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া একবার প্রশ্নকর্ত্তার মুখপানে,—দ্বিতীয়বার উত্তরদাতার মুখপানে নির্নিমেষে স্থিরদৃষ্টি।

এইখানে আবার একটু বাধা পড়িল।—যে দোকানে ভোগানন্দ আসিয়া আশ্রয় লইয়াছেন, সেই দোকানখানির কিছু কিছু বর্ণনা চাই।—ঘরখানি কেমন, বোধ করি সে কৈফিয়তের কোন আবশ্যক হইবে না।—মোটামুটি এইটুকু খোলসা থাকিলেই চলিবে যে, পাকা দালান নহে;—নীচে খুঁটী-বেড়ার উপরে পাতা দিয়া ছাওয়া।—এখানে পাকা দালান শব্দে "কোটাঘর" বুঝিতে হইবে।—"কোটাঘর" না বলিয়া তবে "দালান" বলা হইল কেন, এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা নিতান্ত ঠকিব না।—রাঢ়দেশের হুগ্‌লী জেলা পার হইলেই বর্দ্ধমানাদি উত্তরপশ্চিমে প্রায় সকল লোকেই কোটাঘরকে "দালান" বলেন।—পূর্ব্ববঙ্গপ্রদেশের অনেক লোক আজিও ইষ্টকালয়কে "কোটাঘর" বলিলে কিছুই বুঝিতে পারেন না;—"দালান" বলিয়া বুঝাইয়া দিতে হয়।—আমাদের অঞ্চলে এপ্রথা প্রচলিত নাই।—আমরা কেবল পূজার দালানকেই "দালান" বলি;—শয়নগৃহের অথবা অন্যগৃহের সম্মুখস্থ প্রশস্ত আবৃত স্থানকে "দরদালান" বলা হয়।—এতদ্ব্যতীত,

এ অঞ্চলের সাধারণ লোকে "দালান" কথা শুনিলেই সাধারণতঃ "কোঁটাবাড়ী" বলিয়া বুঝিয়া লইতে অক্ষম।—এই ত দুই পক্ষে দুই কথা।—কোন্ পক্ষ এখন ঠিক, এস্থলে আমরা তাহার বিচারকর্ত্তা হইব না।

এটাও একটা সামান্য গণ্ডগোল নয়।—দোকানের কথা উত্থাপন করিয়া, দালানের কথা আনিয়া ফেলা হইয়াছে; পাঠকমহাশয়েরা ইহাতে বিরক্ত হইবেন না।—হাস্য করিতে ইচ্ছা হয়, হাস্য করুন,—বিরক্ত হইবেন না।—দোকানের কথা আমাদের মনে আছে।—ঘরখানি নিতান্ত প্রশস্তও নয়,—নিতান্ত অপ্রশস্তও ছিল না,—মাঝারি-কেতার দোকানঘর।—গ্রাম্য মুদীর দোকানে সচরাচর যেসকল সামগ্রী বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে,—পচা-ধসা হইলেও ফেলা যায় না,—অযোধ্যার গ্রাম্য-পথের দোকানখানিও "মুদিগণের কর্ত্তব্যবিধির" ঐ আইনটী অগ্রাহ্য করে নাই;—এ দোকানে তাহাই প্রস্তুত আছে। বেশীর ভাগে ময়রার দোকানের মাসিক-ত্রৈমাসিক কোন কোন "উপাদেয়" (ছাতাধরা!) মিষ্টান্ন-ভোগেরও কিছু কিছু প্রায় সদাসর্ব্বদাই আকাঙ্ক্ষামত সুলভমূল্যে কিনিয়া লইতে পাওয়া যায়।—সুতরাং ইহা হয় একখানি দোহারা-রকমের-গ্রাম-গুল্‌জার প্রথমশ্রেণীর মুদিখানা।—ইহার অধিকারিণী একটী লোলচর্ম্মা মেয়েমানুষ।—তাহার বয়ঃক্রম অনুমান ৭০।৭৫ বৎসর। বুড়ীর নাম যমুনা বাই।—ইহাছাড়া বুড়ীর একটী ডাক্‌নাম আছে।—মুদিখানার ভালবাসা খদ্দেরেরা বুড়ীকে আদর করিয়া, "জটাইদিদি" বলিয়া ডাকে।—ভোগানন্দঠাকুরের সহিত রাখাল-বালকের যেসকল কথোপকথন হইতেছে, জটাইদিদি তাহা

একমনে, স্থিরকর্ণে, সমস্তই শুনিতেছে;—একটী কথাও ছুট্ যাইতেছে না।—অথচ, খদ্দের ফিরিতেছে না।—এত বয়সেও এতবড় বুড়ীর ক্ষিপ্রকারিতা কমে নাই!—অতিথিদের কথোপকথন শুনিতেছে, অথচ ওদিকে, বেশ চট্‌পট্ করিয়া সূক্ষ্ম দাঁড়ীপাল্লা ঘুরাইতেছে। খদ্দেরের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়; ঘণ্টায় প্রায় দশ জনের কাছাকাছি।

বালককে সম্বোধন করিয়া ভোগানন্দ কহিলেন, "আচ্ছা নহবৎ! এখান হইতে প্রায় দুই ক্রোশ দক্ষিণে একটী পরমসুন্দর কানন আছে, তাহা তুমি জান?"

"জানি।"

"সেই কাননমধ্যে ক্ষুদ্র একটী সরোবর আছে?"

"সেই সরোবরকূলে একটী বনবাসিনী স্ত্রীলোক নিত্য নিত্য ছাগল চরায়, তাহাকে তুমি দেখিয়াছ?"

"অনেকবার!"

এইস্থানে ভোগানন্দ ঠাকুর দীর্ঘবক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। সংক্ষিপ্ত আড়ম্বর করিয়া, প্রথমেই তিনি কহিলেন, "স্ত্রীলোকটী বেশ সুশ্রী;—আমি তাহার সহিত কথা কহিয়াছি;—উত্তর দিয়াছে;—কথা কহিয়া উত্তর দেয় নাই,—ইসারা করিয়া উত্তর দিয়াছে।"

হাস্য করিয়া নহবৎ কহিল, "সে ঐরকম দেয়; বেশ মেয়ে! ইসারাতেই সব কথা কয়!"

"কেন নহবৎ? মেয়েটী কি তবে বোবা?—আমিও ভেবেছি বোবা। দেখ নহবৎ! আন্দাজে আন্দাজে কহক কতক

ঐ রকম আমি ভেবেছি বটে, কিন্তু সন্দেহ ঘুচে নাই।—এখনো এক একবার মনে হোচ্ছে, সে হয় ত ছল কোরে আমার কাছে বোবা সেজেছিল।—আমার অনুমানটা হয় ত ভুল!”

“নেহি সাব্!—ভুল নয়! বুনীদিদি সত্যসত্যই বোবা! আহা! বুনীদিদি বেশমানুষ! যে দেখে, সেই তাহাকে ভাল বাসে। বুনীদিদিকে আমরা বড়ই ভালবাসি।—আগে আগে রোজ রোজ এই গ্রামে আস্তো,—আজকাল আর বড়একটা আসে না।—আমরাও তাই ভাবি;—রোজ রোজ তাই বলাবলি করি;—সকলকেই বলি, বুনীদিদি কেন আসে না?”

বালক নহবৎলাল্ল বনবালার এইরূপ পরিচয় দিয়া,—বনবালা আসে না বলিয়া,—ঐরূপ আপ্সোস্ করিয়া,—বনবালার প্রকৃত জীবনবৃত্তান্ত যতটুকু জানিত, তৎসমস্তই বিশেষ করিয়া, ভোগানন্দের কাছে প্রকাশ করিল।—যাহা যাহা বাকী রহিল, জটাইদিদির অনুগ্রহে তাহাও এক্ষেত্রে কিছুই অপ্রকাশ রহিল না।—ভোগানন্দ ঠাকুর নিঃসংশয়ে সম্পূর্ণরূপেই অবগত হইলেন, বুনীদিদির ইতিহাস।

ভোগানন্দের আনন্দের সীমা নাই।—পরমানন্দে জটাই-দিদিকে পাঁচটী মোহর পুরস্কার দিলেন।—বেশী খুসী হইয়া নহবৎকেও আর পাঁচটী।—উভয়েই দস্তরমত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল।—মুদিখানার মধ্যে ভোগানন্দ ঠাকুরের আরও যেন সেবা-যত্ন বাড়িল।

ইতিহাসটী ছোট নয়।—দুই মুখে আদ্যোপান্ত সমস্তই শ্রবণ করা হইল।—প্রবল উৎসাহের সময় একবারমাত্র অত-কথা শুনিয়া, ঠিক ঠিক মনে করিয়া রাখিতে পারেন, সংসারে

তেমন লোক বড় বেশী নাই।—মনে করিয়া রাখিতে পারিবেন কি না, ভোগানন্দ ঠাকুর অন্যমনস্ক হইয়া, কেবল তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।—আবার জিজ্ঞাসা করাটা শিষ্টাচারবিরুদ্ধ মনে করিয়া, তাহাতেও সাহসী হইলেন না।—ভাবিলেন, ইহাও ত সামান্য সঙ্কট নয়!

ভোগানন্দের সঙ্কট ভোগানন্দের কাছেই থাকুক;—আসল তত্ত্বে একটুও সঙ্কট রহিল না।—ভোগানন্দের মিত্র সদাশিব মিশ্র একপ্রকার শ্রুতিধর ছিলেন।—একবার যাহা শুনিতেন, মাসেক-ছমাসে তাহার একটী কথাও ভুলিতেন না।—সঙ্গে লিখনসামগ্রী ছিল না,—লিখিয়া লওয়া হইল না,—কিন্তু, সদাশিব সমস্তই মনে রাখিলেন;—বনবালার শোকাবহ কাহিনীটী, আগাগোড়া সমস্তই তাঁহার মুখস্থ হইয়া রহিল।

রাত্রি হইল।—বনে যখন বনবালার সঙ্গে ভোগানন্দ ঠাকুরের প্রেমালাপ হইতেছিল, বনে যখন সদাশিব মিশ্রের প্রথম উদয়, আকাশে তখন সূর্য্যদেবের পশ্চিমগতি;—বেলা তখন প্রায় তৃতীয় প্রহর।—বনে যখন বনবালার সঙ্গে ভোগানন্দের বিচ্ছেদ ঘটে, বেলা তখন তিন প্রহর অপেক্ষা অনুমান চারিদণ্ড বেশী; তাহার পর অশ্বারোহণে দুই ক্রোশ পর্য্যটন;—রাখাল-বালকের সঙ্গে যখন সাক্ষাৎ হয়, সূর্য্য তখন রক্তবর্ণ;—একটু পরেই অস্ত;—দোকানে পৌঁছিতেই সন্ধ্যা;—তাহার পর কত প্রকার গল্প;—এখন রাত্রি হইল।—রাত্রি প্রায় কাছাকাছি এক প্রহর।—মিত্রসহচর ভোগানন্দ ঠাকুর কাজেকাজেই সেই মুদিখানার মধ্যে সে রাত্রি অতিবাহিত করিতে বাধ্য হইলেন। উষাকালেই নগরযাত্রা।

অযোধ্যানগরীর প্রকাশ্য রাজপথের একটী নির্জ্জন কেন্দ্রে, একখানি জম্‌কালো অট্টালিকায় ভোগানন্দের বাসা।—বাসায় উপস্থিত হইয়াই সদাশিব মিশ্র একটু যেন ব্যস্ত হইয়া, বন্ধুর হস্তে একখানি পত্র দিলেন।—ভোগানন্দের মন তখন অন্য দিকে;—পত্র দেখিয়াই তিনি আরও যেন উন্মনা হইলেন। পত্রখানি মগধ হইতে আসিয়াছে, পত্রে আত্মানন্দঠাকুরের দস্তখত মোহর।—আত্মানন্দ ঠাকুর ভোগানন্দ ঠাকুরের জন্মদাতা পিতা, পাঠকমহাশয় হয় ত সেকথা ভুলেন নাই। ভোগানন্দ অন্য-মনস্ক ছিলেন যথার্থ, তথাপি, পিতৃস্বাক্ষরিত পত্র অবশ্যই পাঠ করিতে হয়;—অবশ্যই পাঠ করিতে হইল;—অবশ্যই পাঠ করিলেন।—জোর তলব।—পিতা লিখিতেছেন, "পত্র পাইবা-মাত্র গৃহে আসিবে।"—মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল।

কথাটীও অব্যর্থ সত্য।—অমন সময় অমন পত্র নিশ্চয়ই যেন মাথার উপর আকাশ ভাঙ্গিয়া ফেলে!—ভোগানন্দের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল!—গত রাত্রে মুদিখানার দোকানে বনবালার পরিচয় পাইয়া, মনোমধ্যে যে অপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হইয়াছিল, পিতৃপ্রেরিত পত্রখানি পাঠ করিয়া, সে আনন্দটুকু যেন অকস্মাৎ কোথায় উড়িয়া গেল, কিছুই টের পাইলেন না। উৎসাহে উৎসাহে আগমন করিয়াছিলেন, সম্মুখে অকস্মাৎ নিরুৎসাহের হতাশ মূর্ত্তি!—মনোবিমর্ষে ভোগানন্দ ম্রিয়মাণ।

অন্যমনস্কে যাহা কিছু পাঠ করা যায়, ঠিক ঠিক তাহার অর্থবোধ হয় না;—চক্ষেও অক্ষরগুলির চেহারা ঠিক ঠিক ঠেকে না;—ভোগানন্দের চক্ষেও পিতার পত্রের সব অক্ষরগুলি ঠিক ঠিক ঠেকিল না;—পড়িবার মধ্যে তিনি কেবল এইটুকু

পড়িলেন,—বুঝিবার মধ্যে তিনি কেবল এইটুকু মাত্র বুঝিলেন, "পত্র পাইবামাত্র গৃহে আসিবে।"—এইটুকু পাঠ করিয়াই ভোগানন্দের হতাশ!

হতাশের সময় হাস্যমুখী আশা আসিয়া চক্ষের কাছে এক একবার নাচিতে নাচিতে খেলা করে, বিদ্যুতের মত নল্ পাইয়া যায়;—ভোগানন্দের নেত্রসমীপেও হাস্যমুখী আশা আসিয়া দর্শন দিলেন।—আশা যেন ভোগানন্দের কাণে কাণে কহিলেন, "শীঘ্রই বনবালার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে।"—ভোগানন্দের হৃদয় যেন নাচিয়া উঠিল!—

গৃহগমনের সত্বরতা বুঝিলে, সকলের মনেই আহ্লাদ হয়;—গৃহগমনের সত্বরতা বুঝিয়া, ভোগানন্দের মনে একটুও আহ্লাদ হইল না;—আহ্লাদের বদলে বরং ঘোরতর বিষাদ আসিয়া উপস্থিত হইল। একদিকে পিতৃআজ্ঞা,—গৃহে যাওয়া;—অন্য দিকে বনবালার প্রেমাকর্ষণ,—বনে যাওয়া। কোন্ দিকের কোন্ আকর্ষণকে বড় বলেন,—কোন্ পক্ষের কোন্ আকর্ষণ বলবান হয়, ভাবিয়াই ভোগানন্দ অস্থির! তাঁহার মন যেন কবি হইয়া, মনে মনেই গান গাইতেছেঃ—

বুনী রে!—

বনে কেন এসেছিনু আমি!
কেন তোরে হেরেছিনু, কেন মন সঁপেছিনু,
কেন মোরে বলেছিলি স্বামী?

বুনী রে!—
যাই ভাই অযোধ্যা ছাড়িয়া!
আজিরে বিজন বনে, হারাইনু তোমাধনে,
বিধি নিধি লইল কাড়িয়া!

বুনী রে!—
বনে আর যাব কিরে ফিরে?
ফিরিবে কি হারামন, পাইব কি হারাধন,
হারানিধি মিলিবে কি ফিরে?

আশ্চর্য্য!—আশ্চর্য্য!!—আশ্চর্য্য!!!—অকৃত্রিম প্রণয়ের অকৃত্রিম মহিমাই আশ্চর্য্য!—ভোগানন্দঠাকুর নবীন প্রেমে মাতিয়াছেন। বনবালাকে দেখিবার নিমিত্ত তাঁহার কৌতূহল মুহুর্মুহু জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে। রাসেশ্বরী শ্রীমতী রাধিকা যেমন "শ্যাম রাখি কি কুল রাখি গো বৃন্দে সই!"—এই গীতটী গাইয়া বৃন্দাদূতীর নিকট আব্‌দার করিয়াছিলেন, বেচারা ভোগানন্দও আজ সেইপ্রকার উভয়-সঙ্কটের মধ্যে দণ্ডায়মান। একদিকে পিতৃআজ্ঞা,—অন্যদিকে প্রেমপুত্তলী বনবালার প্রেমাকর্ষণ!—দুটী কথার একটী কথাও ছোট নয়!

সঙ্কটে পড়িলেই ভাবনা আসিয়া উপস্থিত হয়।—ভোগানন্দ ভাবিতেছেন, "করি কি?—কোথায় যাই!—বনে কি ভবনে?—যদি বনে যাই, তাহা হইলে পিতার আদেশানুসারে গৃহে যাওয়া হয় না!—যদি গৃহে যাই, তাহা হইলে বনবাসিনী বনবালা হারাই!—যদিও না হারাই, তথাপি, শীঘ্র আর

বনবালাকে দেখিতে পাইব না!—একবারেই পাইব কি না, তাহাই বা কে বলিতে পারে!—পিতৃবৎসল, অথচ বিরহ-কাতর ভোগানন্দ ঠাকুর এইপ্রকার কতখানাই ভাবিতেছেন, একবার এদিক, একবার ওদিক, দুই দিকেই তাঁহার চিন্তাতরঙ্গের বিপরীত খেলা হইতেছে! সেই তরঙ্গের মাঝখানে ভোগানন্দের মনো-মরালটী ভাসিয়া ভাসিয়া সাঁতার খেলিতেছে;—অকস্মাৎ নেত্র হইতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল।

সদাশিবের চক্ষু এতক্ষণ অন্যদিকে ছিল, সহসা চক্ষু ফিরাইয়া দেখিলেন, প্রিয়বন্ধু কাঁদিতেছেন।—ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন সখে! তোমার চক্ষে জল কেন?"

অশ্রুমার্জ্জন করিয়া ভোগানন্দ উত্তর করিলেন, "রাখাল-বালকের রূপ মনে পড়িয়াছে!—আহা মরি!—কি সুন্দর ছেলেটী ভাই!—নামটীও আবার তেমনি সুন্দর!—নহবৎলাল!—আহা! কি চমৎকার!—কি চমৎকার!—যেমন রূপ, তেমনি নাম! বুদ্ধিটুকুও আবার সর্ব্বাপেক্ষা চমৎকার! গুছাইয়া গুছাইয়া কেমন চমৎকার গল্প বলিল!—সবকথা কি তোমার মনে আছে?—মিত্রবর! তুমি আমার জীবনসখা;—তোমার কাছে আমি চিরঋণী;—অনেক সময়ে তুমি আমার অনেকপ্রকার পুরাতন কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছ;—একবার যাহা শ্রবণ কর, শীঘ্র তাহা ভুলিতে চাও না, সেটী আমি বেশ জানি। ভাই! সদাশিব! নহবতের কথাগুলি ত তুমি ভুলিয়া যাও নাই?"

হাস্য করিয়া সদাশিব কহিলেন, "সেই দুঃখেই তোমার কান্না?—একটী কথাও আমি ভুলি নাই;—তোমার কথাও ভুলি নাই,—নহবতের কথাও ভুলি নাই।—তাহা ছাড়া, বৃদ্ধা

জটাইদিদি যাহা যোগ করিয়া দিয়াছেন, সেগুলিও আমার ঠিক্ ঠিক মনে আছে।"

"লেখোনা ভাই!"—দারুণ আগ্রহে ভোগানন্দ বলিয়া উঠিলেন, "লেখোনা ভাই!—লিখিয়া রাখো! কি জানি, কখনো যদি ভুল হয়, বনবালার দেখা যদি এজন্মে আর নাই পাই,—সে মাধুরীদর্শন, এজন্মে এভাগ্যে আর যদি নাই ঘটে, তাহা হইলেও তোমার হস্তাক্ষরে বনবালার ইতিহাস দর্শন করিবামাত্র বনবালাকে মনে পড়িবে,—হৃদয় জুড়াইবে, আমিও তখন স্বর্গ-সুখে সুখী মনে করিব।—লিখিয়া রাখো!"

বনবালার সহিত ভোগানন্দের বিবাহ হইয়াছে, সদাশিব মিশ্র এ কথার বিন্দুমাত্রও অবগত নহেন। ক্ষণকাল দর্শনে সদাশিব কেবল এইটুকুমাত্র বুঝিয়া লইয়াছেন যে, বনবালার রূপে ভোগানন্দের হৃদয় আকৃষ্ট,—বনবালাও ভোগানন্দের প্রতি অনুরাগিণী।—বস্!—এই পর্য্যন্ত!—ইহা ছাড়া আর না। সদাশিবের বিশ্বাস ইহার অধিক প্রণয়ানুরাগের অন্ত সীমা স্পর্শও করে নাই। তিনি ভাবিলেন, "প্রথমদর্শনের অনুরাগ বেশী দিন স্থায়ী হইবে না;—একবার ফিরিয়া গেলে, শীঘ্র আর অযোধ্যায় প্রত্যাগত হওয়াও ঘটিবে না;—তবে আর বন্ধুটীকে কেন কাঁদাই?"—লিখিয়া রাখি। মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া সদাশয় সদাশিব মিশ্র শীঘ্র শীঘ্র কাগজকলম ধরিলেন। গত রজনীতে জটাইদিদির মুদিখানার দোকানে বুনীদিদির প্রসঙ্গে যাহা যাহা শুনিয়াছিলেন, সমস্তই পরিষ্কার করিয়া লিখিলেন।—নহবতের মূল বাক্য,—নীচে নীচে জটাইদিদির পাকা পাকা টীকা।

গল্পটী লেখা হইল।—ভোগানন্দ তাহা পাঠ করিলেন। পড়িলেন আর কাঁদিলেন।—সদাশিব গুটীতিনেক দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।—দুই বন্ধুতে নয়নে নয়নে চাহিয়া কতই যেন কথা কহিলেন, রসনা তাহা উচ্চারণ করিতে পারিল না। এই দিনের রজনী অবসানেই অযোধ্যা হইতে মগধে যাত্রা করিবার দিনস্থির।

দিন গেল, রাত্রি আসিল।—রাত্রে ভোগানন্দের নিদ্রা হইল না। হৃদয়ে অবিশ্রান্ত বনবালার চিন্তা।—নবীন প্রেমিক নবীন কল্পনায় অবধারণ করিলেন, উষা আগমনের পূর্ব্বে যদি জটাইদিদির দোকানে পৌঁছিয়া, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে এই বাটীতে ফিরিয়া আসিতে পারি, তাহা হইলে কোথায় গিয়াছি, কি করিয়াছি, কখন গিয়াছি, কখন আসিয়াছি, কি কাজ, কি বৃত্তান্ত, বন্ধু হয় ত তাহার কিছুই জানিতে পারিবেন না। উষার পূর্ব্বেই প্রস্থান করা কর্ত্তব্য।

এই সংকল্পই স্থির।—উষা-আগমনের পূর্ব্বক্ষণ।—সদাশিব গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত।—আস্তে আস্তে গাত্রোত্থান করিয়া, চুপি চুপি অশ্বারোহণে, ভোগানন্দঠাকুর পশ্চিমদিকের গ্রাম্যপথে প্রবেশ করিলেন। ঘোড়াটীকে সপাসপ্ চাবুক মারিয়া, খুব দ্রুতগতিতে ছুটাইয়া দিলেন।—সত্যই তাই! উষাসতী তখনও পর্য্যন্ত অদর্শন।—মুদিখানার ঝাঁপ্-তাড়া নাড়িয়া, ভোগানন্দ ঠাকুর অনেকক্ষণ ধরিয়া ডাকাডাকি করিলেন, কাহারও উত্তর পাইলেন না।—একটী বৃক্ষতলে লুকাইয়া বসিয়া অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলেন, জটাইদিদির দোকানের দ্বার মুক্ত হইল না।

উষা আসিল।—গাছে গাছে পাখীরা উষাকালীন সুমধুর

রাগিণীতে, বিহঙ্গ-ভাষায়, মধুর মধুর গীত গাইয়া উঠিল। ভোগানন্দ ঠাকুর যেন অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াই পুনরায় জটাই-দিদিকে ডাকিতে আরম্ভ করিলেন। উত্তর আসিল না ;—কেহই উত্তর দিল না। ভোগানন্দ ভাবিলেন, "জটাইদিদি হয়,ত রাত্রিকালে দোকানঘরে শয়ন করিয়া থাকেন না,—প্রভাতেই আসিয়া দোকান খোলেন ; প্রভাতেই সাক্ষাৎ করিব।"—হয় ত আবার ভাবিলেন, "তাহাই বা কি করিয়া হয় ?—জটাইদিদির হস্তে ত পত্র দেওয়া হইবে না; নহবৎলালকে চাই।—নহবৎলাল কখন আসিবে, তাহাই বা কে জানে?"—ওদিকে সদাশিবের জাগিবার আশঙ্কা। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই বাসায় ফিরিতে হইবে। বিলম্ব করা অপরামর্শ।

যেমন অপরামর্শ, তেমনি কার্য্য।—ভোগানন্দ ঠাকুর বিমর্ষ-বদনে অশ্বারোহণ করিলেন ;—পূর্ব্বদিন অপরাহ্নে যে স্থানটীতে রাখাল-বালকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সুশিক্ষিত অশ্বের সাহায্যে ঠিক সেই স্থানটীতে উপস্থিত হইয়া, খানিকক্ষণ অশ্বসহ স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। পূর্ব্বদিক ফর্সা হইল। রাখাল-বালক আসিল না।—ভোগানন্দও চুপ্‌টী করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না। বনের দিকে ঘোড়া ছুটাইলেন। যে বনে বনবালা ছাগল চরায়, অল্পক্ষণমধ্যে সেই বনে উপস্থিত। বনবালার সঙ্গে দেখা হইল না! প্রাতঃকালে বনবালাকে সেখানে দেখিতে পাওয়া যায় না, ভোগানন্দ ইহা জানিতেন ;—সেদিন কিন্তু সেটী ভুলিয়া গিয়াছিলেন! ক্ষেত্রপথ হইতে বনযাত্রার সময় সে কথাটী তাঁহার মনেই ছিল না!

আসা বৃথা হইল!—সেই সঙ্গে আশাও বৃথা হইল!

ক্ষণকাল সরসীকূলে দাঁড়াইয়া কত কি জড়িবটী ভাবিলেন। বনমধ্যে কোন্ কুটীরে বনবালা বাস করে, সে তত্ত্বটী তিনি জানিতেন না ;—খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য উদ্যোগীও হইলেন না। বৈকালে আসিলেই দেখিতে পাইবেন, এই ভরসায় বাসায় ফিরিয়া চলিলেন।—বাসায় পৌঁছিলেন।—সদাশিব তখন জাগিয়াছেন। বাহিরেই বেড়াইতেছিলেন, বন্ধুকে অশ্বারোহী দর্শনে বিস্মিত হইয়া, সদাশিব শীঘ্র শীঘ্র জিজ্ঞাসিলেন, "ভোরেই ভ্রমণ ?—ব্যাপারখানা কি ?"

মনোভাব ঢাকিয়া, ঈষৎ হাস্য করিয়া, ভোগানন্দ উত্তর করিলেন, "ব্যাপারখানা কিছুই নয়।—অনেকদিন আসিয়াছি,—অনেকদিন আছি, রামচন্দ্রের জন্মস্থানে অনেকদিন ছিলাম. আজ বিদায় হইব,—একটী তীর্থপীঠ, (একটী ক্ষুদ্র মন্দির) এতদিন দর্শন করা হয় নাই, তাই—"

হাস্য করিয়া সদাশিব কহিলেন, "তাই বলিয়া বেলা করা ভাল হয় না। আমি এখানে প্রত্যূষে উঠিয়াই দেখি, তুমি নাই। মনে করিলাম, আবার বুঝি বনবাসী হইলে!"

একটু অপ্রতিভ হইয়া ভোগানন্দ কহিলেন, "বনবাসী হইতে সাধ হয়, কিন্তু পারি কৈ ?"

"পারিয়া কাজ নাই।—ইহ সংসারে যাহার এত মায়া, একটী বনবাসিনী কন্যাকে দেখিয়া যাহার অতখানি অনুরাগ, তাহার মুখে বনবাসের কথা ভাল শুনায় না।"

"শুনায় না বলিয়াই ত মনের আগুন মনে মনেই চাপিয়া রাখি!—গুমো আগুন খাই!"

এইপ্রকার রহস্যালাপ প্রসঙ্গ নানাপ্রকার ছোট ছোট তর্ক

বিতর্ক উঠিল;—কথার কৌশলে কেহই হারিলেন না,—কেহই জিতিলেন না। অবশেষে উভয় বন্ধু মিলিয়া স্বদেশে যাত্রা করিলেন। সঙ্গে যে সকল লোকজন ছিল, কর্ত্তামহাশয়ের চিঠী হস্তগত হইবামাত্র সেই রাত্রেই সদাশিব তাহাদিগকে অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন। বাকী ছিলেন দুই বন্ধু,—তাঁহারাও আজ অযোধ্যার কাছে বিদায়।

যখনকার কথা, তখন এদেশে রেলরোড ছিল না। জলে স্থলে যতদিনে অযোধ্যা হইতে মগধে আসা সম্ভব, সহচরসহ ভোগানন্দ-ঠাকুর ততদিনে পিতৃনিকেতনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।—যে ভাবের জরুরি চিঠী, গৃহে আসিয়া ভোগানন্দ সে ভাবের ত কিছুই লক্ষণ বিদ্যমান দেখিলেন না।—পিতা কেবল হাস্য করিয়া আদর করিলেন মাত্র।—পিতার আদরে হৃদয় প্রফুল্ল হইল বটে, কিন্তু মন রহিল বনে।—এই রকমে ক্রমাগত পাঁচমাস কাল ভোগানন্দের মন রহিল বনে!—একদিন নিশাকালে পিতৃসমীপে উপবিষ্ট হইয়া ভোগানন্দ একটী মিথ্যা কথা বলিলেন।—মিথ্যা বলা হইল বটে, কিন্তু গূঢ়কথা না জানিলে সে মিথ্যাটা ধরে কার সাধ্য?

পিতাকে সম্বোধন করিয়া ভোগানন্দ কহিলেন, "অযোধ্যায় আমি একটী জিনিস ফেলিয়া আসিয়াছি;—তাহার দাম খুব বেশী!—মহাজন বলেন বেশী, আমি বলি অমূল্য!—অনুমতি করুন, সেই অমূল্য বস্তুটী শীঘ্রই আমি লইয়া আসি।"

ভোগানন্দের পিতা বিলক্ষণ বিষয়ীলোক ছিলেন। বাণিজ্য-ব্যবসায়ে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ।—অমূল্য জিনিষের নাম শুনিয়া, নিঃসন্দিগ্ধ-মানসে পুত্রকে তিনি অযোধ্যাগমনে আশু অনুমতি দিলেন।

ভোগানন্দের ব্যবসা-বুদ্ধিটী অতিশয় প্রখরা।—প্রিয়বন্ধু সদাশিব মিশ্রের অদর্শন-সময়েই তিনি ঐরূপ অনুমতি আকর্ষণ করিয়াছেন। সদাশিব মিশ্র মধ্যে মধ্যে মগধে গমন করিয়া ভোগানন্দের সহিত প্রায় মাসাবধি একত্র বাস করিতেন, ইহাতে গড়ে প্রায় বৎসরের মধ্যে তিনচারিমাস মগধবাস সংঘটিত হইত। এবারে কিছু বেশী দিন ছিলেন, প্রায় একপক্ষ হইল, চলিয়া আসিয়াছেন; এই সুযোগেই সুকৌশলে পিতার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক ভোগানন্দ ঠাকুরের অযোধ্যায় পুনর্যাত্রা।—এবারে আর কেহই সঙ্গী নহে,—একাকীই শুভযাত্রা।

ভোগানন্দ অযোধ্যায় পৌছিলেন। এবারে ভোগানন্দের অযোধ্যাদর্শনে আসা নহে,—বনবালা-দর্শনে আসা।—পুরী-মধ্যে কোথাও আর নিমেষমাত্র অপেক্ষা না করিয়া, প্রিয়তমা বনবালা-দর্শনের বলবতী আশায়, ভোগানন্দ এককালে বনবালার সঞ্চরণ-বনে সরাসর যাত্রা করিলেন। বনবালা যে বনে ছাগল চরায়,—বনবালা যে সময় বনমাঝে সরসীকূলে উপস্থিত থাকে, ভোগানন্দ ঠাকুর ঠিক সেই সময়, সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন।—বনে বনবালা নাই।—ভোগানন্দ ঠাকুর ধরাখানা যেন শূন্যময় দেখিলেন।—বনে বনবালা কেন নাই, তাহার কারণ অনুসন্ধান করা ভোগানন্দের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। কেন না, বনবালার কুটীরের ঠিকানাটী ভোগানন্দের মূলেই জানা ছিল না।—অনেকক্ষণ সরসীকূলে প্রতীক্ষা করিলেন, বনবালা আসিল না।—ভোগানন্দের হৃদয়ে আতঙ্কের সঞ্চার! ভোগানন্দের হৃদয়ে অমঙ্গলের আশঙ্কা বলবতী।—সূর্য্যদেব তাঁহাকে আর বেশীক্ষণ কিরণবর্ষণে আলো দেখাইবেন না,

বনবালার বিরহের উপর সূর্য্যবিরহে নিবিড় বনস্থলী তাঁহার নয়নে ঘোর অন্ধকার বোধ হইবে,—বনবালার অন্বেষণের বন-পথ দেখিতে পাইবেন না,—সেই চিন্তায় অধীর হইয়া, আলো থাকিতে থাকিতে, অজ্ঞাত বনপথে চিন্তাকুল ভোগানন্দ ঠাকুর দ্রুতপদে অগ্রসর হইলেন।—যাইতেছেন,—যাইতেছেন,—কত দূরই যাইতেছেন,—বনতরুর প্রতিরোধে বাঁকিয়া বাঁকিয়া, কত দিকেই ঘুরিতেছেন,—একখানি কুটীরেরও চিহ্ন দেখিতে-ছেন না।—বেলা প্রায় অবসান।—বৃক্ষলতা ভেদ করিয়া, হতাশ প্রেমিক তখন আরও খানিকদূর পশ্চিমদক্ষিণে পরিভ্রমণ করিলেন।—লতাপাতা-ঢাকা একখানি ক্ষুদ্র কুটীর অদূরে তাঁহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল।—ভোগানন্দ আহ্লাদে ছুটিয়া, তত্ত্ব জানিতে গেলেন।—উঁকি মারিয়া দেখিলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে সেখানিও শূন্য কুটীর!

এইবারেই পূর্ণ হতাশ!—ভোগানন্দ দিশাহারা!—বক্ষ শুষ্ক,—কণ্ঠ শুষ্ক,—নয়ন শুষ্ক!—আর বনবালাকে পাওয়া গেল না!—সন্ধ্যা হইবারও বড়জোর দুই দণ্ড মাত্র বিলম্ব।—নিশা-কালে—অজ্ঞাত বনে, পর্ণকুটীর অন্বেষণের আকিঞ্চন নিশ্চয়ই নিষ্ফল,—সঙ্গে সঙ্গে বরং নিজেরই বিপদ ঘটিবার ভয়,—কাজে কাজেই ভোগানন্দ তখন ভগ্নহৃদয়ে "চাচা,আপন বাঁচা!"—এই দিব্যমন্ত্রের দায়ধরা উপাসক হইলেন!—হতাশে ছুটিয়া ছুটিয়া গ্রাম্যপথের সমীপবর্ত্তী হইলেন।—নগর হইতে এবারে একটী পূর্ব্বপরিচিত আস্তাবলনিবাসী দিব্য একটী দ্রুতবেগশালী সুশিক্ষিত অশ্ব ভাড়া করিয়া আনিয়াছিলেন।—সূর্য্যাস্তের অল্পক্ষণ পূর্ব্বে—ভোগানন্দ সেই ভাড়াটিয়া অশ্বে আরোহণ

করিয়া সজোরে চাবুক বসাইলেন!—ঘোড়া যেন তীরবেগে দৌড়িতে লাগিল।—তখনও অল্প অল্প আলো আছে।

পূর্ব্বে যেখানে রাখাল-বালকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, ভোগানন্দের ভাগ্যক্রমে—সেদিনও সেইখানে সেই রাখাল-বালক। ভোগানন্দ দেখিলেন, রাখাল-বালকটী গৃহগমনের উপক্রম করিতেছে। তৎক্ষণাৎ ধীরে ধীরে ঘোড়া থামাইয়া ক্ষেত্রপথে নামিলেন।—রাখাল-বালককে ধরিলেন!—তাহার হস্তে একটী মোহর দিয়া, ব্যগ্রতা সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নহবৎ! তোমাদের বুনীদিদি কোথায়?"

নহবৎ উত্তর করিল, "বুনীদিদি আছে।"

ভোগানন্দ যেন উল্লাসে লাফাইয়া উঠিলেন।—নিরাশার উপর আশ্বাসের উদয়! আশ্বাসের উপর আরও সুসংযোগ। নহবৎলাল তাঁহাকে পূর্ব্বের ন্যায় জটাইদিদির দোকানঘরে লইয়া গেল।—দোকানেই ভোগানন্দের নিশা-যাপন।

সন্ধ্যার পর নহবৎ ও জটাইদিদি, উভয়েই ভোগানন্দের নিকটে বনবালার বর্ত্তমান অবস্থার কথা বিশেষ করিয়া বর্ণন করিল। তত কথা একসঙ্গে লিখিয়া দিলে, পাঠকমহাশয় হয় ত ধৈর্য্যহারা হইবেন। অতএব সংক্ষেপে সংক্ষেপে নহবৎলালের গুটীকতক কথা প্রকাশ করিলেই কাজ হইবে।

নহবৎ বলিল, "বুনীদিদি কলঙ্কিনী!—বুনীদিদি গর্ভবতী! এ গ্রামের সকলেই তাহাকে বেশ ভালবাসিত, এখন আর কেহই ভালবাসে না!—দেখিতেই পারে না!—দেখিলেই দূর দূর করিয়া তাড়ায়! —বনমধ্যে যে কুটীরে বুনীদিদি থাকিত, এখন আর সে কুটীরে নাই।—আমরা তাহাকে অন্য স্থলে

লুকাইয়া রাখিয়াছি। আমি আর জটাইদিদি ছাড়া, আর কেহই এখন তাঁহাকে দেখিতে পায় না; আপনিও দেখিতে পাইবেন না। আহা! বুনীদিদি ভারী গরিব!—আপনার কথাবার্ত্তা শুনিয়া বুঝিতেছি, আপনি আমাদের বুনীদিদিকে ভালবেসেছেন। বুনীদিদিকে যে ভালবাসে, তারেই আমি ভালবাসি।" কতক বিষাদে, কতক আহ্লাদে, তাড়াতাড়ি এই সকল কথা বলিয়া, নহবৎলাল ভূলুণ্ঠনপূর্ব্বক ভোগানন্দের পদধূলি গ্রহণ করিল। সহাস্যবদনে ভোগানন্দও আশীর্ব্বাদ করিলেন। একটু একটু বিস্ময়ও মনে আসিল। পুনর্ব্বার হাস্য করিয়া, সস্নেহবচনে ভোগানন্দ পুনর্ব্বার কহিলেন, "আচ্ছা নহবৎ!"

"আজ্ঞে?"

"সত্যই কি আমি তোমাদের বুনীদিদিকে আর দেখিতে পাইব না?"

"না।"

"গ্রামের আর কেহই কি এখন তোমাদের বুনীদিদিকে ভালবাসে না?"

"না।"

নতবদনে মৌনভাবে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া, ভোগানন্দ-ঠাকুর একটু যেন অন্যমনস্কভাবে, চিন্তাকুল মৃদুস্বরে, সেই সুশীল বালককে কহিলেন, "নহবৎ!"

"আজ্ঞা করুন।"

"তোমাদের দোকানে কিছু লিখিবার কালী-কলম আছে?"

জটাইদিদি মেয়েমানুষ,—একে মেয়েমানুষ, তাহার উপর আবার বুড়োমানুষ;—একে বুড়োমানুষ, তাহাতে আবার

লেখাপড়া জানে না ;নহবৎ নিজেও কখনো পাঠশালায় প্রবেশ করে নাই, কালীকলম ছোঁয় নাই,—সুতরাং লেখাপড়া তাহার কাছে অপরিজ্ঞাত। এমন অবস্থায়, এমন মুদিখানায় লিখিবার সরঞ্জাম কেন থাকিবে?—একটীবার মাথা চুলকাইয়া নহবৎলাল উত্তর করিল, "আমরা কালীকলম রাখি না।"

পুনর্ব্বার একটু চিন্তা করিরা, ভোগানন্দ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা,—কোথাও হইতে আনিয়া দিতে পার?"

চিন্তা করিয়া,—একটু উৎফুল্ল হইয়া, বালক ধীরে ধীরে উত্তর করিল, "পারি।"

চমৎকার সপ্রতিভ রাখাল-বালকের সপ্রতিভতার পুরস্কার-স্বরূপ, তাহার হস্তে আর একটী স্বর্ণমুদ্রা প্রদানপূর্ব্বক, সময়োচিত আনন্দে, বালকের পীঠ চাপড়াইয়া, ভোগানন্দ ঠাকুর প্রফুল্ল বদনে, সময়োচিত সস্নেহ বচনে কহিলেন, "যাও ভাই, আনিয়া দাও,—বিশেষ প্রয়োজন!"

বালকটী যেমন নম্র, তেমনি আজ্ঞাবহ। ইহার উপর আবার কথায় কথায় বক্‌সিস্ পাইতেছে—অর্থ পাইলে সকলেরই আমোদ হয় বটে, বিশেষত বালকের আর মেয়েদের;—রাখাল-বালক উৎসাহ পাইয়া, এক দৌড়ে নিকটস্থ গ্রাম হইতে এক ফর্দ্দ কাগজ, আর দোয়াত-কলম আনিয়া হাজির করিল।

ভোগানন্দ সাগ্রহে বালকের হস্ত হইতে দোয়াত-কলম গ্রহণ-পূর্ব্বক, হাস্য করিয়া কহিলেন, "বেঁচে থাকো! কাগজে আমার প্রয়োজন নাই, কাগজ আমার আছে।"—নহবৎকে এই কথা বলিয়া, অঙ্গাবরণ হইতে একখানি পত্রিকা বাহির করিয়া, ভোগানন্দ-ঠাকুর ক্ষিপ্রহস্তে তাহার এক পৃষ্ঠে অনেকগুলি কথা

লিখিয়া লইলেন। কতই লিখিলেন,—কতই ভাবিলেন, কতই কাটিলেন,—কতই যোগ করিলেন, একবার হাসিলেন, দুই তিনবার চক্ষে জল পড়িল;—জলের সঙ্গে সঙ্গে লেখাও সমাপ্ত হইল।

পাঠকমহাশয় স্মরণ করিবেন, প্রথমসাক্ষাতের রজনীতে এই মুদিখানায় বসিয়া রাখাল-বালকের মুখে আর জটাই-দিদির মুখে ভোগানন্দ-ঠাকুর আপনাদের দুঃখিনী বন-নলিনীর যে শোকাবহ কাহিনী শ্রবণ করিয়াছিলেন,—শোনা-কথা মনে রাখিয়া, ভোগানন্দের বন্ধু সদাশিব মিশ্র অযোধ্যার প্রবাস-ভবনে যে পত্রিকায় সেই কাহিনীটী লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, ভোগানন্দের হস্তস্থিত পত্রিকাই সেই পত্রিকা। পূর্ব্বে তাহাতে যে যে কথা লেখা ছিল, সেই সকল কথার সহিত যোগ করিয়া, ভোগানন্দ আজ নহবৎলালের নূতন কথাগুলি সংক্ষিপ্ত বিস্তারে ঐ পত্রিকায় লিখিয়া লইলেন।—লিখন সমাপ্ত করিয়াই দুই তিন বার পাঠ করিলেন।—যেখানে যেখানে দুটী একটী কথা ছুট্ ছাট্ গিয়াছিল, শেষবার পাঠ করিবার সময় লেখক আবার সেগুলিও যথাযথ স্থানে ঠিক ঠিক করিয়া বসাইলেন। তখন আবার ভোগানন্দের বদনে আর একপ্রকার নবীন ভাবের আবির্ভাব!—বিস্ময়-মিশ্রিত—কৌতূহল-মিশ্রিত—আনন্দ-মিশ্রিত প্রফুল্ল ভাব! সেই প্রফুল্লভাবে প্রফুল্ল নয়নে কৌতূহলী প্রেমিক একবার রাখাল-বালকের প্রতি কটাক্ষে দৃষ্টিপাত করিলেন;—ওষ্ঠাধরে নূতন হাসি দেখা দিল। বালককে সম্বোধন করিয়া তিনি সকৌতুকে কহিলেন, "নহবৎ! অযোধ্যাসহরের গুণ আছে!—তুমি একজন গণক আছ! কাগজে আমার প্রয়োজন ছিল না,—তুমি কাগজ

আনিয়াছ। ভালই করিয়াছ। নহবৎ! তুমি আমার পরম-বন্ধু!—বয়সে বালক বট, কিন্তু গুণে তুমি আমার পরম উপকারী বন্ধু। নহবৎ! আমি তোমারে আজ বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিলাম, —কখনই এ বন্ধুত্ব ভুলিব না; যেখানেই থাকি, তোমারে আমি বন্ধু বলিয়া সর্ব্বদা স্মরণ করিবই করিব; অবকাশ পাইলেই অযোধ্যায় আসিয়া দেখিয়া যাইব। দাও ভাই, তোমার কাগজখানি আমাকে দাও!"—

আহ্লাদে অগ্রসর হইয়া রাখাল-বালক তৎক্ষণাৎ সেই কাগজখানি প্রদান করিল। ভোগানন্দও আহ্লাদে তাহা গ্রহণ করিয়া মূল পত্রিকার সমস্ত কথাই অবিকল ঐ নূতন কাগজে লিখিয়া লইলেন। ইহার নাম অবিকল নকল।—দুইখানি পত্রিকা ঠিক্ ঠিক্ মিলাইয়া লইয়া, লেখক আবার মূল পত্রিকার শেষে গুটীকতর্ক নূতন কথা যোগ করিলেন। নকলেও সেই নূতন কথাগুলি যত্নপূর্ব্বক তুলিয়া লইলেন।

জটাইদিদি নিস্তব্ধ, বালক নিস্তব্ধ, ভোগানন্দ নিজেও এখন নিস্তব্ধ। এই তিনটীর নিস্তব্ধতার মধ্যে বালকের চক্ষু দুটী সেই সময় ভোগানন্দের চক্ষের সঙ্গে বেশ যেন স্পষ্ট স্পষ্ট কথা কহিতেছে, নয়ন ক্ষণকাল ভোগানন্দের নয়ন হইতে ফিরিল না। ভোগানন্দ কিন্তু সে ভাব দেখিলেন না। যত্নপূর্ব্বক ধীরে ধীরে পত্র দুখানি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মোড়ক করিলেন। এই সময় সহসা বালকের চক্ষে তাঁহার চক্ষুদুটী বিনিক্ষিপ্ত হইল। বালক অমনি ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

ভোগানন্দও হাস্য করিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় তিনিই জানিতেন, বালক তাহার কিছুমাত্রই জানিত না। তবে কেন

বালকটী ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল, এ প্রশ্নের উত্তর আর কিছুই নহে, বালকদের প্রকৃতিই ঐরকম। যেখানে ভালবাসা দেখে, চক্ষে চক্ষে মিলন হইবামাত্র, বালকেরা সেইখানেই ফিক্ করিয়া হাসে।

হাস্যমুখ বালকের হস্তে ভোগানন্দ ঠাকুর সহাস্যমুখে পূর্ব্বোক্ত দুখানি মোড়কের একখানি মোড়ক সমর্পণ করিলেন। বলিয়া দিলেন, "যাও ভাই, এই পত্রখানি তোমাদের বুনীদিদিকে দিয়ে এসো।"

হাস্য করিয়া বালক কহিল, "পত্র লইয়া বুনীদিদি কি করিবে?—লিখিতে জানে না, পড়িতে জানে না, অপরে পড়িয়া দিলেও শুনিতে পাইবে না, তবে তাহাকে পত্র দিতে আপনার ইচ্ছা কেন?"

গম্ভীরবদনে হাস্য করিয়া ভোগানন্দ কহিলেন, "ইচ্ছা কেন, তুমি তাহা বুঝিবে না।—দিয়ে এসো।"

নহবৎলাল পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা করিল না। জটাই-দিদির কাণে কাণে ফুস্ ফুস্ করিয়া গুটীকতক কথা বলিয়া, উৎসাহপ্রাপ্ত রাখাল-বালকটী শীঘ্রগতি দোকান হইতে বাহির হইয়া গেল। অর্দ্ধদণ্ডের মধ্যেই ফিরিয়া আসিল। বালককে প্রফুল্ল দেখিয়াই ভোগানন্দ স্থির করিলেন, কার্য্যসিদ্ধি। প্রশ্ন করিবার প্রয়োজন হইল না।—একবারেই প্রশ্ন হইল না এমন নহে, নহবৎকে প্রত্যাগত দেখিয়া, অকস্মাৎ ভোগানন্দ একটী নূতন ভাবের প্রশ্ন তুলিলেন। নহবৎকে তিনি মহা আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নহবৎ! দিয়াছ?—নহবৎ! পত্র পাইয়া তোমাদের বুনীদিদি কি করিল?"

বালক এতক্ষণ একটু একটু হাসিতেছিল,—ভোগানন্দের নূতন প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া, তাহার হাসিখুসী ফুরাইয়া গেল! বালক-বদনে আশ্চর্য্য গম্ভীরভাব আনয়ন করিয়া, স্তম্ভিতবচনে নহবৎ কহিল, "বুনীদিদি বড় মজার মেয়ে!—পত্রখানি পাইয়া, তখনি অমনি আস্তে আস্তে মোড়কটী খুলিয়া ফেলিল,—বড় বড় চক্ষু বিস্তার করিয়া পত্রের অক্ষরগুলি বেশ করিয়া দেখিল। অক্ষর চিনিল না, কিন্তু মুখের ভাবটুকু যেন একটু চিন্তাকুল হইয়া আসিল। পত্রখানির দুই পৃষ্ঠাই উলটাইয়া উলটাইয়া দেখিল।—হাসিলও না, কাঁদিলও না!—কাগজখানি একবার বুকের উপর ধরিল;—বুক হইতে তুলিয়া মাথার উপর রাখিল; মাথা হইতে নামাইয়া আঁচলে বাঁধিল;—চক্ষু ঠারিয়া,—হাত দুলাইয়া আমারে বিদায় হইতে ইঙ্গিত করিল!—সেই ইঙ্গিতের সঙ্গে আরও যেন কি একটী নূতন কথা জিজ্ঞাসা করিল, সেটী আমি ভাল করিয়া বুঝিলাম না।—অনুমান হইল, বুনীদিদি যেন জানিতে চায়, পত্রখানি দিল কে?—আমি সে প্রশ্নের কিছুই উত্তর দিলাম না।—যে ইঙ্গিত বুঝিলাম না, তাহার উত্তরই বা দিব কি?—ধাঁ করিয়া ছুটিয়া বাহির হইলাম!"

ভোগানন্দ হাস্য করিলেন।—এবারের হাস্যটী নিরবচ্ছিন্ন সুখমাখা হাস্য নহে,—আনন্দের সঙ্গে সেই হাসিতে যেন একটু একটু বিষাদ মিশাইয়া পড়িল।—দেখা হইবে না, সুতরাং মর্ম্মবেদনায় অন্য প্রশ্ন নিষ্প্রয়োজন, তথাপি অকৃত্রিম প্রেমানুরাগের স্পৃহাটী তাঁহার হৃদয়মধ্যে অদম্য হইয়া বলবতী। নয়নদুটী সজল হইল;—সজলনয়নে প্রশ্ন করিলেন, "নহবৎ!

সত্য বল,—গোপন করিও না,—সত্য বল, পত্র পাইয়া তোমার বুনীদিদি কাঁদে নাই ত?"

"আগে কাঁদে নাই, শেষে যখন নূতন রকম ইঙ্গিত জানাইল, সেই সময় দেখিলাম, বুনীদিদির চক্ষে টস্ টস্ করিয়া দুফোঁটা জল পড়িল।"

ভোগানন্দের চক্ষেও দুফোঁটা জল পড়িল।—রুমালে অশ্রুমার্জ্জন করিয়া তিনি একটী সবিষাদ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। নিশ্বাসের সঙ্গে,—নয়নাশ্রুর সঙ্গে, বালকের হস্তে আর একটী স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার!

বালক পূর্ব্ববৎ ভূলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিল। ভোগানন্দও পূর্ব্ববৎ আদর করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। ইহার পরেই আর এক কাণ্ড।—দশটী স্বর্ণমুদ্রা বাহির করিয়া ভোগানন্দ ঠাকুর আগ্রহপূর্ব্বক নহবতের হস্তে প্রদান করিলেন। সাবধান করিয়া বলিয়া দিলেন, কেহ যেন না জানে,—জটাইদিদি জানিলেন, তুমি জানিলে, আর কেহ যেন না জানে, তোমাদের বুনীদিদিকে তুমি এই যৎসামান্য উপহারটী প্রদান করিও,—খরচপত্র করিবে।—আহা!—বোবামেয়ে!—বড়ই দুঃখিনী!—দিও, কল্যই দিও,—পার যদি, আজিই দিয়ে এসো!"

বালকের খুসীর সীমা নাই!—নিজে বারংবার মোহর পাইতেছে, তাহাতে যতখানি খুসী, বুনীদিদি মোহর পাইল, এই আহ্লাদে দয়াল বালক নহবৎলাল আরো যেন পূর্ণমাত্রায় কতই খুসী!—অদ্যই দিবে কি কল্যই দিবে, সে সিদ্ধান্তটী তখন বালকের মনেই বিলুপ্ত হইয়া রহিল।

ভোগানন্দ এখন করেন কি?—দোকানে আসিয়াছেন,

দোকানেই অবস্থান করিলেন;—দ্বিতীয় দিবসের সূর্য্যোদয় না হওয়া পর্য্যন্ত জটাইদিদির মুদিখানাটী পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। রাত্রিকালেও নহবতের সঙ্গে সময়োচিত অনেক প্রকার প্রসঙ্গাধীন গল্প হইল;—জটাইদিদিও মাঝেমাঝে দুটী পাঁচটী টীকা করিলেন। নহবতের গল্পে এবং জটাইদিদির টিপ্পনীতে ভোগানন্দের কর্ণ আরও অনেকগুলি নূতন কথা শ্রবণ করিল। নূতন-পুরাতন যাহাই বলি, আগাগোড়া সমস্তই বুনীদিদির কথা।

প্রভাতে উভয়ের নিকট বিদায় লইয়া ভোগানন্দ ঠাকুর নগরযাত্রা করিলেন।—বিদায়কালে জটাইদিদির হস্তে পাঁচ থান মোহর দান করিয়া গেলেন। এধারে একটু মানসিক আনন্দ; ওধারে কিন্তু আশাভঙ্গে নিরানন্দ!—বনবালা বাঁচিয়া আছে,—বনবালা অযোধ্যাতেই আছে, বনবালা অতিনিকটেই আছে, তথাপি বনবালার সঙ্গে দেখা হইল না!—নানাখানা ভাবিতে ভাবিতে হতভাগ্য হতাশ প্রেমিক একপ্রকার ভগ্নহৃদয়েই নগরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কতদিন সেখানে অপেক্ষা করা হইল, তাহা নিশ্চয় করিয়া গণনা করিবার অবকাশ পাওয়া গেল না। তিনি শীঘ্র শীঘ্র মগধে ফিরিয়া আসিলেন, কেবল এইটুকুই জানিয়া রাখা হইল মাত্র।

এই ঘটনার পর কোথায় কি কাণ্ড হইয়াছে, বনবালা কোথায় কোথায় ভ্রমণ করিয়াছে,ভোগানন্দই বা কখন কি করিয়াছেন, সে সকল কথা এস্থলে এক্ষণে প্রকাশ করিবার সময় নাই।—যোগমায়ার বিবাহ দেখিতে হইবে।

পাঠকমহাশয়ের স্মরণ আছে, বনবালা বঙ্গদেশের হুগলী

জেলায়।—বনবালা এখন হুগলী জেলার অন্তঃপাতী হরিণপাড়ী গ্রামের ফাঁড়ীঘরে মুসলমান ফাঁড়ীদারের সম্মুখে বিদেশিনী আসামীস্বরূপে নয়নজলে ভাসিতেছে! যতক্ষণ দলীল পড়া হয় নাই, ততক্ষণ বসিবার হুকুম ছিল না, তরুণবাবু আসিয়া দলীলখানি পাঠ করিয়া দিলে পর, কাঙ্গালিনীর প্রতি ফাঁড়ী-দারের একটু দয়া হয়। ফাঁড়ী-ঘরের এক ধারে ছোট একখানি চালাঘর। সে ঘরে কখনো কখনো দুই একজন হাজতী আসামীকে নিশাকালে আটক রাখা হইত। যে রাত্রে বনবালা আসামী, সে রাত্রে সে ঘরের উপযুক্ত অন্য আসামী উপস্থিত ছিল না,—ফাঁড়ীদারের এক মোগ্‌লানী পাচিকা অকস্মাৎ কৃপাবতী হইয়া, দুঃখিনী বনবালাকে সেই চালাঘরেই লইয়া রাখিল। শয্যাসনাদি কিছুই ছিল না, ঠাঁই ঠাঁই কেবল গোটাকতক বিচালী ছড়ানো,—বনবালা সেই বিচালীর উপর শুইয়া পড়িল!—পাচিকাটীও ঐ অভাগিনীকে চৌকী দিবার নিমিত্ত একধারের বিচালীর উপর সমস্ত রাত্রি সজাগ বসিয়া রহিল।—ফাঁড়ীদার অবশ্যই কিঞ্চিৎ বেশী টাকার লোক, কিন্তু তাহার মুসলমানী পাচিকা অবশ্যই দরিদ্রঘরের স্ত্রীলোক; সেই দরিদ্র স্ত্রীলোকের ততখানি সাধুভাব বড়ই প্রশংসার কথা!—ফাঁড়ীদার সে প্রশংসার বিন্দুমাত্রেরও অধিকারী হইতে পারে না।

বনবালা বঙ্গদেশে আসিয়াছে; বনবালা গর্ভবতী;—বন-বালাকে চৌকীদারে ধরিয়াছে;—বনবালা ফাঁড়ীদারের ফাঁড়ী-ঘরে আনীতা হইয়াছে;—বনবালার আঁচলে একখানি পত্রিকা ছিল,—ফাঁড়ীদারের ভাষায় সেই পত্রিকাখানির নাম তদারকী

দলীল।—হরিণবাড়ীর তরুণবাবু কাঁচা ঘুমে উঠিয়া আসিয়া, সেই দলীলখানি পড়িয়া দিয়া গিয়াছেন।—সন্দিগ্ধ পাঠক হয় ত জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, সেই দলীলখানি কোন্ দলীল? বনবালা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবে না। আমরাই উত্তর দিতেছি। অযোধ্যায় জটাইদিদির মুদিখানায় ভোগানন্দ ঠাকুর যে দুখানি পত্রিকা প্রস্তুত করিয়া, রাখাল-বালক নহবৎলালের দ্বারা, তন্মধ্যে যেখানি বনবালার কাছে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, সেই পত্রখানিই বনবালার অঞ্চল হইতে হরিণবাড়ীর চৌকীদারের হস্তে, চৌকীদারের হস্ত হইতে ফাঁড়ীদারের হস্তে, ঘোরাফেরা করিয়া, নবাবীভাষায় ''দলীল'' হইয়াছে!

ফাঁড়ী-ঘরের রজনী সাঁ সাঁ করিয়া পোহাইয়া গেল। চালা-ঘর হইতে বনবালা পুনর্ব্বার ফাঁড়ী-ঘরে সমানীতা হইল [illegible];—জবাব নাই,—সাক্ষী নাই,—জোবানবন্দী নাই, কিছুই নাই, কেবল বিচার আছে। ফাঁড়ীদারের অনুগ্রহে অনাথিনী বনবালা এখন হরিণবাড়ীগ্রামের একটী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের গৃহে আশ্রয় প্রাপ্ত হইল।

পঞ্চম কল্প।

যোগমায়ার বিবাহ।

নবাব রামহরি এখন হুগ্‌লীতে আসিয়া, ফুলের মুখুটী রামহরি মুখোপাধ্যায় হইয়াছেন, এই আখ্যায়িকার প্রথম কল্পেই পাঠকমহাশয়কে সে পরিচয়টী ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে।

রামহরির টাকা অনেক, সুতরাং রামহরির নামের পূর্ব্বে "বাবু" বসিয়াছে। *বঙ্গদেশের রীত্যনুসারে সিরাজ উদ্দৌলার সময়েও রজতমুদ্রার প্রিয়পুত্রগণকে "বাবু" বলিয়া গৌরব করা হইত। ঈশ্বরপ্রেরিত ইংরেজের আমলে এখন যেমন "বাবু" উপাধির সদাব্রত বসিয়াছে, নবাবী আমলে এতটা বাড়াবাড়ি ছিল না। এখন হাটেবাজারেও অসংখ্য অসংখ্য "বাবু" পাওয়া যায়। "বাবুর" এখন বিশেষ বিশেষ শ্রেণীভেদ হইয়াছে। এক এক দলের এক এক প্রকার "নিজস্ব বাবু" নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইংরেজ আমলের "বাবুর ইতিহাস" এস্থলে উত্থাপন করিতে হইলে, বাবু রামহরি মুখোপাধ্যায়ের একটী শুভকর্ম্মে গোল পড়ে।—যোগমায়ার শুভবিবাহের ঘোরঘটার শুভ আয়োজনে অনেকটা বিলম্ব পড়িয়া যায়। সেই বাধাটী অতিক্রম করিবার নিমিত্ত সংক্ষেপে সংক্ষেপে গুটীকতক বাবুর নূতন শ্রেণীভেদ প্রদর্শন করিয়াই এস্থলে আমাদিগকে ক্ষান্ত হইতে হইবে। বাবু এখন অনেক প্রকার।—এক এক দলের নিজস্ব বাবু। প্রধানতঃ সাহেবের আফিসে কেরাণীগিরি হইতে সরকার-গিরি পর্য্যন্ত সমস্ত পদে যাঁহারা যাঁহারা নিযুক্ত, তাঁহারা হন সাহেবের বাবু।—"কৈ হ্যায় ?" গর্জ্জনে যাঁহারা যাঁহারা তাঁবেদার খোট্টা লোককে ঘন ঘন তলব করেন, তাঁহারা হন দরোয়ানের বাবু।—তোষাখানার বন্দোবস্তে ব্যস্ত হইয়া যাঁহারা চোঘাচাপ্‌কান, আয়না-ক্রস, এবং পোলাও-কালিয়ার ঘন ঘন তাড়না করেন, তাঁহারা হন খান্‌সামার বাবু।—তেল-নুণের শুক্তিবাদ এবং ছোটবড় তামাকের গুলের তর্ক-বিচারে যাঁহারা দণ্ডে দণ্ডে রন্ধনগৃহের অগ্নিদেবকেও সরগরম করিয়া

তুলেন, তাঁহারা হন ঝি-চাকরের বাবু।—গদি-তাকিয়ার গোলাম হইয়া যাঁহারা পারিষদমণ্ডলীর বদনে হাঁচি-টিক্‌টিকির প্রতিধ্বনি শ্রবণে দণ্ডে দণ্ডে আমোদিত হন,—ঘুমের ঘোরে, অথবা মৌতাতের দেরিতে হাই উঠিলে, যাঁহাদের জীবনের কল্যাণে চতুর্দ্দিক হইতে শত শত বজ্রতুড়ী পড়ে, তাঁহারা হন মোসাহেবের বাবু।—হাজার টাকার হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া যে সকল মরা বড়মানুষের নাবালক পীল্-ইয়ার ছেলেরা অথবা নির্ব্বংশ বৃক্ষের কলমের চারারা তিন শত টাকায় ওয়ারিণের পেয়াদার ঘুসী খান, তাঁহারা হন ইয়ারলোকের বাবু। লৌহ-রাস্তার প্ল্যাট ফরমে হনুমান সাজিয়া যাঁহারা যখন তখন ভদ্রলোকের অপমান করেন, সখের কবির সঙ্গীত-বাক্যে "পকেটে পয়সা ফেলিয়া যাঁহারা অগ্নি পগার পার," তাঁহারা হন [illegible] বাবু।—রকমারি উপ-ভবনে মদের বমী লেহন করিয়া যাঁহারা রকমারি ভুজঙ্গিনীদের ঝাঁটা-জুতা খান, তাঁহারা হন বিবি-সাহেবের বাবু।—"অধিক লিখিতে গেলে পুথি বেড়ে যায়।" এখনকার বাবুর ইতিহাস অত্যন্ত দীর্ঘ।—আমাদের ভাবগ্রাহী পাঠকগণের মধ্যে যাঁহারা 'বাবুর বাজারের" আসল খবর রাখেন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক এই গুরুতর প্রসঙ্গে আমাদের মনের কথাগুলি টানিয়া লইবেন। আর সময় নাই। নবাব রামহরির জ্যেষ্ঠা কন্যার শুভবিবাহ।—এখন আর বাজে ইতিহাসের ব্যাখ্যা করিবার সময় নয়।—দিন দিন শুভ দিনটী নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে।—নবাব রামহরি যেদিন সমন্বয় করিয়া কুলীনব্রাহ্মণ হন, তাহার পরেই তাঁহার কন্যার বিবাহের শুভসম্বন্ধ বিনির্ণয়।—সম্বন্ধ-পত্রিকায় তারিখ দেওয়া আছে।

১লা বৈশাখ।—পঞ্জিকার সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করা হইয়াছে, "অদ্য হইতে পঞ্চবিংশ দিবসে সেই সর্ব্ব-সুলক্ষণা যোগমায়ার শুভবিবাহ।"—১লা বৈশাখ হইতে পঞ্চবিংশ দিবসের নাম ২৫এ বৈশাখ।—হাতে হাতেই ২৫এ বৈশাখ।

নবাব রামহরি এখন বাবু রামহরি হইয়াছেন। নবাব উপাধিটীও পোষাকী রকমে ব্যবহৃত হয়। এখন যেমন বাবুর শ্রেণী অনেক, তখন যদিও এতটা ছিল না, তথাপি যাঁহাদের বেশী টাকা, তাঁহারা অবশ্যই বাবু হইতেন। সেই আইন অনুসারেই নবাব রামহরি এখন বাবু হইয়াছেন।—বাবুর মেয়ের বিবাহ। অবশ্যই ঘটা চাই।—তাহার উপর আবার মণিকাঞ্চন যোগ! নবাব রামহরি সেদিন সমন্বয় করিয়া জাতি পাইয়াছেন;—মুসলমান অপবাদ হইতে মুক্তি পাইয়া, একলাফে এককালে কুলীন-ব্রাহ্মণ হইয়াছেন!—এত বড় সৌভাগ্যের সময় কন্যার বিবাহে ঘটা না করিলে রামহরি-নবাবের সম্ভ্রম রক্ষা হয় কিসে?—ইহার উপর আরও একটা প্রকাণ্ড উপরোধ!—যোগমায়ার বিবাহে "ঘোরঘটায়" জাঁকজমক করাটা দলপতি মহাশয়ের সুপারিস। পাঠকমহাশয় হয় ত মনে রাখিয়াছেন, মৌলিক-কায়স্থ-প্রধান বিশ্বদুর্লভ চৌধুরী স্বনামলব্ধ গোষ্ঠিপতি;—তিনিই হরিণবাড়ীগ্রামের কুলীন-অকুলীন ব্রাহ্মণজাতির দলপতি!—তাঁহাকেই ঘুস খাওয়াইয়া, তাঁহারি অনুগ্রহে, আমাদের নবাব বাহাদুরের জাত পাওয়া!—অন্য কোন বিশিষ্ট হেতু বিদ্যমান না থাকিলেও, অন্ততঃ সেই ঘুসখোর বিশ্বদুর্লভকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্যই নবাবের কন্যার বিবাহে ঘটা করা নিতান্তই আবশ্যক! মাথার দিব্য দেওয়া ধর্ম্মব্রত!

অবশ্যই যোগমায়ার বিবাহে ঘটা হইবে।—এখনকার বিবাহ-বাজারের তুল্য তখনকার বিবাহ-বাজারে রকমারি গোরা বাজনার ধূমধাম ছিল না,—কেবল ঐটী ছাড়া, বৈবাহিক জাঁক্‌জমকের প্রায় সমস্ত অঙ্গই বিলক্ষণসহর গুল্‌জার ছিল। হিন্দুর ধর্ম্মসঙ্গত শুভকার্য্যে এবং ব্যবহারসঙ্গত পাল্-পার্ব্বণে গোরালোকের এতটা ওড়ন-পাড়ন ছিলনা। এখন যেমন গোরাতে বাজনা বাজায়, ঠাকুর বিসর্জ্জনে গোরাতে ঠাকুরের মাথায় ছাতী ধরে,—চামর ঢুলায়,—বিবাহের বরের সঙ্গে গোরারা আষা-সোঁটা বয়,—হরিসংকীর্ত্তনে নিশান ধরে, খাসগ্ল্যাস-বর্দার হয়, নবাবীআমলের লোকে এসব ব্যাপার জানিত না। এখন হয় ত দিন দিন গোরার আদর হিন্দুসমাজে আরো অধিক বাড়িয়া উঠিতে পারে। হয় ত এমনও হইতে পারে, গোরাতে লুচি [illegible]স,—অথবা গোরাতে পরিবেশন না করিলে, হিন্দুর কোন কার্য্যই আইনসিদ্ধ হইবে না! এটী কেবল বড়মানুষ-পক্ষের কথা;—গরিবের পক্ষে নয়।—সৌখীন গরিবের ইচ্ছা বটে হয়,—পয়সার টানাটানিতে হয় না!

পুরাতন কথা বলিতে বলিতে নুতন কথা বেশী বলা ভাল-নয়।—এস্থলে ওকথাটা এই পর্য্যন্তই থাকুক।—রামহরির কন্যার বিবাহের আয়োজন।—ভারি ঘটা!—২৫এ বৈশাখের আর দিন নাই।—সকলেই মহাব্যস্ত,—বাড়ীময় মহাগোল! বাহিরেও কম গণ্ডগোল নয়! যেখানে টাকা, সেই খানেই সব!—একজনকে ডাকিতে দশজন আসিয়া হাজির!—রাম-হরির কার্য্যে হরিণবাড়ীগ্রামের প্রায় সমস্ত লোক বুক দিয়া পড়িয়াছে।—জনকতক উপরপড়া লোকে মাথায় চাদর

জড়াইয়া, এদিক ওদিক হৈ হৈ করিয়া গলা ভাঙ্গিতেছে! মুরুব্বিগেঁরছের অধ্যক্ষ সাজিয়া, জনকতক লোক কোমরে গামছা বাঁধিয়া, থেলো-হুঁকোয় অনবরত, গুড়ুকতামাকের চিতা জ্বালাইতেছেন!—দলপতি বিশ্বদুর্লভ চৌধুরী প্রকাণ্ড এক ভূঁড়ী উঁচু করিয়া, মস্তকে নামাবলী জড়াইয়া, রক্তবর্ণ হরিনামের বগ্‌লীতে ঘন ঘন হরিনাম জপিতেছেন। ছোলা-খাওয়া টিয়াপাখীর রাঙা টুকটুকে ঠোঁটের ন্যায় দলপতির ঠোঁটদুখানি অনবরতই নড়িতেছে! টিয়াপাখীর ঠোঁটের ন্যায় তাঁহার ঠোঁটদুখানিও বেশ রাঙা টুক্ টুক্ টুক্!—কেন না, হরিনামের সঙ্গে তিনি অবিরত মস্‌লাদার তাম্বূল চর্ব্বণ করিতেছেন! দুই কস্ বহিয়া ছাগলকাটা রক্তধারার ন্যায় সরুমোটা পানের পিক্ গড়াইয়া পড়িতেছে! মাঝে মাঝে "এটা কর! ওটা কর!" হুকুমজারি করিয়া, বিক্রান্ত দলপতিমহাশয় যেন সর্দ্দার সিপাহীর ন্যায় বিলক্ষণ সর্‌ফরাজী দেখাইতেছেন! অপরাপর মণ্ডলের অপেক্ষা বেশী মানের খাতিরে তাঁহার হাতে একটী নারিকেলের বাঁধা হুঁকা!

এই স্থলে চৌধুরীমহাশয়ের চেহারাখানির যৎকিঞ্চিৎ বর্ণনা দেওয়া আবশ্যক।—চৌধুরীমহাশয় দীর্ঘাকার; দলপতির উপযুক্ত বিলক্ষণ লম্বা-চওড়া,—গ্রাম্য পঞ্চানন্দের উলঙ্গ ভুঁড়ীর তুল্য আড়ষ্ট ভুঁড়ী;—বুকের মাঝখানে গুচ্ছ গুচ্ছ বিস্তর চুল;—মুখখানি প্রায় চক্রাকার;—নাকে কাণেও ঝোপ্ ঝোপ্ শাদাকালো অনেক লোম;—কাণের দুপাশেও কোঁকড়া কোঁকড়া জুল্‌পীর তুল্য স্বভাবসিদ্ধ কেয়ারি;—মাথা নেড়া; নেড়ামাথার উপর পাটলবর্ণ নামাবলী;—সেই নামাবলী ভেদ

করিয়া দীর্ঘচ্ছন্দের টীকি উড়িতেছে ;—বয়স অনুমান ৬০।৬৫ বৎসর ;—এত বয়সেও স্বয়ং সর্ব্বদাই সরেজমীনে হুজুর-হাজির ;—এত বয়সেও খোকা সাজিবার সক্ আছে ;—গা আদুড় ;—অথচ, যুগল চরণে কার্ত্তিকের ন্যায় লক্কাদার জরির লপেটা ! যুগল বাহুতে শুক্লপক্ষের তৃতীয়বার ক্ষুদ্র চন্দ্রাকার দুই-খানি ইষ্টকবচ ;—কণ্ঠদেশে চর্ম্মলগ্ন তিনহালি [illegible]ল্‌শীর মালা ; পরিধান পীতাম্বর।

দলপতি চৌধুরীমহাশয় ভুঁড়ী শুদ্ধ সকলের মাথার উপর প্রায় ১৮ ইঞ্চি উঁচু। তিনি বেল্‌দারগণের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া, সকলের উপরেই সকল প্রকার জোগাড়-যন্ত্রের হুকুমজারী করিতেছেন।

দলপতির হুকুম বড় সামান্য হুকুম নহে। ঠাকুরমার গল্পের বড়বড় রাজারা আর আমাদের মুসলমান রাজত্বের বড় বড় প্রতাপশালী নবাবেরা যেমন কথায় কথায় মানুষের গর্দ্দান মারিবার হুকুম দিতেন, দলপতির হুকুম ততদূর অসীম উচ্চ না হইলেও, অনেকটা সেই ধরণেরই তেজ আইসে। যোগমায়ার বিবাহে হরিণবাড়ী গ্রামের দলপতির হুকুমে বেল্‌দারদলের গণ্ডা গণ্ডা লোক গণ্ডা গণ্ডা ফরমাইসে তাল ঠুকিয়া ছুটিয়া যাইতেছে। কেহ কেহ বাড়ীমেরামতে, কেহ কেহ নহবতে, কেহ কেহ বাইনাচে,—কেহ কেহ ময়ূরপঙ্খীতে,—কেহ কেহ সঙে, কেহ কেহ বাদ্যভাণ্ডে,—কেহ কেহ আগুণ-বাজীর আড়ম্বরে,—কেহ কেহ নিমন্ত্রণের পত্রবিলির ফর্দ্দতে,—কেহ কেহ লুচিতে,—কেহ কেহ বা অপরাপর রকমারি আমোদের কাজে, দুদিন দশদিনের জন্য দেহ-প্রাণ সমর্পণ করিয়াছে।

ঘটার আড়ম্বরের সীমাপরিসীমা নাই! নবীন গ্রীষ্মকালে নবীন মেঘাড়ম্বরে নবীন বৃষ্টিধারা পরিবর্ষিত হইলে পল্লীগ্রামের যোগাসনশায়ী মণ্ডূকমণ্ডলী যেমন মহানন্দে কোঁ-কাঁ রবে মহাকলরব জুড়িয়া দেয়, বিশ্বদুর্লভের বেল্‌দারদলের রসনাতেও প্রায় সেই প্রকার মহানন্দ-কলরব!

আয়োজনে প্রয়োজনে ১৮ ই বৈশাখ অতীত হইয়া গেল। ২৫ শে বৈশাখের আর সাত দিন মাত্র অবশিষ্ট। মহাসমারোহে যোগমায়াদেবী প্রেমানন্দে আইবুড়োভাত খাইলেন। গ্রামস্থ লোকের সওগাদে রামহরির বাড়ীতে এত কাপড় জমিয়া গেল যে, যাহারা বিবাহের কথা না জানে, হঠাৎ দেখিলে তাহারা মনে করিতে পারে, নবাব রামহরি হয় ত একজন বড়দরের কাপড়ব্যাপারী!

সাত দিন আর কদিন থাকে? - যোগমায়ার বিবাহের ঘটা দেখিতে দেখিতে সপ্তম দিবসের দিবাকর যেন আনন্দে রক্তবর্ণ হইয়াই অস্তগমন করিলেন। ধূসরবসনে অবগুণ্ঠিতা হইয়া সন্ধ্যাবধূ সমাগতা। আজ রাত্রেই নবাব-দুহিতা যোগমায়ার বিবাহ।

রামহরির বাড়ীখানি লোকারণ্য।—আলোতে আলোতে কুরখুটী!—কলরবে কলরবে যেন কুরুক্ষেত্রের রণভূমি! ঘটা করিয়া বর আসিল, ঘটা করিয়া বিবাহ হইল, ঘটা করিয়া ব্রাহ্মণভোজন হইল। ব্রাহ্মণ-শূদ্রাদি প্রায় এক সহস্র লোকের উত্তম জলপানের ব্যাপারটীও সুচারুরূপে সমাধা হইয়া গেল। তাহার পরেই বাসর।—বাঙ্গালী-পাঠক-পাঠিকারা বিবাহের বাসরঘরে রসিকতার কাণ্ডকারখানা খুব ভাল রকমই জানেন,

সে কারখানা বুঝাইবার জন্য চিরাদৃতা লজ্জাকে পরিত্যাগ করাটা আমরা ততদূর প্রয়োজন বুঝিলাম না।

শুভযামিনী সুপ্রভাত।—প্রভাতে বর-কন্যা বিদায়। দলপতি বিশ্বচুল্লভের সাগ্রহ-নির্ব্বন্ধে প্রাতঃকালে সে অনুষ্ঠানে কিছু বিলম্ব হইল। দলপতি অনুরোধ করিলেন, "আহারান্তে সন্ধ্যাকালে যাত্রা করাই ভাল। বিশেষতঃ দিনমানে বরবিদায় করিলে রামহরির টাকার বাহার কাহারও চক্ষে পড়িবে না। হাজার হাজার টাকার বাজী, হাজার হাজার টাকার আলো, হাজার হাজার টাকার খেঁউড় এবং হাজার হাজার টাকার সঙ, সমস্তই বৃথা হইয়া যাইবে! অতএব সন্ধ্যার পর যাত্রা করাই সৎপরামর্শ।—বাজী, রোস্‌নাই, রেসালা, ইত্যাদির চমৎকার খোলতা হইবে!"

দলপতির কথা কাটে কাহার সাধ্য?—শত শত লোকের বদনে সেই হুকুমের প্রতিধ্বনি,—তৎক্ষণাৎ তাহাই মঞ্জুর! সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম-সিংহ বিশ্বচুল্লভের জয়জয়কার-প্রশংসা!

আনন্দকৌতুকে, আনন্দস্থানে, আনন্দভোজে, আনন্দে আনন্দেই দিনমান কাটিয়া গেল।—সূর্য্যের কপালে তত ঘটা দর্শন করা ঘটিয়া উঠিল না,—তিনি ক্রমে ক্রমে ম্রিয়মাণ হইয়া পশ্চিমাকাশে আস্তে আস্তে অন্ধকারের কোলে লুকাইয়া গেলেন। রামহরির বাড়ীতে নানা বাদ্যভাণ্ডের মহাদুর্জ্জয় গণ্ডগোল উঠিল। বর-কনের সঙ্গে যেপ্রকার লোকেরা যাইবে, তাহারা প্রস্তুত;—যাইবার বন্দোবস্তও সমস্তই প্রস্তুত হইল। অন্তঃপুরে ঘনঘন উলুধ্বনির সঙ্গে ঘন ঘন মঙ্গলসূচক শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া বর-কনে বিদায় হইলেন।

দুঃখিনী বন-নলিনী ওরফে অনাথিনী বনবালা আপন পতির অন্বেষণে আসিয়া হুগলী জেলায় যে প্রকার বিপদে পড়িয়াছিল, একরাত্রের ঘটনার পরিচয়ে তাহার যৎকিঞ্চিৎ প্রকাশ পাইয়াছে। হরিণবাড়ীর ফাঁড়িদার একরাত্রি তাহাকে হাজতে রাখিয়া, দ্বিতীয় প্রভাতে একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের জিম্মা করিয়া দিয়াছে। সেই ব্রাহ্মণের নাম রাঘব চক্রবর্ত্তী।—সেই রাঘব চক্রবর্ত্তীর বাড়ীর নিকট দিয়াই লোকজন চলাচলের প্রকাশ্য রাস্তা।—রাস্তাটী অবশ্যই কাঁচা। বর্ষাকালে অত্যন্ত দুর্গম হয়। গ্রীষ্মকালে বিপর্য্যয় ধূলা। বৈশাখমাসে কাদা নাই, ধূলা আছে। সেই রাস্তাদিয়া বর যাইতেছে। সমারোহের বর! ব্যাপার বড় সহজ নয়! সাগরপারে সুগ্রীবের যুদ্ধযাত্রা স্মরণ করিলে রামহরির রেসালার বর্ণনা শ্রবণ করিবার প্রয়োজন হইবে না। রাস্তার দুধারি সারি সারি রকমারি লোক দাঁড়াইয়া গিয়াছে। রাঘবের ক্ষুদ্র কুটীরের ক্ষুদ্র গবাক্ষে দাঁড়াইয়া অভাগিনী বনবালা সেই মহাজনতা দর্শন করিতেছে। তক্তানামায় বর।—চারিধার খোলা। দর্শকলোকেরা নূতন বরের চেহারাখানি বেশ সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইতেছে। অন্ধকার হইলেও অন্ধকার নাই। রামহরির টাকার জোরে হরিণবাড়ীর গ্রাম্যরাস্তায় সন্ধ্যাকালে যেন সহস্র সহস্র চন্দ্র উদয় হইয়াছে। তত আলোতে নূতন বরকে ভাল করিয়া, চিনিয়া লওয়া কাহারও পক্ষে দুঃসাধ্য হইতেছে না।

লোকেরা দেখিতেছে বর;—পশুপক্ষীরা দেখিতেছে বর; গাছেরা দেখিতেছে বর;—আকাশের নক্ষত্রেরা দেখিতেছে

বর।—রাঘব চক্রবর্ত্তীর গবাক্ষপথ দিয়া বনবালা দেখিতেছে বর ;—এক দৃষ্টে চাহিয়া দেখিতেছে, দিব্য বর !

লোকের দেখা আর বনবালার দেখা, দুটী দেখাই কি এক প্রকার ?—চক্ষু এক প্রকার বটে, কিন্তু দর্শন এক প্রকার নহে। বাহ্যদর্শনে সকলেই দেখিতেছে নূতন বর ;—অন্তর্দর্শনে বনবালা দেখিতেছে, দিব্য বর !—বনবালা ভাবিতেছে দিব্য বর !—এ আবার কোন্ বর ?—বনবালার চক্ষে পুরাতন বর ! বনবালার মনের আকাশে মেঘের সঞ্চার !—বনবালার কাতরনয়নে অকস্মাৎ অশ্রুবৃষ্টি !—বৃষ্টির সঙ্গে ক্ষুদ্র ঝড় !-নাসিকায় ঘন ঘন জোর জোর দীর্ঘনিশ্বাস !—ঘন ঘন হৃৎকম্প !

বর দেখিয়া বরার্থিনী বনবালা যেন কাঁদো কাঁদো মুখে মাথায় হাত দিল !—কপাল রগ্ড়াইল !—মুখে হাত দিল !—মুখখানি শুকাইয়া গেল !

কেন এমন হইল,সে কথা কে বুঝিবে ?—কেই বা বলিবে ? বনবালা কাঁপিতে লাগিল !—বনবালা যদি কথা কহিতে পারিত,—বনবালা যদি কথা শুনিতে পাইত, তাহা হইলে তাহার শুষ্ক বদনের,—হৃদয় কম্পনের প্রকৃত হেতুটী আমরা বুঝাইয়া দিতে পারিতাম। পাঠকমহাশয় অবশ্যই জানেন, বনবালা কিছুই পারে না !—শুনিতেও পায় না,—বলিতেও পারে না,—ডাক ছাড়িয়া কাঁদিবারও শক্তি নাই !—কেবল অনবরত অশ্রুধারে ভাসিতেছে !—ভাসিতেছে আর দেখিতেছে !—অন্য লোকে বর দেখিয়া হাসে, এই দুঃখিনী বনবালা বর দেখিয়া কাঁদিতেছে ! সমস্যাটা বড় সহজ নয় !

ঘটাকরা বরেরা বিবাহযাত্রার পথে খুব ধীরি ধীরি গতি

করেন। দর্শকলোকেরা অনেকক্ষণ ধরিয়া এক মূর্ত্তি দেখিতে পায়। বনবালা অনেক ক্ষণ ধরিয়া বরমূর্ত্তি অবলোকন করিল; নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল।--যতবার দেখে, ততবার কাঁপে! কেন এই কম্প?—কেন এই শুষ্ক বদন?—কেন এই সাশ্রু-নয়ন?—কেন এ চিত্তবিকার?—বনবালা কি আর কোথাও আর কখনও এই নবীন বরমূর্ত্তি নয়নগোচর করিয়াছে?—এ সকল প্রশ্নেরই বা প্রকৃত উত্তর কে দিবে? অনুমানে একটু একটু বুঝিতে পারিলেও আমরা এখন এখানে কৌতূহলী পাঠকমহাশয়কে সে কথা বলিব না।

মহাকবি কালিদাসের বর্ণনায় আছে. রাজপথের সমা-রোহের চল্‌তি আলোরা, যতই অগ্রসর হইয়া আইসে, নিকটের অট্টালিকাগুলি উজ্জ্বল উজ্জ্বল আলো মাখিয়া, ততই যেন কতই সুখে হাসিতে থাকে! আলোকমালা অধিকদূর অগ্রসর হইয়া গেলে পশ্চাতের সেই হাসিময় অট্টালিকাগুলি যেন ঘোর বিষাদে অবসন্ন হইয়া কাঁদিতে থাকে;—নিবিড় অন্ধকারে সমা-চ্ছন্ন হইয়া পড়ে! কালিদাসের এ বর্ণনা রাজধানী লইয়া। রাজধানীর রাজপথের অবস্থার যখন এতখানি বিপর্য্যয়, জঙ্গলাকীর্ণ হরিণবাড়ী গ্রামের বরযাত্রীর অপরিষ্কার কাঁচা রাস্তার তখন যে কিরূপ দশা সম্ভবে, পরিদর্শক পাঠক অনুভবেই তাহা বুঝিবেন। গ্রাম্যপথের চল্‌তি আলোরা অচিরাৎ চলিয়া গেলে পশ্চাতের গ্রাম্যগৃহ ও গ্রাম্যতরুগুলি অচিরাৎ ঘোর অন্ধকারে ঢাকা পড়িয়া যাইবে, ইহা আর বিচিত্র কথা কি?

বর চলিয়া গেল,—কন্যা চলিয়া গেল,—বরযাত্র, কন্যা-যাত্র, বাদ্যকর, আলো-বরদার, নিশান-বরদার, সমস্তই চলিয়া

গেল, রাঘব চক্রবর্ত্তীর কুটীরসমীপস্থ ক্ষণপূর্ব্বের জনাকীর্ণ আলোকাকীর্ণ ক্ষুদ্র রাস্তাটী ঘোর অন্ধকারে ঢাকা পড়িয়া গেল!—বনবালার হৃদয়ও যেন ঘোর অন্ধকারময় হইল!

ষষ্ঠ কল্প।

কোথা যাও?

আবার হরিণবাড়ীতে বিলম্ব হইল। নবাব রামহরির কন্যার বিবাহের বরবিদায়ের রজনীপ্রভাতে গ্রামে আর একটা ফঁ্যাসাত! দরিদ্র বৃদ্ধ রাঘব চক্রবর্ত্তী আপনার ঘরের সম্মুখের রাস্তার ধারে মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছেন!—বনবালাকে পাওয়া যাইতেছে না!—চক্রবর্ত্তী নিত্য নিত্য উষাকালে গঙ্গাস্নানে যান,—বনবালাকে জাগাইয়া দিয়া যান।—আজ ভোরে জাগাইতে গেলেন, বনবালা ঘরে নাই।—কখন কোথায় উঠিয়া গিয়াছে, বুঝিতে পারিলেন না; নাম ধরিয়া আহ্বান করা বৃথা,—অবোলা জন্তুর অন্বেষণের ন্যায় এদিক্ ওদিক্ অন্বেষণ করিলেন, পাইলেন না। গঙ্গাস্নান বন্ধ হইল!

প্রভাত হইয়া গেল। বনবালা ঘরে আসিল না!—পথে পথে অন্বেষণ করা হইল, পাওয়া গেল না!—আরো অনুসন্ধান বাড়িল, সমস্তই বিফল! বনবালা কোথাও নাই!—সেঅঞ্চলেই নাই!—একবারেই গ্রামছাড়া!

এ ঘটনা বড়ই আশ্চর্য্য!—বনবালা গেল কোথায়! রাঘব চক্রবর্ত্তী তাহা কিছুতেই জানিতে পারিলেন না। বনবালা বরযাত্রের যাত্রিদলের সঙ্গিনী হইয়াছে!—কেন হইয়াছে, বনবালাই জানে।—সন্ধ্যাকাল হইতেই বনবালা যেন পাগলিনী!—বরযাত্রার ভিতর কি দেখিয়াছে, কি ভাবিয়াছে, কি বুঝিয়াছে, কে জানে! কাহাকেও কিছু জানায় নাই; শুধু শুধু পাগলিনী হইয়া ঘরের বাহির হইয়াছে!—একটু গা ঢাকা অন্ধকার হইলেই বরযাত্রার পাছু পাছু চলিয়া গিয়াছে! অন্ধকারে, মলিন বসনে, চুপি চুপি গুঁড়ি মারিয়া, রাস্তার একটী ধার ঘেঁসিয়া, সঙ্গিদলের সঙ্গ লইয়াছে!—আহা! একটী প্রাণীও তাহাকে জিজ্ঞাসা করে নাই, "কোথায় যাও?"

আমরা এখন জিজ্ঞাসা করিতে পারি, বনবালা! কোথায় যাও?—বনবালা উত্তর দিবে না;—উত্তর দিতে পারিবে না।—বরযাত্রের সঙ্গে সঙ্গেই বনবালা চলিবে!—কতদূর চলিবে, তাহা এখন ঠিক করিয়া বলা যায় না।

পাটনায় যাইয়া বরযাত্রের গতি থামিল।—বনবালাও পাটনা পর্য্যন্ত গিয়াছে।—পাটনাতেই রামহরির জামাই-বাড়ী। বরেরা নিজ নিকেতনে প্রবেশ করিলেন;—রেসালা ভঙ্গ হইয়া গেল; বন্ধুলোকেরা স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন। বনবালা কোথায় গেল, তাহা আর শীঘ্র জানা গেল না। সেখানেও কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল না, "কোথায় যাও?"

এখন আবার অন্য কথা পড়িতেছে। হুগ্‌লীতে নূতন রামহরি মুখোপাধ্যায়ের কন্যার বিবাহ হইল,—বরটী হইল পাটলিপুত্র-নিবাসী।—এরূপ যোগাযোগটী কি প্রকারে সংঘটিত

হইল ?—বঙ্গদেশের হিন্দুর পুত্রকন্যার বিবাহ বঙ্গদেশেই হয়, বেহারে হইল কেন, এটী একটী অক্ষুদ্র সামাজিক তর্ক। বরটী বঙ্গবাসী কি না, তাহাও ইতিপূর্ব্বে জানা হয় নাই।—নাম কি, কাহার পুত্র, বিবাহস্থলে তাহাও অপ্রকাশ! এ প্রকার অপ্রকাশে পাঠকের মনে একটু একটু সংশয় থাকিয়া যাইতে পারে। কতক পরিমাণে সে সংশয়টী ভঞ্জন করিয়া রাখা উচিত।

নবাব রামহরি মুখোপাধ্যায় হুগলী জেলার নূতন অধিবাসী। তিনি যথার্থই ব্রাহ্মণ হউন অথবা টাকার জোরেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ হউক, হরিণবাড়ীর পরিচয়ে এখন তিনি অবশ্যই কুলীনব্রাহ্মণ। তাঁহার কন্যাকে যিনি বিবাহ করিলেন, তিনি অবশ্যই ব্রাহ্মণের সন্তান, সে পক্ষেও হয় ত সন্দেহ নাই। গলদেশে যজ্ঞসূত্র আছে, সে লক্ষণেও ব্রাহ্মণত্বের অপলাপ করিবার সম্ভাবনা অল্প। তবে এস্থলে তর্ক এই যে, নবাব রামহরি প্রকৃতপক্ষে বঙ্গবাসী ব্রাহ্মণ কি না, নূতন জামাইটীও প্রকৃতপক্ষে বঙ্গবাসী ব্রাহ্মণবংশের বংশধর কি না, এ তর্কের পরিষ্কার মীমাংসা এখন হইবে না।

বরের নাম দ্বারকাদাস গাঙ্গুলী,—দেখিতেও পরম রূপবান, বয়ঃক্রমও বোধ হয়, পঞ্চবিংশতির অধিক হইবে না। যোগমায়াকে বিবাহ করিবার পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে দ্বারকাদাসের আর একবার বিবাহ হইয়াছে। শাস্ত্রমতে 'প্রথমা পত্নীই ধর্ম্মপত্নী। দ্বারকাদাসের ধর্ম্মপত্নীটী এখন প্রায় সপ্তদশবর্ষীয়া। সেটীও এই পাটলিপুত্রে বাস করিতেছেন। পুত্রবতী হন নাই, কিন্তু পতির অত্যন্ত ভালবাসা। ধর্ম্মপত্নীর নাম ভবরঞ্জিকা। লোকালয়ে প্রচার যে, ভবরঞ্জিকা যেমন রূপবতী, তদ্রূপ বুদ্ধিমতী।

দয়ামমতা বেশ আছে। গরিবের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট দয়া। যাহারা জানে, তাহারা সকলেই ভবরঞ্জিকার দয়াগুণের ভূরি ভূরি প্রশংসা করে। ভবরঞ্জিকার পতিভক্তিও বিলক্ষণ তেজস্বিনী।

বঙ্গদেশে স্ত্রীলোকের ষোড়শবর্ষ অতিক্রান্ত হইলেই প্রায় সন্তান জন্মিবার আশা যায়! অনেক প্রাচীনা গৃহিণীরা সে পক্ষে যেমন এক প্রকার হতাশ হন, পাটলিপুত্রেও দ্বারকাদাসের পত্নীর সম্বন্ধে সেইরূপ ঘটনা হইয়াছে। ভবরঞ্জিকা সপ্তদশবর্ষ অতিক্রম করেন, সন্তান হইল না, এই হেতুবাদে দ্বারকাদাসের দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ। ভালবাসা পতির দ্বিতীয় ভালবাসা আসিল, অবিভক্ত ভালবাসাটী বিভক্ত হইয়া গেল, অক্ষুণ্ণ ভাল বাসার উপর ক্ষুণ্ণকারিণী সপত্নী জুটিল, ভাবিতে গেলে বিলক্ষণ অশান্তি, কিন্তু শান্তিময়ী ভবরঞ্জিকার হৃদয়ে বিন্দুমাত্র হিংসা আসিল না। নবীনা সপত্নীটী প্রায় পঞ্চদশবর্ষের ক্রোড়-বাসিনী। স্বামীর আদরিণী করিয়া তুলিবার বাসনায় ভবরঞ্জিকা তাহাকে ভালভাল বেশভূষায় সাজাইয়া, পুষ্পময় শয়নগৃহে শোয়াইয়া রাখেন। সতীন বলিয়া ঘৃণাবশে পতির কাছে আপনার মান আপনি বড়াইবার ভাণ করেন না। যুগল সপত্নীতে দিব্য সদ্ভাব।

যোগমায়ার কপাল ভাল।—সতীনের কাছে আদর পাইয়া পতিসোহাগিনী হওয়া কম কপালের জোর নহে। যোগমায়া তাহা হইয়াছেন। অনূঢ়াবস্থায় হস্তরেখা দর্শন করিয়া গণকঠাকুরেরা যোগমায়ার পিতাকে বলিয়া গিয়াছেন, "এ মেয়ে বড় সামান্য মেয়ে নয়; এ মেয়ে রাজরাণী হবে!" গণকের বাক্যই বুঝি তবে সত্যই বা হয়! বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই প্রচুর ভালবাসা!

দ্বারকাদাসের পিতা জীবিত আছেন, কিন্তু তিনি পাটলি-পুত্রে বাস করেন না। তাঁহার জমিদারী আছে, তেজারতি আছে, সময়ে সময়ে এক একটা মামলা-মোকদ্দমায় মুরুব্বি হওয়া অভ্যাস থাকাতে, তাহাতেও বিলক্ষণ দশটাকা লাভ আছে। সে লাভকে উপরি রোজগার বলে। নবাব রামহরির জমিদার বৈবাহিকটী একজন মস্ত ধনীলোক। দ্বারকাদাস তাঁহার একমাত্র সন্তান। পাটলিপুত্রে প্রকাশ পাইয়াছে যে, পিতাপুত্রে বনিবনাও হয় না; সেই কারণে পিতা আছেন পৈতৃক ভদ্রাসনে, পুত্র আছেন পাটলিপুত্রে।—পিতার পৈতৃক ভদ্রাসন কোথায়, সে পরিচয় পরে হইবে।

বিবাহের পর দুই মাস অতীত। বিবাহের সময় দ্বারকা দাসের কয়েকটী বন্ধু আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে এক জন এই দুই মাসকাল পাটলিপুত্র পরিত্যাগ করেন নাই। অকস্মাৎ সেই বন্ধুর বাসগ্রাম হইতে সংবাদ আসিল, তাঁহার এক মহা-বিপদ উপস্থিত!—সে বিপদে সর্ব্বস্বান্ত হইবার সমূহ সম্ভাবনা! অল্প আয়াসে পরিত্রাণলাভের প্রত্যাশাও বড় কম! সুতরাং অবিলম্বে তাঁহার দেশে যাওয়া প্রয়োজন। ধনবান বন্ধু দ্বারকাদাসকেও সঙ্গে লওয়া প্রয়োজন। দ্বারকাদাস একান্ত বন্ধুবৎসল ছিলেন;—অনুরোধমাত্রই সঙ্গে যাইতে সম্মত হই-লেন। বন্ধুর নিবাস বঙ্গদেশে।—বিপদুদ্ধারে যাত্রা করিবার দিনস্থির হইল, দুই বন্ধুতে বঙ্গদেশে যাত্রা করিলেন।

অনাথিনী পাগলিনী অবলা যখন হরিণবাড়ী গ্রাম হইতে নিশাকালে গুপ্তভাবে পলায়ন করে, তখন কেহই জিজ্ঞাসা করে নাই, "কোথায় যাও?"—হতাশের অনুবর্ত্তিনী হইয়া

পাগলিনী যখন পাটলিপুত্রে প্রবেশ করে,—বরের অনুযাত্রী দল হইতে বনবালা যখন চুপি চুপি অন্যদিকে সরিয়া যায়, তখনও কেহ জিজ্ঞাসা করে নাই, "কোথায় যাও?"

স্ত্রীলোক বলিয়া হয় ত ঐ প্রশ্ন উত্থাপিত হয় নাই।—কিন্তু ইহাঁরা ত পুরুষ;—বর এবং বরের বন্ধু, ইহাঁরা ত পুরুষ; ইহাঁরা যখন বঙ্গদেশে যাত্রা করিলেন, তখনও ইহাঁদিগকেও কেহ জিজ্ঞাসা করিল না, "কোথায় যাও?"

বন্ধুর বিপদ;—বন্ধুর সর্ব্বনাশ উপস্থিত;—দায়ে পড়িয়াই দ্বারকাদাসের বঙ্গদেশ যাত্রা। বন্ধুর নিবাস বঙ্গদেশের কোন্ স্থানে, তাহা এখন প্রকাশ হইল না। বন্ধুটী ব্রাহ্মণ, তাহা প্রকাশ হইল,—একটী নামও প্রকাশ পাইল, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে সংশয় ঘুচিল না। দ্বারকাদাসের বন্ধুর নাম জটাধর। তাঁহার পিতা বর্ত্তমান। পিতা বৃদ্ধ। ধনবান নহেন, মধ্যবিধ গৃহস্থ। তাঁহার উপর তাঁহার বাসগ্রামের ধনবান প্রবল লোকদিগের বিলক্ষণ প্রভুত্ব খাটে;—বেশ জুলুম চলে!

মুসলমানের কন্যার বিবাহে জটাধর বরযাত্র গিয়াছিলেন, মুসলমানের বাটীতে আহার করিয়াছেন, যাহাদের বাটীতে মুসলমানের কন্যা পরিগৃহীতা হইয়াছে, মুসলমানের কন্যা যাহাদের বাটীতে বধূ হইয়াছে, তাহাদের বাটীতেও জটাধর অন্নগ্রহণ করিয়াছেন, জটাধরের বাসস্থানে এসংবাদ পৌঁছিতে বিলম্ব হয় নাই। গ্রামের দলাদলীপ্রিয় প্রবলপরাক্রান্ত আণ্ডিলমহাশয়েরা ও পণ্ডিতমহাশয়েরা ঐ সূত্র ধরিয়া জটাধরের বৃদ্ধ পিতাকে জাতিচ্যুত করিয়াছেন!—ধোবা-নাপিত বন্ধ হইয়াছে!—গুরুপুরোহিতেরাও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন!

সমাজে আর সেই অভাগা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কিছুমাত্র মুখ নাই! জটাধর তাঁহার একমাত্র পুত্র। টাকাদারেরা প্রথমে বলিয়াছিলেন, জটাধরকে ত্যাগ করিয়া যদি তিনি প্রায়শ্চিত্ত করেন, তাহা হইলে সমাজ তাঁহাকে কোনপ্রকারে চালাইয়া লইতে পারিবেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁহাদের হুকুম অনুসারে নিরপরাধী সর্ব্বগুণসম্পন্ন পিতৃবৎসল পুত্রকে পরিত্যাগ করিবার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারেন নাই। এই গুরুতর অপরাধে জাতির কর্ত্তারা তাঁহাকে জাত্যন্তর করিয়াছেন!!!

কেবল জাত্যন্তর হইয়াই গরিব ব্রাহ্মণটী পরিত্রাণ পান নাই!—ফাঁসাত বাধিয়াছে!—মহা ফাঁসাত!—দুর্ব্বলকে অশেষ বিশেষে জব্দ করিবার সহজ সহজ উপায় সমস্তই প্রবলদিগের হস্তগত!—কঠিন উপায় অবলম্বন করিতে হইলে প্রবলেরা উশৃঙ্খল রাজ্যের আদালতের সাহায্য পান!—যে সময়ের কথা, সে সময় বঙ্গদেশ প্রায় অরাজক!—নবাব সিরাজউদ্দৌলার চরম কাল। সেসময় ন্যায়ান্যায় বিচারের কিছুমাত্র বিচার ছিল না!—জাত্যন্তরকর্ত্তারা মহাদম্ভে দেওয়ানী ফৌজদারী উভয়প্রকার ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর মিথ্যা অভিযোগে গরিব জটাধরের বৃদ্ধ পিতাকে আষ্টে পৃষ্ঠে বিলক্ষণরূপে জড়াইয়া ফেলিয়াছেন!—প্রবল পক্ষের মিথ্যা নালিসের মহাবেষ্টনটা কালরূপী কালভুজঙ্গের বেষ্টন অপেক্ষাও ভয়ানক শক্ত বেষ্টন!—সে বিপদে রক্ষাকর্ত্তা কেবল একমাত্র ভগবান।—সেই বিপদের বার্ত্তা পাইয়াই জটাধর আপন হিতকারী বন্ধু দ্বারকাদাসকে সঙ্গে লইয়া পাটলিপুত্র হইতে শীঘ্র শীঘ্র বঙ্গদেশে আসিতেছেন।

গরিবের পক্ষে সদয় হইয়া গরিবের অনুকূলে দুটীকথা একত্র

করিয়া বলেন, দেশে এখন তেমন লোক বড় বেশী নাই। গরিবের বিপদে সহানুভূতি দেখাইতে ইচ্ছাপূর্ব্বক অগ্রসর হন, তেমন মহাত্মা আজকাল এ দেশে বড়ই কম। গরিব জটাধর আপনাদের সর্ব্বনাশ দেখিতে বিদেশী বন্ধুর সঙ্গে তাড়াতাড়ি স্বদেশে আসিতেছেন, কেহই কোন দিক হইতে একবারও জিজ্ঞাসা করিল না, "কোথায় যাও?"

সপ্তম কল্প।

কালের কথা।

কালের কথা মনে পড়িলেই একাল-সেকাল মনে পড়ে। সেকাল কাহাকে বলে, সকলে একবাক্য হইয়া সেকালের সমান মীমাংসা করিতে পারা যায় না। মনু হইতে মানবসৃষ্টি, এটীও সেকাল,—কেরাণী লর্ড ক্লাইবসাহেবের দ্বারা যেদিন পলাসীর যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলার নাম লোপ, সেটীও সেকাল। এখন আমরা একালের লোক বলিলেই সাধারণতঃ এদেশের অধিক লোকে ইংরাজ-আমলের কথাই বুঝিয়া লন। বুঝিয়া লওয়াও নিতান্ত অবিবেচনার কার্য্য নহে। বাস্তবিক তাহাই হয় ত আমাদের অভিপ্রেত। তাহার মধ্যেও কালভেদ কর যাইতে পারে;—করাও কর্ত্তব্য। বোধ করুন, ইংরাজ যখ প্রথমতঃ বঙ্গের দেওয়ানী ক্ষমতা প্রাপ্ত হন, তখন বাঙ্গালী

মেজাজ একপ্রকার ছিল;—বাঙ্গালীর উপাসনা করিয়াই, বাঙ্গালীর সাহায্য লইয়াই, লর্ড ক্লাইব পলাসীক্ষেত্রে রণবিজয়ী হইয়াছিলেন;—বাঙ্গালীর উপাসনা করিয়াই, বাঙ্গালীর সাহায্য লইয়াই, নূতন ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী এদেশের প্রথম শাসন-কার্য্য পরিচালন করিতেন,—বাঙ্গালীর ধর্ম্মশাস্ত্রকে বিচারস্থলে প্রধান নজীরস্বরূপ গ্রহণ করিয়া, প্রথম ইংরাজী আদালতে বাঙ্গালীর দেওয়ানী ফৌজদারী উভয় বিষয়ের বিচার হইত। অনেক দিন ধরিয়াই ঐ নিয়ম চলিয়া আইসে। অতিকম পঞ্চাশ বৎসর পরে কোন কোন বিষয়ে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ হয়। তখনও বাঙ্গালীর মেজাজ অন্য প্রকার ছিল। কেবল মেজাজমাত্র নহে, বাঙ্গালীর ধর্ম্ম, বাঙ্গালীর সমাজ, বাঙ্গালীর আচার, বাঙ্গালীর দান, বাঙ্গালীর শিক্ষা, বাঙ্গালীর ব্যবসা, বাঙ্গালীর চাকরী, বাঙ্গালীর জীবিকা এবং বাঙ্গালীর বেশভূষা, সমস্তই কোন না কোন প্রকারে বাঙ্গালীরই স্বস্ব আয়ত্তাধীন ছিল। এখন তাহার কতখানি বিপর্য্যয়!—ওঃ! আজকাল ইংরাজের বিচারালয়ে বাঙ্গালীর দায়ভাগ পর্য্যন্ত উলটাইয়া যাইতেছে !!!

এখন আমরা দেড়শত বৎসর পূর্ব্বের ঘটনাকেও সেকালের কথা বলিতে পারি, শতবর্ষ পূর্ব্বের ঘটনাকেও সেকালের কথা বলিতে পারি, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের ঘটনাকেও সেকালের কথা বলিতে পারি। বেশী আক্ষেপের কথা কি, ইংরাজীশিক্ষিত বঙ্গীয় যুবকেরা যাহা আজকাল আমাদিগকে দেখাইতেছেন, তাহাতে আমরা বিংশতি বৎসর পূর্ব্বের,—দশবৎসর পূর্ব্বের, অথবা একবৎসর পূর্ব্বের ঘটনাকেও সেকাল বলিয়া গণনা

করিলে লোকে আমাদিগকে নিতান্ত দোষী বলিতে পারিবেন না। খুব ছোটি করিয়া যদি বলি, তাহা হইলেত আমাদের দেশে এখন দিন দিন একালসেকাল মূর্ত্তিমান!

অত ছোট হইবার প্রয়োজন নাই।—ইংরাজ-আমলের গোড়ার কথা,—মাঝের কথা,—কোন কোন স্থলে লর্ড ক্যানিং বাহাদুরের পরের কথাই সেকাল বলিয়া ধরা যাউক। সব কথা ধরিতে গেলে এই আখ্যায়িকাখানি আমাদের অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারত অপেক্ষাও বৃহৎ হইবার সম্ভাবনা। ততদূর বাড়া-বাড়িতে কাজ নাই। আমরা হিন্দু, আমরা হিন্দুসমাজের চিরভক্ত,—আমরা হিন্দুসমাজের চিরকিঙ্কর,—সমাজের উপরেই আমাদের পাপপুণ্য,—সুখদুঃখ, সমস্তই নির্ভর করিতেছে। অতএব সমাজ আমাদের উপাস্য, সমাজ আমাদের আরাধ্য এবং সমাজই আমাদের মূল লক্ষ্য।

পাটলিপুত্রনিবাসী নূতন বর দ্বারকাদাস তাঁহার বঙ্গবাসী বন্ধুর সর্ব্বনাশকর মহাবিপদ উদ্ধার করিবার মানসে বঙ্গদেশে যাত্রা করিয়াছেন। আভাস পাওয়া হইয়াছে, বিপদটী পবিত্র আর্য্যসমাজের আচারঘটিত। একালে এই সামাজিক আচারে আচারনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের যেপ্রকার স্বাধীনভাব জন্মিতেছে, সেকালে এমন ছিল না। একালের স্বাধীনভাবকে আমরা জোর করিয়া স্বেচ্ছাচার বলিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। সেকালে বড় বড় সামাজিক তর্কে সামাজিক, প্রধান প্রধান লোকের মতামত প্রায় সর্ব্বাংশেই চূড়ান্ত হইত, একালে তাহার কি আছে? ছোট ছোট কথার ত কথাই নাই, হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রসম্মত পবিত্র পরিণয়বন্ধনের ন্যায় মহাগুরুতর ব্যাপারে একালের নির্লজ্জ

হিন্দুসন্তানেরা নিতান্ত দীনের ন্যায় কৃতাঞ্জলিপুটে ইংরাজী আইন প্রার্থনা করিতেছেন !!! ইংরাজের যাহা যাহা ভাল, তাহা গ্রহণ কর, কোন আপত্তি নাই ;—দোষগুণ বিচারে এককালে অন্ধ হইয়া কেবল অনবরত অনুকরণে উন্মত্ত হওয়াটা বড়দোষ। ইংরাজের বিবাহকে অনেকেই এখন বিবাহ বলিয়া মান্য করিতে নারাজ। অনেকেই বলেন, প্রধানতঃ উহা একপ্রকার কণ্ট্রাক্ট মাত্র। মৌরাসী কণ্ট্রাক্টও নহে,—ঠিকা কণ্ট্রাক্ট !—বিবাহের কথায় যখন চুক্তিভঙ্গের নালিস চলে,—স্ত্রীপুরুষের মধ্যে যে কেহ ইচ্ছা করিলেই যখন বিবাহভঙ্গের দাবী চালাইতে স্বাধীনতা পান, ইংরাজের ধর্ম্মাধিকরণ যখন সেই দাবীর ইচ্ছামত ডিক্রীডিস্‌মিসের ক্ষমতা রাখেন, তখন সেপ্রকার ক্ষণভঙ্গুর বিবাহকে বিবাহ বলিয়া স্বীকার করিতেও লজ্জা হয় !

সর্ব্বাগ্রে বিবাহের কথাই ধরা হইল। কেন না, আমাদের এই আখ্যায়িকার নায়িকা যোগমায়ার বিবাহ লইয়াই যখন স্থানে স্থানে গণ্ডগোল, তখন বিবাহের কথাটীই অগ্রে স্মরণ করিয়া রাখা দরকার। যোগমায়ার পিতার নামের পূর্ব্বে উপাধি আছে নবাব।—সেই নবাব-কথাটী লইয়াই মূল গণ্ড-গোল। দ্বারকাদাসের বন্ধু জটাধর মুসলমানের কন্যার বিবাহে বরযাত্র গিয়াছিলেন বলিয়াই, দেশে তাঁহার বৃদ্ধ পিতা মুসলমান অপবাদে জাত্যন্তর হইয়াছেন! গ্রামের দলপতিমহাশয়েরাই জাত্যন্তর করিয়াছেন !—ধর্ম্মশাস্ত্রের শাসন অথবা ন্যায়পরায়ণ সমাজশাসন শাস্ত্রকুশল মহোপাধ্যায়গণের অভিমতি, কিছুই মান্য করা হয় নাই! জটাধরের পিতা পল্লীগ্রামনিবাসী একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ। তাঁহার সম্বন্ধে ধর্ম্মশাসন অথবা

সমাজশাসন, কিছুই আবশ্যক করে না, প্রবলপরাক্রান্ত দলপতি মহাশয়েরা হয় ত প্রবলপরাক্রমের ক্ষমতায় এইটীই মনে মনে সিদ্ধান্ত করিয়া থাকিবেন!—সিদ্ধান্তটী যে কতদূর বলবৎ, তাহা তাঁহাদের চিন্তা করিবার অবকাশ নাই। একালের দলপতি-মহাশয়দের ঐ গুণটী বেশ আছে! অভাগা বঙ্গে এখন সামাজিক একতা নাই, এই জন্য কেহ কেহ অধুনা মুখে মুখে অথবা কলমে কাগজে কতপ্রকার আক্ষেপ করিয়া থাকেন! কিন্তু কাজের সময় তাঁহারাই আবার লুক্কায়িত হন! বঙ্গের পল্লীপ্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম্য দলপতিমহাশয়েরা দরিদ্র, নির্দ্দোষ, দুর্ব্বল, সামাজিক লোককে যখন সজোরে জাতিচ্যুত করিয়া একঘরে করেন, তখন তাঁহাদের অনুগত লোকেরা সামাজিক একতাটী বেশ দেখায়!—দলপতির অনুকূলে ইংরাজের আদালতে হলফ্ করিয়া মিথ্যাসাক্ষ্য দিবার সময়েও ধামাধরা ভদ্রসন্তানেরা সামাজিক একতাটী বেশ দেখায়!—তবে আমরা কেন বলি, সামাজিক একতা নাই?—আছে।—কিন্তু যে একতা আমরা চাই,—যে একতার নিমিত্ত পবিত্র আর্য্যসমাজ কাঁদিয়া কাঁদিয়া লালায়িত, সেই পবিত্র একতার বদলে এক জঘন্য প্রকারের সৃষ্টিনাশিনী "রাক্ষসী একতা" স্থানে স্থানে বিদ্যমান আছে! তাহা আমরা চাই না!—তাহা আমাদের দর্শনীয়ও নয়! তাহার ত্রিসীমা স্পর্শ করিতেও আমাদের ভয় হয়!

দেশ পরাধীন হইয়াছে। ভারতরাজত্ব ইংরাজের হস্তে অর্পিত হইয়াছে। ভারতসন্তানেরা ইংরাজের গোলামী শিখিবার নিমিত্ত ইংরাজের দ্বারে দ্বারে উমেদারী করিয়া ফিরিতেছেন! অথচ বাক্য আছে, ইংরাজপণ্ডিতমহোদয়গণের প্রসাদে আমরা

স্বাধীনভাবের পূজা করিতে শিখিতেছি! এই যে স্বাধীন ভাবটী, ইহা একালে যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালকবালিকার খেলিবার সামগ্রী হইয়া উঠিতেছে! ইংরাজ বলেন, "ভারত অসভ্য, ভারত অশিক্ষিত, ভারত গরিব!"—ভারতসন্তান সেই বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া বলেন, "তাই! তাই!! তাই!!!" এ ব্যাধির ঔষধ আমরা খুঁজিয়া পাই না! অজ্ঞ অজ্ঞ ইংরাজমহাশয়েরা অজ্ঞ সমাজে দর্প করিয়া বলেন, "বাঙ্গালার সমস্ত লোক মিথ্যাবাদী;—বাঙ্গালার সমস্ত লোক জুয়াচোর!"—লর্ড মেকলে স্পষ্টাক্ষরে বাঙ্গালীগণকে প্রতারক বলিয়া পুস্তক রচনা করিয়াছেন। আমাদের শিক্ষাবিভাগের দয়াল প্রভুগণ মেকলের সেই পুস্তকখানিকে বাঙ্গালীসন্তানের পাঠ্যপুস্তকমধ্যে নির্ব্বাচন করিয়া দিয়াছেন!!! মেকলের পুস্তকের এক স্থানে লেখা আছে, বড় শক্তকথা!—ইংরাজী আবশ্যক নাই,—অনুবাদেই বুঝাইব। মেকলে বলিয়াছেন, "ব্যাঘ্রের যেমন নখর, মহিষের যেমন শৃঙ্গ, ভীমরুলের যেমন হুল, বাঙ্গালীর স্বভাবসিদ্ধ অস্ত্র তেমনি প্রতারণা!"—উঃ! কি দুর্ব্বিষহ স্পর্দ্ধার কথা! একথার প্রতিবাদ করিতে পারেন, এমন সাহসী লোক বঙ্গদেশে এখন একজনও নাই, ইহাই আরও অসহনীয় মর্ম্মান্তিক কথা!—কোন কোন বিচারক আজিও বিচারাসনে বসিয়া বাঙ্গালীজাতিকে অবাধে মনের সাধে গালাগালি দেন! কলিকাতা সুপ্রিম্ কোর্টে সার মর্ডান্ট ওয়েল্‌স্ নামধারী একজন মহাত্মা যখন জজীয়াতি করিতে আসিয়াছিলেন, মহারাণীর বেঞ্চের উপর চারি হাতপা তুলিয়া তখন তিনি আরক্তবদনে মহাআস্ফালনে চীৎকার করিয়া বলিতেন, "বাঙ্গালার সমস্ত লোক মিথ্যাবাদী

এবং সমস্ত লোক জালিয়াৎ!”—বাজে লোকের কথা ধরিতে নাই, যাঁহারা বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক প্রস্তুত করেন, যাঁহারা ধর্ম্মাধিকরণে ধর্ম্মশপথে ধর্ম্মস্বরূপ উপবেশন করিয়া, ধর্ম্মানুসারে প্রজামণ্ডলীকে বিচারবিতরণব্রতে ব্রতী, তাঁহাদের মুখেই যখন ঐ সব কথা, তখন আর বঙ্গবাসীর পদার্থমাত্র কি আছে? বাঙ্গালীর মানসম্ভ্রম অথবা কিছুমাত্র সতেজ সারবত্তাই বা কোথায় থাকিতেছে?

ইংরাজের কাছে ত বাঙ্গালীজাতির এই পর্য্যন্ত মান! অথচ এদিকে অধিকাংশ বঙ্গসন্তান ইংরাজের একটু পদধূলির নিমিত্ত কাঙ্গালী! বিলাতের যাহা কিছু, সমস্তই ভাল; এদেশের যাহা কিছু, সমস্তই মন্দ, ইহাই একালের অনেক বঙ্গসন্তানের হৃদয়গত দৃঢ় সংস্কার!

আমরা ভাবিয়াছি, কালের কথা বলিব। কালের কথায় প্রধান ধূয়াই একাল আর সেকাল। অনেকের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়, দেশের অবনতি হইয়াছিল, ইংরাজের প্রসাদে উন্নতি আসিতেছে। ইংরাজেরাও বলেন, তাঁহারা ঈশ্বর প্রেরিত;—ঈশ্বর তাহাদিগকে ভারতের মঙ্গলের নিমিত্তই ভারতে প্রেরণ করিয়াছেন। যখন ঈশ্বরকে লইয়া কথা, তখন অবশ্যই বুঝিতে হইবে, ভারতে উন্নতি আসিতেছে। প্রধান উন্নতি, সংস্কৃতভূমিতে ইংরাজী শিক্ষা। এই উন্নতি যাঁহারা অস্বীকার করিতে সাহস করেন, তাঁহারা মূর্খ, তাঁহারা বর্ব্বর, তাঁহারা গাধা!

ইংরাজীশিক্ষার অনেক গুণ! একে ত ইংরাজজাতি স্বাধীন, তাঁহাদের বাসস্থান ঐতিহাসিক রাজতন্ত্র হইলেও কার্য্যতঃ

সাধারণতন্ত্র। দেশের ভালমন্দ বিচারে বিলাতের সমস্ত লোকের স্বাধীনতা আছে। ইংরাজজাতি স্বাধীন। সেই স্বাধীনতার উপর উচ্চ সাহস, অসাধারণ অধ্যবসায়, প্রশংসনীয় দেশানুরাগ, ঐশ্বর্য্যলক্ষ্মীর প্রসাদকামনায় অসাধারণ বাণিজ্যপ্রিয়তা, আদরনীয় স্বজাতিপ্রেম, সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতা গাঁথা। এই সকল গুণেই ইংরাজ এখন অনেকের চক্ষেই বড়। যে জাতি বড় হয়, তাহাদের ভাষা অনেক পরিমাণে তেজস্বিনী হইয়া উঠে। ইংরাজের মাতৃভাষা ছিল না। যদি কিছু থাকে, তাহা এখনকার ইংরাজীভাষা নহে। এখনকার ইংরাজীভাষা নানাফুলের মোহনমালা। তথাপি দেখুন, এই মিশ্রভাষা কতদূর পরিমাণে কত তত্ত্বের জননী হইতেছে। এভাষা শিক্ষা করিলে একালে সংসারে অনেক জাতির অনেকপ্রকার উপকার লাভ সম্ভাবনা। ইংরাজ-আমলে ভারতে ইংরাজীশিক্ষার প্রচার হইয়াছে, ইহাকে অবশ্যই ভারতের উন্নতিলক্ষণ বলিয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হয়।

একালে আমাদের সমাজ অত্যন্ত বিশৃঙ্খল। ইংরাজীশিক্ষার গুণে উপকার হইতেছে স্বীকার করি, কিন্তু সমাজের পক্ষে উপকারের পরিবর্ত্তে অনেক বিষয়ে অপকার পরিলক্ষিত হইতেছে। একালে যাঁহারা ইংরাজী শিখিতেছেন, তাঁহাদের অনেকেই আমাদের জাতীয় পুরাণশাস্ত্রাদির কিছুই প্রায় ভাল করিয়া দেখেন না। পুরাকালীন লৌকিক আচারব্যবহারাদিও পরিজ্ঞাত হইবার অবকাশ পান না। কাজেই ইংরাজের বাহিরে বাহিরে যাহা দেখেন, তাহাই ভাল বলিয়া বিশ্বাস জন্মে। অনুকরণশক্তিটুকু খুব ভালই আছে, কাজেই কথায় কথায় পদে-

পদে অনুকরণ আরম্ভ করিয়া দেন। সেই অনুকরণে এদেশের উন্নতির নামে উন্নতির সারাংশটুকু ঢাকা পড়িয়া যায়! সমাজরূপ স্রোতের উপর শূন্যগর্ভ পদার্থের ন্যায় অপকারাংশ ভাসিয়া উঠে! প্রায় ত্রিশবৎসর পূর্ব্বে বঙ্গের একজন স্বভাব-কবি এক প্রকার দৈববাণীর ন্যায় বলিয়া গিয়াছেন,—

"হয় দুনিয়া উলট্ পালট্,
আর কিসে ভাই রক্ষা হবে!"

এস্থলে যদিও দুনিয়া না হউক, আমাদের ভারতমাতা যথার্থই একালে উলুটি পালুটি খাইতেছেন! দুঃখিনী বঙ্গমাতা তদপেক্ষাও আরও বেশীরকমে হাবুডুবু খাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন! কতক লোকে বলেন, ইংরাজীশিক্ষার প্রখর প্রভায় এদেশের আকাশ হইতে নিবিড় তমোময়ী গিরিগুহা পর্য্যন্ত স্থাবরজঙ্গম জলস্থল চরাচর সমস্ত স্থান আলোকময় হইয়াছে! যাঁহারা বলেন, তাঁহারা বলুন, বলিবার স্বাধীনতা বেশ আছে! কিন্তু আমরা ত বলি, অনেকদূর অন্ধকার! হিন্দুশাস্ত্র লইয়াই হিন্দু সমাজের প্রণালীবন্ধন, নিয়মবন্ধন, এবং পবিত্রতাবন্ধন। শাস্ত্রের নাম শৃঙ্খল। হিন্দুশাস্ত্র-শৃঙ্খলেই হিন্দুসমাজ বাঁধা। ইংরাজীশিক্ষার প্রতাপে সেই শাস্ত্র-শৃঙ্খলের বন্ধনটা অনেক পরিমাণে শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। একএক স্থলে একবারে শিথিল হইয়া, ভাঙ্গিয়া গলিয়া খসিয়া পড়িয়াছে বলিলেও, বোধ করি বেশী বলা হইবে না।

এমনস্থলে কেহ কেহ যদি এমন তর্ক উপস্থিত করেন

যে, এদেশে ইংরাজীচর্চ্চা দূরের কথা, এদেশে যখন একটীও মাত্র শ্বেতবর্ণ ইঙ্গ-মনুষ্য-কলেবরের ছায়ামাত্রও প্রবেশ করে নাই, তাহারও বহুপূর্ব্ব হইতে হিন্দুসমাজ উৎসন্ন যাইতেছে, তাঁহাদের একথা অস্বীকার করিলে আমরা ঠকিব। অধীনতা-দুর্ভাগ্যের আরম্ভের দিন হইতে আজিপর্য্যন্ত এই সাতশত বৎসরকাল আমাদের এই জগদুজ্জ্বলা, সর্ব্বমঙ্গলা, অন্নপূর্ণা ভারতমাতার মলিন বেশ!

মাতার দুরবস্থার সময় গুণবান্, ধনবান্, বীর্য্যবান্, ধর্ম্মশীল, উপযুক্ত পুত্রেরা প্রাণপণযত্নে সাহায্য করিবেন, ইহাই ত প্রকৃতি, ইহাতে ধর্ম্ম। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতমাতার নিদারুণ দুরবস্থার সময় গুণবান্ ধর্ম্মশীল পুত্রেরাই সর্ব্বাগ্রে মাতৃদ্রোহী হইয়া উঠিতেছেন! আর্য্যধর্ম্মের অভিধানে শাস্ত্রকুশল সদাচারী ব্যক্তিগণকেই গুণবান্ বিশেষণে অলঙ্কৃত করা হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে যাঁহারা মুনিঋষি ছিলেন, সংসারাশ্রমে এ যুগে তাঁহাদের অনেক গুলিকেই অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য নামে পরিচিত বোধ করা অসঙ্গত হয় না। তাঁহারাই যেন সাতশত বৎসর পূর্ব্ব হইতে শাস্ত্রকারগণের পদ ও স্থল অধিকার করিয়া লইয়াছেন। মূলশাস্ত্রের মধ্যে স্বকপোলকল্পিত ভিন্ন ভিন্ন মত, নূতন নূতন প্রায়শ্চিত্ত, কোথাও বা বিকট বিকট গল্প প্রবেশ করাইয়া পবিত্র আর্য্যশাস্ত্রের অনেকগুলিকেই তাঁহারা একপ্রকার বহুরূপী সাজাইয়াছেন! সর্ব্বাগ্রে তাঁহারাই স্বেচ্ছাচার ও ম্লেচ্ছাচারপরায়ণ হইয়া উঠিতেছেন! কাজে কাজেই মূল বন্ধন ছিন্ন হইতে আরম্ভ হইয়াছে! এস্থলে কেবল জিজ্ঞাস্য এই যে, পতিতের যেমন উত্থান আছে, পতিতপ্রায়

সনাতন হিন্দুসমাজের তদ্রূপ পুনরুদ্ধারের একেবারে কি কোন উপায়ই নাই?

এক সময় রাজা রামমোহন রায় হিন্দুসমাজসংস্কারের ব্রত লইয়াছিলেন। তাহার পর কত হইলেন, কত গেলেন, কত হইতেছেন, কত যাইতেছেন, গণিতশাস্ত্র তাহার সংখ্যা করিতে অক্ষম। দিনকতক এদেশে কেরি, মার্শম্যান, ডফ এবং আরও জনকতক ধর্ম্মশীল শ্বেতবর্ণ তপস্বী পণ্ডিত অন্যপ্রকার ধুয়াতে হিন্দুসমাজসংস্কারে হাটে বাজারে ওস্তাদী কবির আসর লইয়াছিলেন! কিছুতেই কিছু হইল না!

সাত শত বৎসরের মধ্যে এদেশে প্রকৃত সমাজসংস্কারক একজনও জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না, তাহার প্রকৃত ইতিহাস নাই। মধ্যে কেবল বঙ্গদেশের নবদ্বীপে একমাত্র চৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাহাতেও কিছু গোল আছে। সাক্ষাৎসম্বন্ধে গৌরাঙ্গদেবকে সমাজসংস্কারক না বলিয়া ধর্ম্মসংস্কারক বলিলেই ঠিক শোভা পায়।

এখন আমরা দেখিতেছি, যাঁহারা আপনাদিগকে সমাজসংস্কারক বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহারা কেবল মুখে মুখেই সমাজসংস্কার করেন!—কাজে অনুষ্ঠান করিয়া আদর্শ দেখাইতে কেহই প্রায় ইচ্ছা করেন না। বোধ করি, সে ক্ষমতাও সকলের নাই। অসংখ্য উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতে পারে, কিন্তু বিষয়কর্ম্মলিপ্ত, সর্ব্বক্ষণব্যস্ত, সামাজিক মনুষ্যগুলিকে বিরক্ত না করিয়া,—তাঁহাদের মনিবরঞ্জন-অমূল্য সময়রত্ন অপহরণ অপরাধে অপরাধী না হইয়া,—সামান্যতঃ এই খানে আজ কেবল আমরা একটী মাত্র দৃষ্টান্ত দেখাইব।

ইচ্ছা না থাকিলেও একদিন আমরা একটী লেক্‌চারি সভায় লেক্‌চার শুনিতে প্রবেশ করিয়াছিলাম। সে দিন সেখানে বাল্যবিবাহ নিবারণের বক্তৃতা হইতেছিল। বক্তৃতা করিতে করিতে বক্তা এক একবার কাঁদিয়া ভাসাইতেছিলেন। উপসংহারে তিনি ঋষিবর যাজ্ঞবল্ক্যের মস্তকে ভস্মাঞ্জলি নিক্ষেপ করিলেন! অপরাধ এই যে, "অষ্টবর্ষে ভবেদ্‌গৌরী, নব বর্ষে তু রোহিণী।" মহর্ষি জাজ্ঞবল্ক্য এই বচনের দ্বারা এ দেশের বাল্যবিবাহে অনুকূলব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন। এ অপরাধ অমার্জ্জনীয়!

বক্তার নিজমুখে আত্মপরিচয়ে ব্যক্ত হইল, "কুসংস্কারাবিষ্ট হিন্দুরা কতই নিন্দা করিতেছে, তথাপি তিনি তাঁহার চতুর্দ্দশবর্ষীয়া অনূঢ়া কন্যাকে পাত্রস্থা করিতে কোনমতেই স্বীকৃত হইতেছেন না!

বক্তার বয়ঃক্রম ত্রিশ বৎসরের অধিক নহে। চতুর্দ্দশ বর্ষবয়সে তিনি একটী নবমবর্ষীয়া বালিকার পতি হন। তিন বৎসর পরে সপ্তদশ বর্ষ বয়ঃক্রমে তিনি একটী প্রথমা দুহিতার বাবা হন! তাহার পর প্রতিবৎসর এক একটী করিয়া তাঁহার প্রায় দশবারটী পুত্রকন্যা ভূমিষ্ঠ হইল। তন্মধ্যে গুটীকতক নষ্ট হইয়াছে, গুটীপাঁচেক বাঁচিয়া আছে। এমন যে ত্রিশবর্ষীয় যুবা, তিনিই এখন বাল্যবিবাহের বিরোধী হইয়া চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া তনয়াকে অবিবাহিতা রাখিয়াছেন!—তিনিই এখন সমাজসংস্কারক সাজিয়া, আমাদের পরমপূজনীয় আর্য্যশাস্ত্রকারগণকে গালাগালি দিতেছেন!!!

যাঁহারা উপদেশ দেন, সমাজের আদর্শ হওয়া তাঁহাদের

উচিত। সেকালে হয় ত তাহাই ছিল, একালে তাহা হইতেছে না। আমাদের সমাজ এখন যেন, বাধাবিরহিত স্রোতের জলে ভাসিয়া চলিয়াছে! যাঁহার যাহা ইচ্ছা, তিনি তাহাই করিয়া জীবনের সার্থকতা লাভ করিতেছেন। বাহাদুরী লইবার নিমিত্ত বহুজনাকীর্ণ সভামধ্যে কেহ কেহ আপনাদের ধর্ম্মের নিন্দা করিয়া,—আপনাদের সমাজের নিন্দা করিয়া, আপনাদের বাক্‌শক্তির উচ্চ পরিচয় প্রচার করিয়া দিতেছেন! অনুচিকীর্ষাবৃত্তি অত্যন্ত বলবতী হইয়াছে! ইংরাজীশিক্ষিত যুবকেরা প্রায় সকলেই শুধু কেবল ইংরাজী সমাজের অনুকরণে ব্যাপৃত হইয়া পড়িয়াছেন! ইহাতে আমরা অতিশয় দুঃখিত হইতেছি।

আরও এক কথা।—পূর্ব্বাপেক্ষা একালের নব্যসম্প্রদায়ের স্বার্থপরতা ও অর্থলালসা অধিকতর প্রবলা হইয়াছে। সেই কারণে সমাজের আরও অধিক সর্ব্বনাশ ঘটিতেছে। ইংরাজের দেখাদেখি এদেশের ইংরাজীশিক্ষিত যুবকেরা প্রায়ই এখন কেবল নারী নারী করিয়া পাগল, টাকা টাকা করিয় ব্যতিব্যস্ত! ইংরাজী সমাজের কতক অনুকরণ আমাদের দেশে অতিশয় অনিষ্টকর। ইংরাজের সমাজ আছে, ইহা আমরা অস্বীকার করি না; কিন্তু যে সমাজের পুত্রেরা মাতাপিতার সহিত এক সংসারে বাস করাকে পাপ মনে করে.—যে সমাজের যুবকেরা কেবল এক এক বিবি লইয়াই বেহাতি, সে সমাজের আবার মূল্য কি?—পদার্থই বা কি? সনাতনধর্ম্মের অনুগত প্রাচীন হিন্দুসমাজ এপ্রকার স্বার্থপরতা ভালবাসেন না। হিন্দুসমাজের গঠন অন্যপ্রকার। বহুগোষ্টি একত্র বাসকরা হিন্দুসমাজে পরমসুখের বিষয়,—পরম গৌরবের বিষয়, পরম

আনন্দের বিষয়। গৌরবান্বিত আর্য্যসন্তানেরা ইহাকেই ধর্ম্ম মনে করেন। ইংরাজের মত মাতা পিতা, ভ্রাতা, প্রভৃতি সর্ব্ব-ত্যাগী হইয়া, নারী লইয়া পৃথক হওয়াটী পবিত্র হিন্দুসমাজের ধর্ম্ম নহে। এতাদৃশ বিষয়ে যেখানে যেখানে ইংরাজী অনুকরণ আরম্ভ হইয়াছে, সেই সেই স্থলেই সর্ব্বনাশ ঘটিতেছে। অক্ষর সাজাইয়া সে ঘটনার বর্ণনা করিতে হইবে না, বামে দক্ষিণে, সম্মুখে পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিলেই, বহুতর উজ্জ্বল উজ্জ্বল উদাহরণ দেখিতে পাইবেন।

ইংরাজী সমাজের প্রধান অভাব এই যে, ধর্ম্মের সহিত তাঁহাদের সমাজের কোন বন্ধন নাই। হিন্দুসমাজ তদ্বিপরীতে ধর্ম্মের সহিত স্তরে স্তরে গাঁথা,—স্তরে স্তরে বাঁধা। আরও বৈষম্য দেখুন, পাশ্চাত্যসমাজ কোনপ্রকার আইনের দ্বারা আবদ্ধ নহে, অথচ স্বাধীনধর্ম্মটী শক্ত আইনের দ্বারা আবদ্ধ। ইংলণ্ডের রাজা যদি খৃষ্টধর্ম্মের অন্য শাখা অবলম্বন করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সিংহাসন হইতে নামিতে হয়। হিন্দুসংসার এবিষয়ে কিপ্রকারে দণ্ডায়মান?—শাস্ত্ররূপ আইনশৃঙ্খলে হিন্দু-সমাজ চিরআবদ্ধ,—সনাতনধর্ম্মটী চিরমুক্ত। ধর্ম্মের অনুগত করিয়াই শাস্ত্র বিরচিত হইয়াছে। শাস্ত্রের মতানুসারেই সমাজ চলিবে, ইহাই সুচারু পবিত্র নিয়ম। এই নিয়মের সহিত বোধ হয় পৃথিবীর অপর আর কোন দেশের কোন জাতির সামাজিক নিয়মের তুলনা হয় না। হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্রমূল নহে। হিন্দুশাস্ত্রই ধর্ম্ম-মূল। ইংরেজেরা অনেক বুঝিতে পারেন, আজকাল তাঁহারা অনেক বিষয়ে অনেকদূর উচ্চ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, বিজ্ঞান-শৈলের উন্নত শিখরে আরোহণ করিয়া সুদূরদর্শনে তাঁহারা

প্রকৃতিদেবীর বহুবিধ গুহ্যলীলা পরিদর্শন করিতেছেন, অথচ সমাজের সহিত ধর্ম্মের যে কি নিকট সম্বন্ধ, শীঘ্র শীঘ্র সেই সূক্ষ্মটুকু বুঝিতে পারিতেছেন না, ইহারই বা কারণ কি?

কারণ আছে।—ইংরাজজাতি নূতন,—ইংরাজের সমাজ নূতন,—ইংরাজের ধর্ম্ম নূতন, ইংরাজের রাজ্যের আইনগুলিও নূতন।—সুতরাং পুরাতনের সহিত নূতনের তুলনা করিবার অবসর অতি অল্প। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রভু যিশুখ্রীষ্টের জন্ম হয় নাই;—বহুসহস্র বর্ষ পূর্ব্বে সনাতন আর্য্যধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। দুই সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে ইংরেজের উপাসনার নিমিত্ত কোনপ্রকার নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম ছিল না;—বহুসহস্র বর্ষ পূর্ব্বহইতেই ভারতের আর্য্যসন্তানেরা সনাতন আর্য্যধর্ম্মের চিরানুগত।

আর্য্যেরা প্রাচীন জাতি।—আর্য্যসমাজ প্রাচীন সমাজ। তবে এখন এই পবিত্র প্রাচীন সমাজের এমন দুরবস্থা কেন? তাদৃশ সমুচ্চ সমাজের এমন শোচনীয় অধঃপতন কিজন্য? সারগ্রাহী সমদর্শী বিজ্ঞ বিজ্ঞ পাশ্চাত্য পণ্ডিতমহাশয়েরাও নিরপেক্ষভাবে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন, সংস্কৃত যাঁহাদিগের ভাষা, বেদ যাঁহাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র, রামায়ণ যাঁহাদিগের মহাকাব্য, মহাভারত যাঁহাদিগের ইতিহাস, পাণিনী যাঁহাদিগের ব্যাকরণ, অভিজ্ঞানশকুন্তল যাঁহাদিগের নাটক, তাঁহাদিগের তুল্য মহিমান্বিত উচ্চ জাতি জগৎসংসারে অতি বিরল।

যদি এত মহিমা, এত গৌরব, এত সম্মান, তবে এক্ষণে নূতনের পদদলিত হইয়া এতদূর অপমান সহ্য করিবার সহিষ্ণুতা কিপ্রকারে শিক্ষা হইল?

শিক্ষা হইয়াছে অভ্যাসে আর অধীনতায়:—যখন জানিবার

শক্তি ছিল না, তখন জানিতাম না। এখন জানিতেছি, রাজবিধির আনুকূল্য ব্যতিরেকে রাজশাসিত দেশের কোন্ সমাজের প্রকৃত উন্নতি হয় না;—উন্নত সমাজও আত্মবন্ধনে স্থির থাকিতে পারে না। আমাদের রাজা এখন ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী; তাঁহাদের সমাজের সহিত আমাদের সমাজের সকল নিয়মের ঐক্য নাই। সুতরাং এই সমাজবিপ্লবের সময় সমাজসংস্কারের নামে কেবল স্বেচ্ছাচারের প্রশ্রয় দেওয়া হইতেছে মাত্র। দেশে হিন্দুরাজা থাকিলে কদাচ সমাজের প্রতিকূলে এত সিদ্ধি ঘটিত না। জাতিবিরোধী, সমাজবিরোধী, ধর্ম্মবিরোধী বহু স্লেচ্ছাচার অনুষ্ঠিত হইলেও কেহ এখন একটীও চুঁ শব্দ করেন না! করিলেই বা শোনে কে?—এবিষয়ে রাজার নজর থাকিলে সামাজিক আচারভ্রষ্ট লোকের দণ্ডবিধান হইত;—লোকেরও প্রাণে ভয় থাকিত। এখন তাহার কিছুই নাই। সত্য বটে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, কোথাও বা পল্লীতে পল্লীতে এক একজন ক্ষমতাপ্রাপ্ত সমাজপতি, অথবা দলপতি বাস করেন। তাঁহারা স্ব স্ব এলাকার শান্তিস্থাপনের কর্ত্তা। স্থানীয় মানস্থান, সম্ভ্রমস্থান, এবং ভয়স্থান। কিন্তু একটু স্থির হইয়া বিচার করিয়া দেখিলে তাঁহারা আমাদের কোন্ উপকারে আইসেন?—কোন্ কাজে লাগেন?—ভাল কাজ কিছুই না,—মন্দের দিকে বহুবচন! সমাজমধ্যে যতই কদাচার চলুক, সেদিকে দলপতির ভ্রূক্ষেপ নাই! নিজের দলভুক্ত হইলে, কোন কোন দলপতির বরং সেই সকল কদাচারে বিলক্ষণ উৎসাহ দেওয়া আছে! এতাদৃশ দলপতিগণের দ্বারা কোন প্রকার উপকারের প্রত্যাশা আছে কি?

উপকারের আশার মধ্যে সভামন্দিরের দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা। সে আশাটীও শীঘ্র ফলবতী হইবার উপায় নাই। বক্তারা মুখে যাহা বলেন, কাজে তাহা দেখাইতে পারেন না। কেহ কেহ বরং বিপরীত দেখান! এই কারণেই সভার বক্ত তায় কোন কাজ হইতেছে না।

কলিকাতা সহরে অনেকগুলি সমাজসংস্কারক থাকেন। অনেক স্থলে দিন দিন, সপ্তাহে সপ্তাহে, অথবা মাসে মাসে সমাজসংস্কারের বক্তৃতাও হয়। কিন্তু আমরা সম্বৎসরের মধ্যে একটীও বিশুদ্ধ শুভসংস্কার দেখিতে পাই না। কে বলিতে পারেন বলুন দেখি, শত বর্ষের মধ্যে আমাদের হিন্দু-সমাজে কয়টী শুভসংস্কার অনুষ্ঠিত হইয়াছে?

সমাজসংস্কারক অথবা ধর্ম্মসংস্কারক হইলেই যে গৌরাঙ্গ-দেবের ন্যায় সন্ন্যাসী হইয়া যাইতে হয়, এমন কোন আইন নাই। নগরবাসীগণের মধ্যেও সমাজসংস্কারক প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। তাঁহারা যে সকলেই নিঃস্বার্থ দরিদ্র সন্তান, তাহাই বা কে বলিবেন? সে দলেও দুটী একটী বাবু পাওয়া যায়। সহরে যাঁহারা বাবু, তাঁহারা সমাজসংস্কারক হউন, কিম্বা আর কিছুই হউন, তাঁহাদের বাবুগিরির বিলাসের নিমিত্ত নানাপ্রকার আসবাবের প্রয়োজন। পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী শুনিয়া গিয়াছেন, সহরে সত্য সত্য যাঁহারা খোসপোষাকী বাবু নামে বিখ্যাত, তাঁহাদের শতকরা প্রায় নব্বুই জনের এক একটী পোষাকী মেয়েমানুষ থাকে! সেই সকল মেয়েমানুষ ঐ সকল বাবুর উচ্চমূল্যের আসবাবের মধ্যে!—ঐ আসবাব না থাকিলে বন্ধুসমাজে মানসম্ভ্রম থাকে না! এখন বিবেচনা

করুন, যদি সেই দলের মধ্য হইতে সমাজ সংস্কারক অন্বেষণ করিয়া লওয়া প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে সেই সমাজসংস্কারকের বক্তৃতায় কিপ্রকার ফল ফলিবার সম্ভাবনা?

একজন নূতন ইংরেজ একবার কলিকাতার ধর্ম্মতলার রাস্তায় দীর্ঘচ্ছন্দের এক বক্তৃতা করিয়া বলিয়াছিলেন, "এদেশে বাল্যবিবাহ চলে, বিধবাবিবাহ হয় না, এই কারণেই এদেশে অসতীর সংখ্যা বেশী!"—আমাদের সমাজসংস্কারকদলের মধ্যে কতকগুলি চোষাচাপকানী যুবা সেই বক্তৃতাস্থলে সজীব শ্রোতারূপে বিদ্যমান ছিলেন। সাহেবের সভাভঙ্গের পর, বাঙ্গালীটোলার কোন কোন বাঙ্গালীর সভাতেও ঐ বাক্যের প্রতিধ্বনি গর্জ্জিয়াছিল! অহো! বড়ই ভয়ঙ্করী বাণী!—সতী-ভূমি ভারতবর্ষে অসতীর শ্রীবৃদ্ধি!—বলিলেন কে?—একজন নবাগত ইংরেজ!—আমরা শুনিয়াছিলাম, প্রিন্স দ্বারকানাথ যখন জীবিত ছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার পূর্ণমজলিসে একজন উচিতবক্তা এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে, ইংরাজেরা স্বদেশে লোক ভাল;—এদেশে আসিবার সময় তাঁহাদের অনেকে সুয়েজের খালে অথবা উত্তমাশা অন্তরীপে আপনাদের জ্ঞান ও লজ্জা বিসর্জ্জন দিয়া আইসেন! এই পুরাতন কথাটীর সত্য সত্য বিচার করিবার আবশ্যক নাই। অল্পদিন হইল, বর্দ্ধমানের একজন কবি কলিকাতায় আসিয়া সতীঅসতীর তর্কের সহিত আমাদের ও ইংরেজের বৈবাহিক প্রথার বিচার আরম্ভ করেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "ইংরেজের সমাজে বাল্যবিবাহ নাই, বিধবাবিবাহ আছে। তবে কেন তাঁহাদের দেশের সংবাদ-পত্রসম্পাদকেরা বর্ষে বর্ষে শত শত কুমারী-ব্যভিচারের কদর্য্য

গুহ্য সংবাদ পত্রস্থ করেন?—তবে কেন একাধিকসহস্ররজনীর অদ্ভুত অদ্ভুত গল্পের ন্যায় বহুতর সংখ্যাব্যভিচারের ঘৃণাকর ডাই-ভোর্স মোকদ্দমা সংবাদপত্রে মুদ্রিত করিয়া পৃথিবাসীর নয়ন-গোচর করা হয়? আরও অল্প দিন হইল, বিলাতের পেল্‌মেল্ গেজেট সম্পাদক বিলাতের বড় বড় দলের যে প্রকার পৈশাচিক ব্যবহারের মোহানা খুলিয়া দিয়াছেন, তাহার যে কতবড় তোড়, কর্ত্তারাই তাহা জানেন! যে সমাজের এমন অবস্থা, সে সমাজের অনুকরণে প্রবৃত্ত হওয়া, আবার সেই সমাজের লোকের মুখে ভারতে অসতীত্বের কুৎসা শুনিয়া সোৎসাহসগর্ব্বে সেই বাক্যের প্রতিধ্বনি করা নিতান্ত অবিবেচকের কার্য্য। তৎসম্বন্ধে এই পুণ্যভূমিতে যথার্থই যদি কিছু বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে, ভাল করিয়া তাহার কারণ অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। যাহাতে আর বিপর্য্যয় ঘটিতে না পায়, তাহার উপায়বিধান করাই মুখ্য কল্প। পরের মুখে ঝাল খাইয়া, স্বদেশের নিন্দায় আনন্দে নৃত্য করিয়া কথায় কথায় ঢলাঢলি কেন কর? অনর্থক আপনাদিগকে গাধা বলিয়া পরিচয় কেন দাও?

এপ্রসঙ্গটা অধিক বাড়াইয়া তুলিবার প্রয়োজন নাই। একাল সেকালের ধর্ম্মভাবটী কেমন চলিতেছে, তাহাও একবার দর্শন করা আবশ্যক। এদেশে যখন ইংরেজঅধিকারের প্রথম সূত্রপাত, তাহার অব্যবহিত পর হইতেই সে দেশের খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারক শ্বেতবর্ণ মনুষ্যেরা এদেশে আসিয়া বিলক্ষণ ধূমধাম আরম্ভ করেন। প্রথমেই তাঁহারা বলবান হিন্দুসমাজবৃক্ষে আস্তে আস্তে নাড়া দেন, যথায়তথায় হিন্দুধর্ম্মের, হিন্দুসমাজের ও হিন্দুশাস্ত্রের নিন্দা আরম্ভ করেন।—হাটেবাজারে অযথা নিন্দা

প্রচার করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দুবালকগণকে হিন্দুধর্ম্ম ভুলাইবার চেষ্টা পান! গণ্ডমূর্খ ইতরলোকদিগের ত মাথা খাইয়া ফেলেন! দিনকতক তাঁহাদের এতদূর বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, লোকে তাঁহাদিগকে ছেলেধরা বলিয়া ভয় করিত! আজকাল সে স্রোতটা কিছু কমিয়াছে বটে, তথাপি এককালে ভাটা পড়ে নাই। ধর্ম্মবীরেরা এখনও সুযোগ পাইলে ছাড়েন না! প্রচারক সাহেবেরা বক্তৃতা করিবার অবসর পাইলেই, বাইবেল ছাড়িয়া কেবল হিন্দুধর্ম্মের নিন্দা ঘোষণা করেন! হিন্দুধর্ম্মের কিছুমাত্র না জানিয়া তাহার দোষগুণ বুঝিতে পারিবার ভাণ করা পণ্ডিতের কার্য্য নহে। তাঁহাদের যখন এমন দশা, তখন তাঁহারা যে, হিন্দুশাস্ত্রমতে হিন্দুসমাজ-সংস্কারের কিছুমাত্র সহায়তা করিবেন, সে আশা মিথ্যা। কাহারও দ্বারা কিছুই হইবে না। ভগবানের মনে যাহা আছে, তাহাই হইবে। এখন যদি এমন একটা ব্যবস্থা হয় যে, হিন্দু-সন্তানেরা প্রকৃত হিন্দুশাস্ত্রের বিধিসঙ্গত বড় বড় সামাজিক আচারবিরুদ্ধ কোন গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, দোষানু-সারে এক এক প্রকার দণ্ডপ্রাপ্ত হইবে, তাহা হইলে হিন্দুসমাজ কিছু দিন থাকে,—নচেৎ যায়!

একধার হইতে চীৎকার উঠিতে পারে, এই উনবিংশ শতাব্দীর জ্বলন্ত উন্নতিমূল পরিবর্ত্তনের সম্মুখে অসভ্য হিন্দুর কুসংস্কার পুনঃপ্রবর্ত্তনের জন্য দণ্ডবিধির সাহায্য চাহিতেছে কে এটা মূর্খ?

সত্যই আমরা মূর্খ।—কিন্তু প্রাচীন নিয়মের মধ্যে যেগুলি ভাল, সেগুলি নষ্ট করা যতদূর মূর্খতা, সেগুলির সংরক্ষণ

চেষ্টা করা, ততদূর মূর্খতার কার্য্য নহে। শাস্ত্রের প্রতিপ্রসব শাস্ত্রেই বিদ্যমান। উদারচেতা শাস্ত্রকর্ত্তারাই বলিয়া গিয়াছেন, যুক্তিহীন বিচারে ধর্ম্মহানি হয়। যাঁহাদের বিচার করিবার শক্তি আছে, তাঁহারা জ্ঞানদণ্ডে যুক্তিরজ্জু সংযোগ করিয়া শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করুন, অবশ্যই অমৃত লাভ করিতে পারিবেন। হিন্দুশাস্ত্র রত্নাকর। ইহার গর্ভে শুক্তি-মুক্তা উভয়ই আছে। যাহা অন্বেষণ করিবে, তাহাই প্রাপ্ত হইতে পারিবে। শাস্ত্রের একস্থানে যে কার্য্যের নিষেধ আছে, অন্যস্থানে তাহার বিধি দেখিতে পাওয়া যায়। নিষিদ্ধ কার্য্যেরও প্রতিপ্রসব আছে। দ্বিধাশূন্য হইয়া যথার্থ যুক্তিপথে ন্যায়ান্যায় বিচারে যত্নবান হইলে মঙ্গল ভিন্ন কদাচ অমঙ্গল হইবে না;—কোন প্রাকারে কিছু অধর্ম্মও স্পর্শ করিবে না।

ইংরাজেরা আপনাদের ধর্ম্মে এবং আপনাদের সামাজিক নিয়মে অটল রহিয়াছেন। সেই কারণেই তাঁহাদের সমাজে বেশ ঐক্য রহিয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রে অনেক ভাল ভাল নিয়ম আছে, ভালভাল ইংরেজ তাহা স্বীকার করেন।—স্বীকার করেন বলিয়া আপনারা তাহা গ্রহণ করিবার চেষ্টা করেন না। আমাদের শাস্ত্রেই ঋষিমুখের বচন আছে, স্বধর্ম্মে মরণ শ্রেয়ঃ, পরধর্ম্ম ভয়াবহ।

আমরা ইংরাজীসমাজের নিন্দা করি না। যাঁহাদের যাহা, তাহা লইয়াই তাঁহারা সুখে থাকুন! বৈবাহিকবিষয়ে হিন্দুসমাজ শ্রেষ্ঠ, ইংরেজসমাজ অনেক ছোট। সতীত্ব ভারতবর্ষের আর্য্যজাতির পরমআদরের সামগ্রী। নারীর সতীত্বে পুরুষেরও গৌরব। ইংরেজ সেটী হয় ত বিবেচনা করেন না।

ইংরেজের সমাজে ডাইভোর্স মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে স্ত্রীর উপপতির বিরুদ্ধে টাকার দাবী চলে, পতি স্বয়ং ফরিয়াদী হইয়া আদালতের সাহায্যে টাকা চান! সতীত্ব বিক্রয়ের ব্যবসাটা হিন্দুসমাজে চলে না। বিলাতে ছোটলোকের ঘরেই ডাইভোর্স মোকদ্দমা হয়, বড়লোকের ঘরে হয় না, যদি কেহ এমন বলিতে চান, সেটী তাঁহাদের পক্ষে সাফাই হইবে না। উজ্জ্বল উজ্জ্বল নিদর্শনের সম্মুখে সে কথাটী অবশ্যই মিথ্যা হইয়া দাঁড়াইবে। বড়বড় ঘরেই বড়বড় ডাইভোর্স!

এক কথা বলিতে বলিতে আর এক কথা আসিয়া পড়িয়াছে। পাঠকমহাশয়েরা বিরক্ত হইতে পারিবেন, তাহাও ভাবিতেছি; তথাপি আবার কালের কথা মনে পড়িলে একালসেকাল বিচারে আবার অন্যপ্রকার নূতন কথা আসিয়া পড়িতেছে। অনেকদিন পর্য্যন্ত আমাদের এই হিন্দুসমাজ অনেক প্রকারে অনেক প্রকার আঘাত সহ্য করিয়া আসিতেছে। অন্য কোন ক্ষুদ্র সমাজ হইলে এতদিন কবে সমূলে ভাঙ্গিয়া পড়িত। হিন্দুসমাজের মূল বড় শক্ত, হিন্দুসমাজ বৃহৎ; সেই জোরে এখনও দাঁড়াইয়া আছে। আর একটী নূতন উপসর্গ দেখুন! পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে ভারতে গাভীবৎস হত্যা অধিকতর পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। হিন্দুর প্রধান পবিত্র খাদ্য দুগ্ধ, ক্ষীর, ঘৃত ইত্যাদি উপাদেয় সামগ্রী অনেক পরিমাণে দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে। যাঁহারা জানেন, তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন, আর্য্যেরা চিরদিন পবিত্রতাভক্ত। আর্য্যসন্তানেরা অকপটে পবিত্রতা ভালবাসেন। আর্য্যসন্তানগণের গৃহ পবিত্র, দেহ পবিত্র, অন্তঃকরণ পবিত্র, আচার পবিত্র, খাদ্য পবিত্র

এবং অনুষ্ঠানও পবিত্র। একালে ইহার কিছু কিছু ব্যতিক্রম ঘটিতেছে বলিয়া আমরা পবিত্র আর্য্যশব্দের পশ্চাতে অপবিত্র বিশেষণ বসাইয়া দিতে পারিব না।

এই আখ্যায়িকার নায়িকা যোগমায়া দেবী। সত্য সত্য তিনি যবনকন্যা কি না, যাবনিক উপাধিধারী নবাব রামহরি সত্য সত্যই মুসলমান কি না, তাহার কোনপ্রকার বিশিষ্ট প্রমাণ নাই। সমন্বয় করিয়া তিনি জাতি পাইয়াছেন। গণনীয় ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা তাঁহার বাটীতে আহার করিয়াছেন। ব্রাহ্মণপুত্রের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ হইয়াছে। তবে কেন গরিব জটাধরের পিতা মুসলমান অপবাদে জাত্যন্তর?—অনুসন্ধান লওয়া আবশ্যক।

কোন্ অনুসন্ধানটী আগে?—অনাথা বনবালা পাগলিনী হইয়া পাটলিপুত্রে আসিয়াছে, পাটলিপুত্রেই লুকাইয়া আছে, কিম্বা আর কোথাও চলিয়া গিয়াছে, সে তত্ত্বটী শীঘ্র একবার না লইলে ভাল হয় না। ওদিকে জটাধরের সঙ্গে দ্বারকাদাসের বঙ্গদেশ যাত্রা। তাঁহারাই বা সেখানে কি করিতেছেন, সে সন্ধানটীও জানা চাই। আমরা ত বোধ করি, অনাথা অবলার সন্ধানটীই অগ্রে লওয়া কর্ত্তব্য।

অষ্টম কল্প।

এটী-কে ?

একালসেকালের গুটীকতক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা হইল। অখ্যায়িকার ঘটনাগর্ভে আরও যদি কিছু প্রয়োজন হইয়া পড়ে, আবশ্যকস্থলে তাহাও সংযোগ করিয়া দিতে হইবে। এখন একবার পাটলিপুত্রে গমন করা আবশ্যক। দ্বারকাদাস বঙ্গদেশে আসিয়াছেন। তাঁহাকে আর সেখানে দেখিতে পাওয়া যাইবে না। তবে কেন ?—পূর্ব্ব কল্পেই বলা হইয়াছে, বনবালার অনুসন্ধান চাই। বনবালা পাটলিপুত্রে আছে কি না, সে তত্ত্ব বলিয়া দিবে কে ? যদি থাকে, তাহাই বা জানিতে পারিবে কে ? বনবালা কথা কহিতে পারে না। কে যে সে, পাটলি-পুত্রের লোকেরা সে পরিচয়টী জানিতেও পারিবে না। তবে আর অনুসন্ধান হইবে কিরূপে ?

সংশয়টাও ঠিক।—তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করা হইল। কেহই কিছু বলিতে পারিল না। পাগলিনী হইয়া নিশাকালে হরিণবাড়ী হইতে প্রচ্ছন্নভাবে পলায়ন করিয়াছে। পাগলিনী যে পাটলিপুত্রেই থাকিবে, তাহারই বা সম্ভাবনা কি ? পাটলি-পুত্রে থাকিবারই বা তাহার প্রয়োজন কি ? পাঠকমহাশয়

হয় ত, অনুভবেই বুঝিতে পারিতেছেন, পাগলিনী বনবালা পাটলিপুত্রে নাই।

সন্ধ্যা হইয়াছে। আকাশে একটু একটু মেঘ দেখা দিয়াছে। পশ্চিমেও একটু একটু বাতাস উঠিয়াছে। পথঘাট সমস্তই অন্ধকার। লোকালয়ে, বাজারে আর দোকানে দোকানে দুটী একটী আলো জ্বলিতেছে।—যাহাদের আলো, সে আলোতে কেবল তাহাদের নিজেরই যাহা কিছু কাজ হয়, পথিকলোকের কোনও উপকারে আইসে না।

অন্ধকার!—গঙ্গার দিকে খানকতক বাড়ী। সেই বাড়ীগুলি এখনকার কলিকাতাসহরের বাড়ীর ন্যায় সারিসারি গায় গায় গাঁথা নহে;—ঠাঁই ঠাঁই,—ফাঁক ফাঁক,—ছাড়াছাড়া, তফাৎ তফাৎ। সেই সকল বাড়ীর শেষের বাড়ীর সম্মুখদরজায় একটী বালক।—বালকটী যেন আকাশের মেঘাড়ম্বরে ভয় পাইয়া শীঘ্র শীঘ্র আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছে। কাহার কাছেই বা আশ্রয় প্রার্থনা করে? বাড়ীখানি বড়মানুষের বাড়ী নহে, দেউড়ীতে দরোয়ান নাই;—দেউড়ী পর্য্যন্তই নাই। সদর দরজা পার হইলেই, দুপাশে দুটী বসিবার ঘর। তাহার পরেই ক্ষুদ্র একটী প্রাঙ্গণ।—প্রাঙ্গণের পরেই অন্দরমহল।

সদর দরজা বন্ধ। বৈঠকখানার বহির্ভাগের গবাক্ষগুলিও বন্ধ। তাহার ভিতর মানুষ আছে কিনা, শীঘ্র অনুমান করিবার উপায় নাই। মানুষ থাকিলে দুটী একটী কথাবার্ত্তা শুনা যাইত;—গবাক্ষের ছিদ্র দিয়া একটু একটু আলোকশিখাও দেখা যাইত। কিছুই নাই! অন্ধকার! বাড়ীখানি যে খালিবাড়ী, তাহাও বোধ হইল না। ভিতর হইতে সদর দরজা বন্ধ

হইয়াছে। অবশ্যই মানুষ আছে। কিন্তু সে মানুষ অথবা মানুষেরা এখন আমাদের এই ভয়ার্ত্ত বালকটীর কোন উপকারে আসিতেছে না। বালক যেখানে দাড়াইয়া আছে, সেখানে আবরণ নাই। হস্তেও ছত্র নাই। বৃষ্টি আরম্ভ হইল। সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের জোর বাড়িল। বালক একবার ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া, আরও যেন বেশী ভয় পাইয়া, সজোরে ঘন ঘন বারম্বার সেই বন্ধ দ্বারে আঘাত করিতে লাগিল। কেই বা শোনে?—কেই বা উত্তর দেয়?—কেই বা আসিয়া দরজা খুলিয়া, আশ্রয়ার্থীকে আশ্রয়দানার্থ, ভয় নাই বলিয়া সম্মুখে দাঁড়ায়?

বালক আশ্রয়ার্থী!—বালক কি তবে নিরাশ্রয়?—যদি নিরাশ্রয় হয়, তবে কি পাটলিপুত্রে আজ নূতন আসিয়াছে?—যদি আজ আসিয়া থাকে, তবে ত নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে বিদেশী! কেই বা প্রশ্ন করে,—কেই বা উত্তর দেয়!—বাতাসে প্রশ্ন আসিতেছে, বাতাস উত্তর দিতেছে, প্রশ্নোত্তর উভয়ই বাতাসে বাতাসে মিশিয়া যাইতেছে। বাতাস যেন আবার প্রশ্ন করিল, এখানি কি তবে ঐ বালকটীর নিজের বাড়ী?—কোথাও কি গিয়াছিল? ফিরিয়া আসিতে সন্ধ্যা হইয়াছে, ঝড়বৃষ্টি হইতেছে, সেই জন্যই কি তাড়াতাড়ি দরজায় আঘাত করিতেছে? বাতাস এ প্রশ্নের উত্তর দিল না। বাতাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যিনি, তিনিও এপ্রশ্নের উত্তরে এক্ষেত্রে পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে সমান হইলেন। মানুষ বলিতে পারে না, বালক সেদিন সেখানে কেন? বিদেশী কি স্বদেশী?—পরের বাড়ীতে আশ্রয় চায়, কিম্বা নিজবাড়ীর দরজা খুলিতে বলে, পাটলিপুত্রের সে রাত্রের

এ প্রশ্নের উত্তর করা মানুষের পক্ষে যেমন অসাধ্য, পবনদেবের পক্ষেও সেইরূপ অসাধ্য হইয়া উঠিল।

বালকের কপাল ভাল। একজন অশ্বারোহী অশ্ব ছুট করাইয়া আসিতেছে।—সেই দিকেই আসিতেছে।—দেখিতে দেখিতে সেই বাড়ীর সম্মুখে আসিয়াই অশ্ব থামাইল। বালক সচকিতে একটু সরিয়া দাঁড়াইল। ঠিক দরজার গা ঘেঁসিয়াই ধাক্কা দিতে ছিল, মানুষ দর্শনে সুট্ করিয়া বামদিকে সরিয়া গেল। যেখানে ছিল, সে খানেও মাথার উপর বৃষ্টি, যেদিকে গেল, সে খানেও মাথার উপর বৃষ্টি! ভিজিতেছে,—কাঁপিতেছে আর ভয়াতুর কুরঙ্গশাবকের ন্যায় অন্ধকারেই সচঞ্চলে এদিক ওদিক দৃষ্টি সঞ্চালন করিতেছে! অশ্বারোহী মৃদুকদমে দরজার সমীপবর্ত্তী হইয়া অশ্ব হইতে নামিল। দ্বারে তিনবার করাঘাত করিল, হিন্দি করিয়া একটী স্ত্রীলোকের নাম ধরিয়া ডাকিল। ক্ষণকাল পরেই দ্বার উদ্ঘাটিত। একটী অর্দ্ধবয়সী রমণী ক্ষুদ্র একটী হাতলণ্টন ধরিয়া আগত ব্যক্তিকে বাটীর ভিতর লইয়া গেল। স্ত্রীলোক দেখিয়া লুক্কায়িত বালক একটু সাহস পাইল। পুরুষটী যখন লাগাম ধরিয়া ঘোড়াটীকে বাটীর ভিতর লইয়া যায়, সিক্তগাত্র বিকম্পিত বালক ঠিক সেই সময় দরজাসমীপে আসিয়া, দুই বাহু বিস্তার করিয়া দাঁড়াইল। বাটীর ভিতর হইতে প্রশ্ন আসিল, "কে॰ তুমি?"

উত্তর নাই।—দুইবার প্রশ্ন,—তিনবার প্রশ্ন।—তিনবারই উত্তর নাই। যাহার প্রতি প্রশ্ন, সে বালক নিরুত্তর। উত্তরের মধ্যে কেবল বাহুসঞ্চালন, মস্তকসঞ্চালন, বক্ষস্পর্শ, মস্তকস্পর্শ, আর ঘন ঘন অঙ্গুলীসঙ্কেতে বাড়ীর ভিতর প্রদর্শন।

প্রশ্নকর্ত্তা আপনাআপনি কি বকিতে বকিতে,—শীঘ্র শীঘ্র ঘোড়াটীকে বাটীর ভিতর লইয়া গিয়া তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করিবার উপক্রম করিতেছিল, এমন সময় সেই আলোকধারিণী রমণী পুনর্ব্বার অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া, প্রথমে প্রশ্নকর্ত্তাকে প্রশ্ন করিল, "কে ওখানে পণ্টু? কাহার সঙ্গে কথা কহিতেছ? কাহাকে কি জিজ্ঞাসা করিতেছ?"

অশ্বারোহণে আগত ব্যক্তির নাম পণ্টু।—স্ত্রীলোকটীর উপর্য্যুপরি তিনটী প্রশ্নে পণ্টু উত্তর করিল, "আরে কে একটা ছোঁড়া!—ঠিক যেন পাগল!—হয় পাগল, নয় চোর!"

সংশয়-বিস্ময়ে আরও একটু অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া স্ত্রীলোকটী বাহিরের দিকে হাত বাড়াইয়া লণ্ঠন ধরিল। লণ্ঠনের আলোতে স্পষ্ট দেখা গেল, একটী বালক!—স্ত্রীলোকটী দেখিল, দিব্য বালক!—ঠোঁটদুখানি টুক্‌টুক্ করিতেছে, মুখখানি যেন পদ্মফুল, চক্ষুদুটী যেন আকাশের নক্ষত্রের মত উজ্জ্বল, মস্তকে নীলাম্বরী পাগ্‌ড়ী। মুখখানিকে পদ্মফুল বলা গেল বটে, কিন্তু যেন একটু বাসী বাসী!—মুখখানি বিশুষ্ক!—বৃষ্টির জলে সর্ব্বশরীর ভিজিয়া গিয়াছে, গাত্রবস্ত্র সমস্তই ভিজিয়া জাব হইয়াছে, যেন বাতাসের উপর ভর করিয়া সেই শুষ্কমুখ দিব্য বালকটী থর থর করিয়া কাঁপিতেছে।

স্ত্রীলোকটীর দয়া হইল। পণ্টুকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "পণ্টু! চোর নয়, দিব্য বালক! বিপদে পড়িয়াছে,—ভয় পাইয়াছে, ভিজিয়া গিয়াছে! আসিতে দাও!—আহা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে দেখ! কাঁপিতে কাঁপিতে যেন পড়ে পড়ে হইয়াছে, আসিতে দাও! ও চোর নয়!"

গর্জ্জন করিয়া পণ্টু কহিল, “চোর নয় ত পাগল!—নিশ্চয় পাগল!—এত জিজ্ঞাসা করিতেছি, কথা কয় না!—কেবল হাত নাড়ে, মুখ নাড়ে, মাথা দেখায়, বুক দেখায়, কথা কয় না। ভারি হারামজাদ্! নিশ্চয় পাগল!”

কাতরা হইয়া আলোকধারিণী কহিল, “না পণ্টু, ও পাগল নয়!—চোর্ও নয়, পাগলও নয়, কিছুই নয়!—চোরের মুখচক্ষু অত মোলায়েম হয় না! পাগলের মুখচক্ষুর অমন তেজস্বিনী শ্রী থাকে না!—চোরও নয়, পাগলও নয়, কিছুই নয়! বৃষ্টিতে ভিজিয়া বোধ হয় দমবন্ধ হইতেছে, কথা কহিতে পারিতেছে না, ইঙ্গিত করিয়া আশ্রয় চাহিতেছে। তুমি উহারে আসিতে দাও!”

স্ত্রীলোকের হাতমুখের ভঙ্গী দেখিয়া বালক বুঝিল, দয়ার কথা হইতেছে। সে অমনি তৎক্ষণাৎ আরও দুই চারিপা অগ্রসর হইয়া, অধিক কাতরভাবে পুনঃপুন হস্তমুখ সঞ্চালন-পূর্ব্বক অলোকধারিণীর করুণাভিক্ষা করিতে লাগিল।

পণ্টুও এদিকে আজ্ঞাদায়িনীর আজ্ঞাপালনে অস্বীকার করিতে পারিল না। একটু সদয়ভাবে বালকটীকে হাতছানি দিয়া ডাকিল। স্ত্রীলোকটীও লণ্ঠন তুলাইয়া হস্তসঙ্কেতে মধুর-বচনে “আও আও” বলিয়া আহ্বান করিলেন।

বালক ছুটিয়া গিয়া দরজার মধ্যে প্রবেশ করিল। স্ত্রীলোকটী তাহাকে আদর করিয়া কাছে টানিয়া লইলেন। “ভয় নাই, চিন্তা নাই, এই খানেই থাক,” ইত্যাকার মিষ্টকথা বলিয়া শান্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। ফল হইল, কিন্তু বালকটীর কর্ণে তাঁহার অতগুলি কথার একটী বর্ণমাত্রও প্রবেশ করিল না।

আশ্রয়দায়িনীর "আও আও" আহ্বান শুনিতে পায় নাই, অথচ বুঝিয়াছিল, সদয়ভাবে আহূত। এবারের বাক্য-গুলিও শুনিতে পাইল না,—অথচ বুঝিয়া লইল, সদয়ভাবে সান্ত্বনা।—আমরা এইস্থলে ভাঙ্গিয়া দিতে পারি, আশ্রয়দায়িনীর নাম হইতেছে পিয়ারবানু।

সদর দরজা বন্ধ হইয়া গেল। পিয়ারবানু যত্নপূর্ব্বক বালকটীকে এককালে অন্দরমহলেই লইয়া গেলেন। পণ্টুও সঙ্গে সঙ্গে চলিল। পণ্টুর ঘোড়াটী প্রাঙ্গণের এক কোণে আপন বৈঠকখানায় দানা খাইতে সুরু করিল।

পাঠকমহাশয়কে বুঝিতে হইবে, এই পিয়ারবানুই এই বাড়ী-খানির অধিকারিণী। পণ্টু তাঁহার গোমস্তা। পিয়ারবানুর কতকগুলি কারবার আছে, এই পণ্টুই তাহার ষোলআনা কাজকর্ম্মের উপর কর্ত্তৃত্ব করে। কারবারের লোকেরাও পণ্টুকে ভয় করিয়া চলে। পণ্টুর প্রতি পিয়ারবানুর বিশ্বাস আছে, কিন্তু সেবিশ্বাসকে মাতব্বর বিশ্বাস বলিয়া অনুধাবন করা যায় না। একটী বিদেশী বালককে এককালে অন্দরমহলে লইয়া যাওয়া হইল, পণ্টু ইহা ভাল বুঝিল না। অগ্রেই একটী বৈঠক-খানা খুলিয়া দিবার কথা বলিয়াছিল, পিয়ারবানু বলিয়া ছিলেন, "দরকার নাই।" তিনি আরও বলিয়াছিলেন, "এ বালক অন্দরে যাইবার উপযুক্ত! মুখশ্রীতে ইহার উপর আমার বড় এক চমৎকার স্নেহ জন্মিয়াছে। কেন অকস্মাৎ এমন স্নেহ আসিল, কিছুই ত আমি বুঝিলাম না। মুখ দেখিলে ত্রয়োদশ বর্ষের অধিক বয়স বোধ হয় না। কেন এ বালক একাকী এখানে নিরাশ্রয়, ভাল করিয়া জানিতে হইবে।" এই সকল কথা

বলিয়া পিয়ারবাণুদেবী ঐ বালকটীকে অন্দরে লইয়া গিয়াছিলেন। পিয়ারবাণুদেবী রায়বেরিলীর একজন তেওয়ারী ব্রাহ্মণের কন্যা। প্রায় দশ বৎসরের অধিক হইল, গুটীপাঁচেক পরিবারের সহিত পাটনায় আসিয়া বাস করিয়াছেন।

এইবার ঘরের আলোতে বালকটীকে একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। বালক চমৎকার!—পোষাকটীও চমৎকার!—পোষাকে সর্ব্বশরীর ঢাকা পড়িয়াছে। স্কন্ধের উপর কেবল সেই ফুটফুটে পদ্মমুখখানি অল্প অল্প জাগিতেছে। অর্দ্ধশুষ্ক পদ্মফুল!—তাহারো দুই পাশ ঢাকা। বালকের মাথায় নীলাম্বরী পাগ্‌ড়ী,—মাথার সমস্ত কেশগুলি সেই পাগ্‌ড়ীর মধ্যেই সন্নিবিষ্ট, তথাপি বোধ হইল, দীর্ঘকেশ। কেন না, কাণের দুপাশের পাগ্‌ড়ীর নীচে দিয়া, দুকোছা কুঞ্চিত কৃষ্ণকেশ সেই বালকের মুখখানির পাশদুখানি ঢাকা দিয়া, বক্ষদেশ পর্য্যন্ত বিলম্বিত হইয়াছে। শোভাই এক অপূর্ব্ব!

ব্রজবাসিনী বালিকারা চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত যে এক প্রকার প্রশস্ত ঘাগ্‌রা পরিধান করে, পাটনায় এই বালকের সেই-রূপ ঘাগ্‌রা পরিধান। তাহার উপর পুরুষের পোষাক। বালক বলিয়া এ পোষাকটী দিব্য মানাইয়াছে! পোষাকটীও আগে মূল্যবান ছিল। এখন ঠাঁই ঠাঁই ছিঁড়িয়া গিয়াছে,—ঠাঁই ঠাঁই পোকায় এবং ইন্দুরে রথ্‌রা করিয়া লইয়াছে, ঠাঁই ঠাঁই গুড়ুক-তামাকের দাগ লাগিয়াছে, ঠাঁই ঠাঁই রেড়ীর তেলের রং করা হইয়াছে! অত্যন্ত ময়লা, বুকের কাছে তালিদেওয়া,—দেখিতে তত শ্রীনাই;—জিনিস কিন্তু দামী। মাথায় নীলাম্বরী পাগ্‌ড়ীটী, সেটীও ঠাঁই ঠাঁই ছেঁড়া, ঠাঁই ঠাঁই তৈলাক্ত করা,

ঠাঁই ঠাঁই চূর্ণঢালা, বহুদিনের কীটজীর্ণ বিমলিন ভাবাপন্ন। আরও, সূক্ষ্মরূপে দেখিলে বোধ হয় যেন বড় মাথার পাগ্‌ড়ী। যাহাই হউক, বালকটীকে ঐ পোষাকটী সাজিয়াছিল বেশ!

বেশ সাজিয়াছিল সত্য, কিন্তু থাকিল কৈ?—ঝড়েজলে ভিজিয়া জাব হইয়াছে। আশ্রয়দায়িনী পিয়ারবানু সেই বিদেশী বালককে আপন গৃহে লইয়া গিয়া কাপড় ছাড়িতে বলিলেন। বালকের অঙ্গের উপযুক্ত একসুট ভাল পোষাক বাহির করিয়া দিলেন। বালক সেখানে কাপড় ছাড়িতে পারিল না। তাহারা প্রবেশের অগ্রে একটী ঘর ছাড়া সমস্ত ঘরেই চাবি দেওয়া ছিল। এইমাত্র পণ্টু আসিয়া, সব ঘরের চাবি খুলিয়া রাখিয়া, কার্য্যান্তরে অন্য গৃহে চলিয়া গিয়াছে। বালক সেই নূতন পোষাকটী হাতে করিয়া অবনতবদনে একটী পার্শ্বগৃহে প্রবেশ করিল।

সে গৃহ নির্জ্জন।—বালক সেই নির্জ্জন গৃহে একাকী কাপড় ছাড়িতেছে।—একাকী,—তথাপি যেন বালকের চক্ষে কতই লজ্জা,—কতই আশঙ্কা!

কেন এ ভাব?—কেহই হয় ত এখন সে ভাবটী অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন না। বালক কাপড় ছাড়িল। সিক্তবস্ত্রের মধ্যে তাহার কি কি প্রিয়বস্তু ছিল, তাহা বাহির করিয়া নূতন বস্ত্রের মধ্যে লুকাইয়া রাখিল।

বালকের নাম পাওয়া গেল না।—পিয়ারবানু সেই বালককে আদর করিয়া কাছে আনিয়া বসাইলেন, কিঞ্চিৎ জল খাইতে দিলেন, বালক যৎকিঞ্চিৎ মুখে দিল মাত্র, সমস্তই পড়িয়া রহিল। পিয়ারবানু ভাবিলেন, ঝড়বৃষ্টিতে ভিজিয়াছে, কাতর

আছে, এখন খাইতে পারিল না, পরে খাইবে। পিয়ারবাণুর হৃদয়ে দয়ার আসন আছে। তিনি কেবল বালকের কাতরতা ভাবিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়া রহিলেন না। বালকের কষ্ট কি, শরীর কেমন, নিবাস কোথায়, নাম কি, পাটনায় কেন, ইত্যাকার বহুপ্রশ্ন এককালে পিয়ারবাণুর রসনা হইতে কাতরভাবে বহির্গত হইতে লাগিল।

সমস্ত প্রশ্নই নিষ্ফল। বালক কেবল ইসারা করে!—দয়াবতী পিয়ারবাণু পৃষ্ঠে হাত বুলাইয়া, আদরে থুতি ধরিয়া, চক্ষের কাছে হাসিয়া হাসিয়া কত কথা বলিলেন, সমস্তই নিষ্ফল! বালক কেবল ইসারা করে!—হাসে না,—কাঁদেও না,—কাণে কাণেও একটী কথা বলে না! কেবল হাতমুখ নাড়িয়া ইসারা করে!

পিয়ারবাণু তখন বুঝিলেন, ছেলেটী বোবা! তিনিও তখন ইসারা ধরিলেন।—ইসারায় ইসারায় উভয়ে সেই ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব, ততদূর মোটামুটি আলাপপরিচয় বুঝিয়া লইতে লাগিলেন। এই সময় গৃহের দুটী বালিকা সেইস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল। একটীর বয়স প্রায় দশ বৎসর, দ্বিতীয়াটী অষ্টমবর্ষীয়া।

পিয়ারবাণু এই বালিকাদের পিসীমা হন। বালিকারা তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকে। নূতন বালককে পিসীমার কাছে আদর পাইতে দেখিয়া, জ্যেষ্ঠা কন্যাটী একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ও কে মা?"

পিয়ারবাণু হাসিয়া উত্তর দিলেন, "ও তোমাদের ভাই হয়! খেলা কর,—গল্প কর,—বোসো।"

বালিকারা পিসীমার গা ঘেঁসিয়া বসিল। বালকের সঙ্গে গল্প জুড়িয়া দিল। বালক এইবার হাসিল। দুজনের দিকে দুটী অঙ্গুলী তুলিয়া ঘাড় নাড়িয়া নাড়িয়া, ভাল করিয়া ইসারা করিল। বালিকারা হাসিয়া অজ্ঞান!

বালক পাছে তাহাদের হাসির কারণ বুঝিতে পারিয়া মনে মনে কষ্ট পায়, এই ভাবিয়া বালিকাদুটীকে শান্ত করিবার উদ্দেশে পিয়ারবাণুদেবী করুণবচনে বলিতে লাগিলেন, "না বাছা!—হেসো না!—তোমাদের ঐ ভাইটী আজ সন্ধ্যাকালে বৃষ্টির জলে ভারি ভিজেছে!—ঝড়ে, শীতে, অবসন্ন হয়ে পড়েছে, কথা কহিতে পারে না!—তোমরা হেসো না!"

বালিকারা পিসীমার অবাধ্য বালিকা ছিল না। ইঙ্গিতমাত্রেই ইঙ্গিত বুঝিল।—ঝড়বৃষ্টির কষ্টের কথা শুনিয়া দুটীতেই বিষণ্নবদনে কাতরভাবে দুটী নিশ্বাস ফেলিয়া উচ্চারণ করিল, "আহা!"

এই সময় পণ্টু আসিয়া প্রবেশ করিল। বালক এতক্ষণ তাহাকে মুহূর্ত্তমাত্রও অচঞ্চল দেখিতে পায় নাই, এবারে দেখিল, বেশ সুস্থির। গৃহস্বামিনীর কাছে রন্ধনভোজনাদির খোসগল্প জুড়িয়া দিল। বালক এই অবকাশে আপনার বস্ত্রমধ্য হইতে একখানি কাগজ বাহির করিয়া পণ্টুর হস্তে প্রদান করিতে উদ্যত হইল। পণ্টু তাহার প্রতি সদয় কি নির্দ্দয়, বালক এতক্ষণ তাহার কিছুই বুঝে নাই। বালকের মনে মনে আকিঞ্চন রহিয়াছে, আসল সন্ধানটী জানিয়া লইবে। পুরুষমানুষ না হইলেও সে সন্ধানটী বুঝাইয়া দিতে পারিবে না। সুতরাং পণ্টুকেই উপকারী মুরুব্বি স্থির করিয়া বালক সেই স্থলে তাহার হস্তেই যত্নসঞ্চিত পত্রিকাখানি সমর্পণ করিল।

পিয়ারবাবু বিস্ময়াপন্ন হইলেন।—পণ্টু ও বিস্ময়াপন্ন হইল। উভয়ের বিস্ময়ের ভিন্ন ভিন্ন কারণ।—পণ্টুর বিস্ময়ের হেতু আর অন্য কিছুই নহে, দলীলখানা তাহাকে পাঠ করিতে হইবে! এই দুষ্কার্য্য অপেক্ষা তাহাকে যদি কেহ নরহত্যা করিতে উত্তেজিত করিত, তাহা হইলে পণ্টু কখনই এতটা বিস্ময়াপন্ন হইত না। পণ্টুর তিনপুরুষে লেখাপড়ার চাষ নাই।

পিয়ারবাবু জানিতেন, পণ্টু মূর্খ; কিন্তু এমন একখানা পত্র পড়িতেও পারে না, এতবড় ধড়ীবাজ মূর্খ, এটী হয় ত তিনি জানিতেন না। এখন জানিতে পারিয়া সেই গৌরবিনী কামিনী তাচ্ছিল্যভাবে পণ্টুর হস্ত হইতে কাগজখানা গ্রহণ করিলেন। কটাক্ষে দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ যেন আসল ভাবটুকু বুঝিয়া লইলেন। একবার সতৃষ্ণনয়নে বালকের মুখপানে চাহিলেন। বক্রদৃষ্টিতে পণ্টুকেও নিরীক্ষণ করিলেন। অতঃপর মনঃসংযোগ দিয়া বালকদত্ত দলীলখানি বর্ণে বর্ণে পাঠ করিলেন। অন্য-মনস্ক হইয়া, অন্য দিকে চাহিয়া, কতক্ষণ কি চিন্তা করিলেন, অবশেষে ইসারা করিয়া বুঝাইলেন, "যাহার অন্বেষণ কর, তাহার বাড়ী এখানে নহে; তাহাকে আমরা এখানে আর কখন দেখি নাই; ও নামের কোন ভদ্রলোকের সঙ্গে আমাদের জানাশুনা নাই।"

বালক বিমর্ষ ছিল,—বিমর্ষই রহিল। পিয়ারবাবুর শেষ নির্ঘাতবাক্যে তাহার উপর আর অধিক বিমর্ষভাব আসিল না, পত্রিকাখানি পিয়ারবাবুর হস্ত হইতে সানন্দে গ্রহণ করিয়া পূর্ব্ব-বৎ সযত্নে বসনাঞ্চলে শক্ত করিয়া বন্ধন করিল। বালক এই খানেই থাকিবে, আদর যত্ন পাইবে, কিছু কিছু নগদ চায়, তাহাও

দেওয়া যাইবে,—পণ্টুর সঙ্গে পিয়ারবাবুর এইপ্রকার গুপ্ত পরামর্শ অবধারিত হইয়া থাকিল। ভোজনান্তে সকলেই সেই বাটীমধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নিশাযাপনার্থ শয়ন করিলেন। বালকের ঘরের সম্মুখে পণ্টু স্বয়ং পাহারা ছিল, কিন্তু সেই ব্যক্তিই সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত!

রজনীপ্রভাতে পিয়ারবাবু কৌতূহলী হইয়া বালক দেখিতে গেলেন,—বালক নাই! কখন কোন্ দিক দিয়া প্রস্থান করিয়াছে, কেহই তাহা জানে না। পণ্টু তাহা জানিবার জন্য অস্ত্রধারী হইয়া পাহারায় খাড়া হয়, কিন্তু বিধাতার বিড়ম্বনা! হস্তে তরবারি, বক্ষে চাপ্‌রাশ, নয়নে নিদ্রা,'এই সকল ভারে ভারাক্রান্ত আমি,—আমি কি সাহসে সজাগ পাহারায় মঞ্জুরী লিখিতে পারি?—সুতরাং সমস্ত রাত্রিই গভীর নিদ্রাগত!

পণ্টু যখন পাহারাশয্যা পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার উন্মীলিত নয়নে গাত্রোত্থান করিল, তখন জানিল, শিকারটী পলায়ন করিয়াছে!

এটী কে?—অন্ধকারে এতক্ষণ খেলা করিয়া অকস্মাৎ অদৃশ্য হইয়া গেল, এটী কে?—যখন চলিয়া গিয়াছে,—যখন রাত্রিকালে না বলিয়া পলায়ন করিয়াছে, তখন আর এ কল্পে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে না।

নবম কল্প।

জাতি কি থাকিবে ?

জাতি থাকিলেই জাতি যায়। জটাধরের বৃদ্ধ পিতাকে গ্রামের দলপতিরা জাত্যন্তর করিয়াছেন, জটাধরের পিতা নবদ্বীপের ব্যবস্থা লইতে বহির্গত হইলেন। সে সময়ে নবদ্বীপের বেশ জলজলাট্ ছিল, ব্যবস্থাগুলিও শাস্ত্রসম্মত ঠিক ঠিক হইত; কিন্তু গরিব হওয়া বড় দায়! জটাধরের পিতা সর্ব্ববাদী-সম্মত ব্যবস্থা পাইলেন না। হুগলীর বিশ্বদুর্লভ চৌধুরী দলাদলী করিয়া মাথা নেড়া করিয়াছেন, অবশিষ্ট টিকিটী পাকাইয়া লইয়াছেন, লোকের সমন্বয়ের সময় তিনি বড় একটা কাঁচা কাজ করেন না! হুগলীতে সমন্বয়!—নবদ্বীপ পর্য্যন্ত নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। তন্মধ্যে সকলে সমন্বয়স্থলে আগমন করেন নাই। আরও হয় ত দলপতির ভ্রমক্রমে সকল নামগুলি অধ্যাপকের ফর্দ্দমধ্যে স্থান পায় নাই; সেই ক্রটীতে নবদ্বীপের গুটীকতক বড়বড় অধ্যাপকের নাম ছুট গিয়াছে। যাঁহারা রাম-হরির সমন্বয়ে পদধূলি দিয়াছিলেন, তাঁহারা ব্যবস্থা দিলেন, রাম-হরি ব্রাহ্মণ; যে ঘরেৎকন্যা দিয়াছেন, তাঁহারাও ব্রাহ্মণ। জটাধর ব্রাহ্মণের বাটীতে আহার করাতে ন্যায়ানুসারে তাঁহার পিতা জাত্যন্তর হইতে পারেন না। তাঁহাদের কথাই বা কে শোনে ? যাঁহারা সমন্বয়ে যান নাই, তাঁহারা বাঁকিয়া বসিলেন। বিশেষতঃ জটাধরের পিতার বিপক্ষ প্রবলপল্লীর দলপতিগণ তাঁহাকে

একঘরে না করিয়া কিছুতেই নিরস্ত হইবেন না, এই তাঁহাদের ধনুর্ভঙ্গ পণ! মানুষকে একঘরে করিতে না পারিলে সমাজে বাহাদুরী লওয়া যায় না, এই নীতিটী গ্রাম্য দলপতি মহাশয়েরা খুব ভালই বুঝেন। যে সকল ব্রাহ্মণপণ্ডিত জটাধরের পিতাকে সংশ্রবদোষে পাপী বলিলেন, দাম্ভিক দলপতি-মহাশয়েরা তাঁহাদিগকে দক্ষিণা দিতে ভুলিলেন না!

জটাধর গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁহার বৃদ্ধ পিতা ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অষ্টবজ্র একত্র হইয়াছে, জাতিরক্ষার আর কিছুমাত্র উপায় নাই! পুত্রকে পুনঃপুন এই কথা বলিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নিদারুণ চিত্তসন্তাপে হাপুস্নয়নে কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন! সদাশয় দ্বারকাদাস বিধিমতপ্রকারে অনেক বুঝাইলেন, বৃদ্ধ কিছুতেই প্রবোধ মানিলেন না। তাঁহার নেত্রজল জটাধরের নেত্রে জল আনিয়া দিল। পিতাপুত্রের নেত্রজল দর্শনে দ্বারকাদাসের নেত্রেও অশ্রুপাত হইতে লাগিল!

আচারভ্রষ্ট হইলে জাতি যায়,—ধর্ম্মভ্রষ্ট হইলে জাতি যায়, বৈবাহিক করণকারণের বিপর্য্যয় ঘটিলে জাতি যায়,—যাহার অন্নগ্রহণ করা শাস্ত্রনিষিদ্ধ, তাহার অন্নগ্রহণ করিলে জাতি যায়। আরও অনেক কারণে সামাজিক মান্যলোকেরা জাতি হারান! অনেক কারণেই সমাদৃত জাতিপোষক পবিত্র হিন্দুর জাতি যায়! সংশ্রবদোষেও অনেক হিন্দুসন্তান অকপট নিষ্কলঙ্ক হইলেও দশচক্রে পড়িয়া জাতি খোয়ান! জটাধরের ধর্ম্মভীরু গরিব বৃদ্ধ পিতা শুধু এক শ্রুতিমূলক সংশ্রবদোষের শূন্যময় বাতাসেই জাতিকুল হারাইতেছেন!—বাসস্থানটী পর্য্যন্ত হারাইবার উপক্রম হইয়াছে! যাহাতে তিনি শীঘ্র শীঘ্র দেশত্যাগী হন, তাহার

পরিষ্কার পন্থাস্বরূপ গুটীতিনেক মিথ্যা মোকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছে। এক নম্বর দাঙ্গাবাজী ফৌজদারী, দুই নম্বর দেওয়ানী! দলপতিমহাশয়দের মিথ্যাসাক্ষীর অভাব নাই! যাঁহারা দলপতি হন, তাঁহারা অবশ্যই গ্রামের মধ্যে প্রধান। দলপতির মান থাকে, টাকা থাকে, খাতির থাকে, খুব বড়দরের অভিমানটাও থাকে। ফৌজদারীধরণের মিথ্যামোকদ্দমাকে খুব ভালরকম পাকাইয়া তুলিবার অভিলাষে কোন কোন অভিমানী দলপতি যদি নিকটস্থ কোন পুলিস-আম্‌লার সহায়তা প্রার্থনা করেন, খাতিরের অনু-রোধে সকল স্থলে বোধ হয় তাঁহাকে সে প্রার্থনাপূরণেও বঞ্চিত হইতে হয় না। জটাধরের পিতার নামে ফৌজদারী মোকদ্দমা রুজু হইয়াছে, তাহাতে কোতোয়ালীর একজন নামলব্ধ জমাদার ফরিয়াদীপক্ষের পৃষ্ঠপোষক। দস্তুরমত টাকা খরচ করিতে পারিলে অভাগ্য জটাধরের ভাগ্যহীন পিতার এমন দুর্দ্দশা হইত না! দেওয়ানী, ফৌজদারী, কোন মোকদ্দমাই উঠিত না!—জাতি গেল জাতি গেল বলিয়া ঘোঁটাঘোঁটেরও কারণ থাকিত না, সচ্ছন্দে জাতি বজায় রাখিবারও কোন ব্যাঘাত হইত না! কিন্তু অভাগার ত টাকা নাই!—দলপতিকে তুষ্ট করিতে পারিলেন না, দলপতির চোপ্‌দারগণকে গাঁজা খাইবার বক্‌সিস দিবার ক্ষমতা হইল না, পুলিসের ব্যবস্থা হইবার উপায় নাই, সুতরাং সে গরিবকে রক্ষা করে কে?—অবশ্যই তাঁহার জাতি যাইবে!—অবশ্যই তাঁহার নামে মোকদ্দমা হইবে! অবশ্যই তাঁহার ভিটায় পালে পালে ঘুঘু চরিবে!!!

অভক্ষ্য-ভক্ষণ, কুদ্রব্যভোজন, কুপানীয় পান, ইত্যাদি কতকগুলি বিষয় আমাদের হিন্দুশাস্ত্রানুসারে নিষিদ্ধ বলিয়া

উল্লিখিত আছে। অবশ্যই তাহা মহাজনবাক্য বলিয়া সর্ব্বদা পালনীয়। সেকালে এই বিষয়ের বাঁধাবাঁধি—আঁটাআঁটি বেশ ছিল। এখন অত্যন্ত আল্‌গা হইয়া পড়িতেছে। দেশে যখন যবনের আধিপত্য ছিল, তখন আমাদের বাণিজ্যের টাকা, রাজস্বের টাকা,—অন্যবিধ উপায়ের টাকা, সমস্তই দেশে থাকিত; জাহাজে করিয়া ভাসিয়া বিদেশে যাইত না। এখন বিদেশের সহিত সংযোগ হওয়াতে বাণিজ্যদ্রব্যেরও আধিক্য হইয়াছে। সেই আধিক্যের মধ্যে দিন দিন জুয়াচুরীও বাড়িয়া উঠিতেছে। বাজারে যে সকল থানকাপড় চল্লিশ গজ বলিয়া বিক্রীত হয়, থানের উপরেও ইংরাজী অঙ্কে তাহাই অঙ্কিত দৃষ্ট হয়, কিন্তু মাপিয়া লইবার সময় আটত্রিশ গজও পাওয়া যায় না! দশগজা বস্ত্রেও নয় গজ মাত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়! এইপ্রকার প্রবঞ্চনা ব্যতীত আরও অনিষ্টকর প্রবঞ্চনা চলিতেছে! ইংরেজ-আমলে ধর্ম্মনষ্ট হইতেছে। সকলেই বলেন, চিনি, মিছরী, ময়দা, ইত্যাদিতে হাড়ের গুঁড়া মিশ্রিত করা হয়। তদ্দ্বারা দ্রব্যগুণের কোন ব্যাঘাত হয় কি না, সে বিচার না করিলেও হিন্দু উহা অপবিত্র মনে করেন। খাদ্যসামগ্রীর সহিত অন্য কিছু মিশ্রিত করাই পাপ। সম্প্রতি অল্পদিন হইল, কলিকাতা সহরে "ঘি" লইয়া হুলুস্থূল পড়িয়াছিল। দোকান-দারেরা মরাপশুর চর্ব্বি মিশাইয়া "ঘি" বিক্রয় করিতেছে, এই রবটা অনেকদূরপর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। অনেকেই ঘৃত এবং ঘৃতপক্ক দ্রব্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ১২৯৩ সালে অনেক হিন্দুর বাড়ীর দুর্গোৎসবে লুচি হয় নাই। ঘৃতবিদ্রোহটা অত্যন্ত জলিয়া উঠিয়াছিল। যে যাহা খায় না,

যে মনে করে, যাহা খাইলে জাতি যায়, অপরাপর জিনিসের সহিত মিশাইয়া, জোর করিয়া, সেই জিনিস তাহাকে খাওয়াই-তেই হইবে, কোন্ রাজ্যের কোন্ আইনে এমন বিধি আছে? লবণের সহিত অস্থি, চিনির সহিত অস্থি, ঘৃতের সহিত চর্ব্বি, এই তিন বস্তুই যদি অপবিত্র হইল, তবে কেবল ফলমূল ছাড়া হিন্দু সংসারের সমস্ত খাদ্যই নষ্ট হইয়া গেল। গরিব হিন্দু তবে খায় কি? এই এক ঘৃতের হুজুগে এতদূর কাণ্ড হইয়া-ছিল যে, পল্লীগ্রামের স্থানে স্থানে অনেক হিন্দুপরিবারের মধ্যে অনেকদিন পর্য্যন্ত ঘৃত, চিনি, মিঠাই, ইত্যাদি প্রবেশ করিতে পায় নাই! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশুগণকে চাল্‌ভাজা জলপান দেওয়া হইত! ক্ষমবান হিন্দুর আদ্যশ্রাদ্ধের ব্রাহ্মণভোজনে চিড়ে-মুড়্‌কী ব্যবস্থা হইয়াছিল! ইহা অপেক্ষা আরও বেশী আছে! অনেক স্থলে সে বৎসর পূজাই এককালে বন্ধ হইয়াছিল! যাঁহারা শারদীয় মহোৎসবে উত্তম উত্তম দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া, দশজন নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে ভোজন করাইয়া পরিতৃপ্ত হন, ঘৃতাভাবে উত্তম খাদ্য প্রস্তুত হইবে না ভাবিয়া, অগত্যা বিষম মনের দুঃখে তাঁহারা ঐ বৎসর দুর্গোৎসবটী বন্ধ রাখিয়াছিলেন!

কার্‌বারী লোকের কার্‌বারে বেশী লাভ হইবে, সেই খাতিরে কি অতটা প্রতাপ?—সেই খাতিরেই কি হিন্দু-সন্তানের ধর্ম্মোৎসবে ঐপ্রকার মর্ম্মবেদনা দেওয়া বিধিসিদ্ধ ব্যাপার?—প্রকারান্তরে প্রজার ধর্ম্মহানি করা রাজনীতির অনু-মোদিত নহে। কার্‌বারী লোকেরা শুধু কেবল টাকার লোভে ধর্ম্মের সঙ্কোচ সাধন করিয়া বিমিশ্র দ্রব্যাদির ব্যবহার চালায়।

খাদ্যসামগ্রীতে ভেজাল চালানো বিষম অপরাধ!—সেই সকল ভেজাল জিনিসে মনুষ্য শরীরের বিস্তর অনিষ্ট হয়। তাহার উপর ধর্ম্মবিশ্বাসে বিঘ্ন উৎপাদন।

এই সম্বন্ধে বঙ্গের একটী হিন্দুবিধবা সেই সময় বড় একটী উঁচুদরের কথা বলিয়াছিলেন। ঘৃতের হুজুগের গল্প হইতেছিল। গল্পের একটী শাখা স্পর্শ করিয়া সেই বিধবাটী বলিয়াছিলেন, "ডাক্তার বলেন, এ ঘি খাইলে ব্যামো হয় না। ডাক্তার সুখে থাকুন, আমাদের তাহাতে কি?—যে ঘিতে ব্যামো হয় না, সে ঘি আমি খাবো না। আমার ব্যামো হোক্, আমি মরিব;—জাতি খোয়াইব কেন?—ধর্ম্ম খাইব কেন?" বিধবা ত এই কথা বলিয়াছিলেন, বিধবা ছাড়া আর কত লোকে ঐ কথা বলিয়া ঘি খাওয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন?—কথাটা লইয়া সমাজের মধ্যে গণ্ডগোল হইয়াছিল। সমাজের মধ্যেই বা কজন লোকে তাহা মনোযোগ দিয়া শুনিয়াছিলেন?—সময় কৈ?—যাঁহাদের শুনিবার কর্ণ আছে, তাঁহারাই বা কখন শুনিবেন?—তাঁহাদের শুনিবার অবসর কোথায়?

বড় বড় লোকেরা বড় বড় পদ, বড় বড় উপাধি, বড় বড় চাকুরী, এবং বড় বড় টাকার বড় বড় তর্কেই দিবানিশি ব্যাপৃত; সমাজের তুচ্ছ কথায় কাণ দিবার কিম্বা মন দিবার তাঁহাদের সময় নাই। যাঁহারা সৌখীন, তাঁহারা ত বাবুগিরীর দায়েই বিব্রত। যাঁহারা সমাজসংস্কারক, তাঁহারা প্রায়ই হিন্দুধর্ম্ম মানেন না;—প্রায়ই বক্তৃতা লইয়া ব্যস্ত;—যাঁহারা গৃহস্থসন্তান, তাঁহারা সকলেই প্রায় পরের চাকর,—মনিবের কাজের ভাবনা ভাবিতে ভাবিতেই তাঁহাদের মাথা ঘুরিয়া যায়।

গৃহের তণ্ডুলকাষ্ঠের প্রতুলাপ্রতুলের খবর লইতেও তাঁহারা অবকাশ পান না;—নিজের নিজের আহারনিদ্রা বন্ধ করিলে বরং আরও ভাল হয়;—তাঁহারা আবার পুরাতন হিন্দুসমাজের কুট্‌কচালে কারখানা কখনই বা আলোচনা করিবেন? যাহার গলা ধরিয়া কাঁদিব, তাহার চক্ষে জল নাই!!!

সমাজের কথা সমাজের লোককেই বলিতে হয়। সমাজের লোকেরাই কদাচার দূর করিবার ভারপ্রাপ্ত। তাঁহারা এখন সে দিকে ততটা ভ্রূক্ষেপ না করিয়া স্বেচ্ছাচারের দিকেই বেশী চলিতে ভালবাসেন। তবে আর সমাজসংস্কারের মিথ্যা ধুয়াটা সমাজের মধ্যে কেন চলে, সমাজপতিগণের নিকটে আমরা তাহার সন্তোষকর উত্তর প্রত্যাশা করি।

জটাধরের পিতা সংশ্রবদোষে জাতিচ্যুত হইতেছেন, দলপতিগণের কোপে পড়িয়া জালমোকদ্দমাসূত্রে সর্ব্বস্বান্ত হইতেছেন। তখন এ দেশে ইংরেজী পরাক্রম ভাল করিয়া বসে নাই, স্বেচ্ছাচার বড় বেশী ছিল না, তবে কেন অকস্মাৎ আজ এখানে এখনকার হিন্দুর খাদ্যাখাদ্য, ভক্ষ্যাভক্ষ্য, ভেজাল জিনিস, ইত্যাদির বিচার আসিয়া পড়িল?

পড়িবার বিশিষ্ট হেতু আছে। এখনকার লোকে শীঘ্র শীঘ্র জাতি হারায় না, তখনকার লোকে শীঘ্র শীঘ্র জাতি হারাইত। এখন যেন হিন্দুসমাজে অনেকটা ম্লেচ্ছাচার সহিয়া গিয়াছে। ব্যবসাদারেরাও সহাইয়া দিতেছে। সেই কারণেই এখনকার জাতিঘটিত কথা উঠিলেই এখনকার জাতিঘটিত উপমা আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে;—চিন্তা করিয়া সংগ্রহ করিতে হয় না। রাজা ভিন্নধর্ম্মী হইয়াছেন, ব্যবসাদারেরাও

শ্রেষ্ঠাংশে অনিশ্চিত ধর্ম্মাবলম্বী, সামাজিক হিন্দুসন্তানেরাও ইচ্ছামত মতভেদে পাঁচসাত শ্রেণীতে বিভক্ত! জাতীয় বন্ধন বড়ই শিথিল! এই সকল চিন্তা করিয়াই তখনকার জাতি-বিচারের সহিত এখনকার জাতিবিচার সামাজিক অধোগতির দৃষ্টান্তস্থলে বড় দুঃখেই আনিয়া ফেলিতে হয়। গত বৎসরের ঘৃতের ব্যাপারটা আর একটু পরিষ্কার করিয়া এই স্থলে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য হইতেছে।

একজন বহুদর্শী পণ্ডিত বলিয়া গিয়াছেন, "নরনারীর ব্যভিচারের ন্যায় খাদ্য সামগ্রীর ব্যভিচারও সমান দোষাবহ।" এ কথা এখন প্রায় উড়িয়া যাইতেছে! খাদ্যসামগ্রীতে অন্য জিনিস ভেজাল দেওয়ায় অনেক দোষ। প্রথমতঃ অনিষ্টকর জিনিস মিশাইলে শরীরে পীড়া উৎপন্ন করে,—বেশী আনাড়ীর হাতে হইলে প্রাণ নষ্টও করে!—হিন্দুর খাদ্যসামগ্রীতে হাড়, খুর অথবা চর্ব্বি মিশাইলে ধর্ম্মের পবিত্রভাবে বিঘ্ন উৎপাদন করা হয়।—যাহাতে পীড়া হয় না, ধর্ম্মহানি হয় না, খাদ্য দ্রব্যের সহিত এমন দ্রব্য মিশাইলেও স্বাদনষ্ট হয়, গুণ নষ্ট হয়, অপদার্থ হইয়া যায়! খাদ্যসামগ্রীতে অন্য সামগ্রী মিশাইবার যখন এত দোষ, তখন সে বিষয়ে সমাজ যদি কিছুই প্রতিকার করিতে না পারেন, তাহা হইলে অবশ্যই তন্নিবারণে রাজার হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হয়। সেরূপ স্থলে রাজা কোন্ ধর্ম্মে বিশ্বাস রাখেন, তাহার বিচার করিবার প্রয়োজন থাকে না। উদার ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট সে বিষয়ে সর্ব্বদাই সজাগ আছেন।—খাদ্যসামগ্রীতে অনিষ্টকর অন্য সামগ্রী মিশাইলে কি হয়, এখনকার প্রচলিত ফৌজদারী আইনে তাহার পরিষ্কার

বিধি আছে। ব্রিটিসাধিপত্যের ব্যবস্থাপক সভা সে বিষয়ে আমাদের পরমোপকারিণী হিতৈষিণী। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সকল সময়, সকল স্থলে, সকল আদালতে ঠিক ঠিক ব্যবস্থামত ঠিক ঠিক কাজ হয় না। জিনিসে ভেজাল দিলে দণ্ড হয়, ইহা সকলেই জানে; তথাপি অধিকাংশ ব্যবহার্য্য জিনিসেই নানাপ্রকার ভেজাল চালাইয়া, নানাপ্রকার ব্যবসায়ী লোকেরা সচ্ছন্দে প্রকাশ্যরূপে পার পাইয়া যাইতেছে! আইন আছে, দণ্ড আছে, দণ্ডদাতা আছেন, তথাপি সর্ব্বদা পাপীলোকের দণ্ড হয় না! আচ্ছা, তাহাই হউক, পাপীলোকেরা কোন গতিকে দুই একটা পাপের দণ্ড এড়াইয়া যাউক, কথাটা কিছু নিতান্ত মন্দ নহে; কিন্তু সমাজের লোকেরা করেন কি? দেশে হিন্দুরাজা থাকিলে এতাদৃশ ব্যাপারে হুলুস্থূল পড়িয়া যাইত সন্দেহ নাই।—হিন্দুসমাজ কেন সেই ঘৃতবিদ্রোহের সময় সম্ভাবিত হুলুস্থূলে যৎকিঞ্চিৎ ক্ষুদ্রাংশ তেজস্বিতা দেখাইতেও অগ্রসর হইলেন না?

পূর্ব্বকথিত হিন্দুবিধবা যেমন আশানুরূপ তেজোগর্ব্বে বলিয়াছিলেন, "যে ঘিতে ব্যামো হয় না, সে ঘি আমি খাব না!"—দেশের সমস্ত হিন্দু নরনারী যদি সেই ধুয়ায় সমস্বরে প্রতিধ্বনি করিতে পারিতেন, "যে ঘিতে ব্যামো হয় না, সে ঘি আমরা খাব না!"—ঘৃতবিদ্রোহের সময় এক দিন যদি ঐ হিন্দুবিধবা কুলবালার ঐ বাক্যের সমবেত প্রতিধ্বনি বঙ্গগগণ ভেদ করিয়া দেশের মধ্যে উর্চ্চনাদে বিধ্বনিত হইত, তাহা হইলে একদিনেই কি কলিকাতার ঘিয়ের বাজার মাটী হইত না? হিন্দুকুলবালারা তাঁহাদের তৎকালের ব্রতনিয়মাদির

সময় মনের দুঃখে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন, "ঘিয়ে যারা চর্ব্বি দিচ্ছে, তাদের কার্‌বারে আগুন লাগুক!"

"আগুন লাগুক!" কথাটা বড় শক্ত লাগে!—কোন প্রকার কার্‌বারে আগুণ লাগে, কোন সংসারী লোকের কখনই এরূপ ইচ্ছা হইতে পারে না। কিন্তু ধরুন, যদি ঐ হিন্দুবিধবার বাক্যে সকল হিন্দু সমস্বরে সায় দিতেন, তাহা হইলে সে সময়টায় এদেশের ঘিয়ের বাজারে সত্যই কি আগুন লাগিয়া যাইত না? ধরুন, ভারতের পঞ্চবিংশতি কোটির মধ্যে অহিন্দু কত আছেন? আরও ধরুন, অহিন্দুমাত্রেই যে চর্ব্বিপ্রিয়, তাহারই বা প্রমাণ কি? আচ্ছা ধরুন, সমস্ত হিন্দুই যদি সেই সময় দুমাস ছমাস ঘৃতের ব্যবহারটা বন্ধ রাখিতেন, তাহা হইলেও কি দেশের ঘৃতব্যবসায় অক্ষত থাকিত?—আরও ধরুন, কথা উঠিয়াছিল, চর্ব্বির সহিত শূকরের চর্ব্বিও চলিত! সে স্থলে মুসলমানেরাও যদি "যে ঘিতে ব্যামো হয় না, সে ঘি আমরা খাব না" বলিয়া প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক হিন্দুর সহিত যোগদান করিতেন, ভারতের হিন্দুমুসলমান যদি একসঙ্গে মিলিয়া কিছুদিনের জন্য ঘৃত ব্যবহার পরিত্যাগ করিতেন, তাহা হইলে কিছুদিনের জন্য এদেশে ঘৃতের কার্‌বারে যথার্থই কি আগুন লাগিত না? লাগিত। আইনের উপর আইন করিয়া বঙ্গদেশের তখনকার অপ্রতিষ্ঠালব্ধ লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সার রিভার্স টম্‌সন সাহেব সেই আগুনটী জ্বলিয়া উঠিতে দেন নাই।

ঘৃতের উপদ্রবে হিন্দুস্থানীরা বড় ক্লেশ পাইয়াছিল। যাহারা যথার্থ ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ, ঘৃতভিন্ন তাহাদের আর অন্য পুষ্টিকর দ্রব্য আছে, ইহা তাহারা জানে না। ঘিউ যাহাদের জীউ,

ঘিউ নষ্ট হইলে তাহাদের জীউ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। এক-জন ঋষি সেই সময় আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, "সাহেবের তাঁবেদার হিন্দুস্থানীর যদি ঘিউ অভাবে জীউ ক্ষীণ হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যৎ মিশরের, বর্ম্মার, কাবুলের, অথবা (কে জানে!) রুসের যুদ্ধে সর্দ্দার সিপাহী সাজিয়া, সম্মুখ রণক্ষেত্রে কাহারা আর ইংরেজপক্ষকে অভয়দান করিবে?"

ঘৃতবিদ্রোহে অনেকস্থলে অনেক কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। আজিও সর্ব্বত্র সম্পূর্ণরূপে হুজুগ থামে নাই। জটাধরের পিতা এখনকার এপ্রকার ঘি খাইয়া জাত্যন্তর হন নাই। তিনি মুসলমান অপবাদের সংশ্রবদোষে একঘরে হইয়াছেন। এবিষয়ে রাজার কিঞ্চিৎ হস্তক্ষেপ না থাকা কদাচই ভাল নয়। বর্ত্তমান উদাহরণ দেখুন, পার্লিয়ামেণ্টের মেম্বরেরা কিছু স্বহস্তে মরাপশুর হাড় ভাঙ্গিয়া, স্বহস্তে মরাপশুর চর্ব্বি বাহির করিয়া, ঘিচিনিতে মিশাইয়া, এদেশে বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করেন নাই। অথচ ঘৃত-বিদ্রোহের সময় সাক্ষাৎসম্বন্ধে কলিকাতায় এক নূতন আইন জারী করিয়া সেই দুষ্ক্রিয়ার শাস্তিবিধান করিতে হইয়াছিল রাজার সহিত সাক্ষাৎসংশ্রব না থাকিলেও সমাজের উপকারার্থ রাজার মধ্যবর্ত্তী হওয়া নিতান্তই আবশ্যক।

জটাধরের পিতা রাজার সাহায্য কোথায় পাইবেন?—সিরাজ উদ্দৌলার পতনের দশা।—সে সময় "জোর যার, মুলুক তার!" জটাধরের পিতা রাজসাহায্য পাইলেন না। সামাজিক সাহায্য কতদূর পাইলেন, সেটী পাঠকমহাশয়কে বুঝিতে হইবে সমাজের প্রবল লোকেরা তাঁহাকে দুর্ব্বল পাইয়া তাঁহার জাতি মারিয়াছেন, আদালতে মিথ্যা নালিশ রুজু করিয়া দেশত্যাগী

করিবার পন্থা দেখিতেছেন! যে সমাজের প্রধান লোকের এমন বিচার, সে সমাজে জটাধরের পিতার সামাজিক সাহায্য কতদূর লাভ হওয়া সম্ভব, সেটুকু বুঝিয়া লইতে কাহারও বোধ হয় কোন কষ্ট হইবে না।

দ্বারকাদাস সমস্ত ঘটনা শ্রবণ করিলেন। জটাধর ম্লানবদনে সমস্ত ঘটনা শ্রবণ করিলেন।—রক্ষার উপায় কি?—জাতি থাকিবে ত? ইহার উপর মোকদ্দমা! জটাধরের পিতার নামে ফৌজদারীতে নালিশ হইয়াছে, তিনি একখানি জাল রসিদ প্রস্তুত করিয়া শিবানন্দবাবুর পাঁচ শত বারো টাকা উড়াইবার চেষ্টা করিতেছিলেন! দেওয়ানীতে নালিশ হইয়াছে, শিবানন্দ বাবুর তহবিলের খতিকর্জ্জা মায়সুদ পাঁচ শত বারো টাকার দাবী। দ্বিতীয় দেওয়ানী মোকদ্দমা, জটাধরের পিতার ভদ্রাসন বন্ধকী কর্জ্জা মায়সুদ সাত শত তিপ্পান্ন টাকা—আদায় অথবা বাটীদখলের প্রার্থনা। এই মোকদ্দমা তিনটীতে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সর্ব্বনাশ করা দলপতিদলের একান্ত বাসনা! ব্রাহ্মণের ভূমি বিক্রয় করিবেন, ব্রাহ্মণের বাস্তু বিক্রয় করিবেন, সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিবেন, সেই ধনে আপনারা চূণকালী খরিদ করিবেন, ইহাই তাঁহাদের প্রতিজ্ঞা! যেখানে দলপতিদলের এমন দশা, সেখানে সঙ্কটের মোচন চেষ্টা করা অপেক্ষা সঙ্কটের আহ্বান করাই বরং স্বতঃসিদ্ধ। জটাধরের সঙ্কটমোচনের মূলাধার উপায় এখন কেবল টাকা!

টাকা হইলেই জাতি ফিরিয়া আইসে, আদালত হইতে মোকদ্দমা উঠিয়া আইসে, আবার পূর্ব্বের ন্যায় গলা গলা সখ্যভাব ফিরিয়া আইসে! এখন জটাধর টাকা দিতে কাতর নহেন, তবে তাঁহাদের জাতি থাকিবে ত?

বন্ধুকে বিপদমুক্ত করিবার নিমিত্ত মহাশয় দ্বারকাদাস এখন চতুর্দ্দিকেই মুক্তহস্ত। জটাধরের উপকার করিবে বলিয়া যে যাহা চাহিতেছে, মহানুভব দ্বারকাদাস তাহাকেই তাহা প্রদান করিতেছেন।

টাকার কথা কাকের মুখে ছোটে!—দলপতিরা সংবাদ পাইয়াছেন, জটাধর এখন টাকা দিয়া জাতি পাইবার ইচ্ছা করিয়াছে। দলপতিমহাশয়েরা এই শুভসংবাদে মনে মনে সন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন। একটু পূর্ব্বে যে দিকে সম্পূর্ণ ঝোঁক রাখিতেছিলেন, সে দিক হইতে এখন একটু বাঁকিয়া দাঁড়াইলেন!—দস্তুরমত বাঁকিলেন না, কেন না, এমন সকল স্থলে টাকাটা আবার হুহু করিয়া বাড়ে কমে! জটাধরের পিতা জাতি উদ্ধারের জন্য কত টাকা খরচ করিতে পারে, মোকদ্দমা তিনটি রক্ষা করিবার জন্য কত টাকা দিতে সমর্থ, মোটেমাটে আন্দাজটা কত, দলপতিমহাশয়েরা তখন কেবল এই তর্কটাই বেশী করিয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন! কিপ্রকারে জাতি মারিতে হইবে, কিপ্রকারে মোকদ্দমা জিতিয়া দ্বীপান্তরে পাঠাইতে হইবে, সে চিন্তাটা তখন টাকার লোভের আবরণে একটু ঢাকা পড়িয়া গেল! দলপতিদের বৈঠক স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র। এক বৈঠকে একটী দলপতি বসিয়া আছেন, পাঁচ সাতটী অনুগত দলস্থ লোক পার্শ্বে বসিয়া উপাসনা করিতেছে, মধ্যস্থলে কথা উঠিল, "জটাধর বেশ লোক!—জটাধরের কিছুমাত্র দোষ নাই। তাহারা চলিয়া গিয়াছে, বা ব্রাহ্মণ বলিয়া সমাজে চলিতেছে, জটাধর ইহা না জানিয়াই কি তাহাদের বাড়ীতে জলগ্রহণ করিবে? জটাধর তেমন ছেলে নয়!"

সকলেই গোলমাল করিয়া বলিলেন, "জটাধর বেশলোক!" দলপতি খোদ এতক্ষণ নিস্তব্ধ ছিলেন, অবশেষে তিনি একটী দীর্ঘাকার হাই তুলিয়া,বারম্বার তুড়ী দিয়া, গম্ভীরবদনে কহিলেন, "অনেকটা টাকা!—ওঃ!—তা—আর,—দেখ ভাই,—ওঃ! অনেকটা টাকা!" ঢোক্ গিলিয়া কহিলেন, "এটাও একপ্রকার জাঁক্‌জমকের সমন্বয়!"

এই পর্য্যন্ত বলিতে বলিতে দলপতিমহাশয় একটু হাস্য করিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন, "টাকাতেই সব হয়! কে একজন এসেছে দ্বারকাদাস,—সেই না কি নিজেই এবারের সব টাকা নির্ব্বাহ করিবে!"

দলস্থ একজন ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "সেই করুক আর যেই করুক, কোর্‌বে আমাদের জটাধর!—জটাধরের কাছেই আমরা পাব!—কাজ কি আমাদের অতশত বিচারে? এ দিলে, সে দিলে, সে হিসাবে আমাদের প্রয়োজন কি? একজন ব্রাহ্মণের জাতি বাঁচিল, চুপিচুপি আমরাও কিছু পেলেম, বস্ আছে! জানাজানি কেন?"

দলপতি হাস্য করিয়া কহিলেন, "সেই কথাই ত কথা! নচেৎ, নারায়ণ! নারায়ণ!—গরিব ব্রাহ্মণের জাতি মারি, হারাম খাই, এমন ইচ্ছা কি আমার?"

দ্বিতীয় ব্যক্তি অমনি মুখের কথায় সায় দিয়া তৎক্ষণাৎ কহিল, "তাও কি কখনো হয়?"

তৃতীয়, চতুর্থ, ইত্যাদি শ্রেণীগত পারিষদমণ্ডলী সকলেই একসঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, "তাও কি কখনো হয়?"

একজন বক্তৃতা ধরিলেন, "তাও কি কখনো হয়?—ভাবো,

জটাধরের পিতা ধার্ম্মিক লোক, ত্রিসন্ধ্যা করে, পূজা করে, বেশ দানও আছে, ছলনা জানে না, বেশ মানুষ! আমি—”

দলপতি বিরক্ত হইয়া, অর্দ্ধোক্তিতে প্রথম বক্তাকে থামাইয়া নিজেই বলিতে আরম্ভ করিলেন, “তুমি কে?—তোমার কথাই অত হবে কেন?—আমার কথা বল!—আমার ক্ষমতার কথা বল!—আমার পরাক্রমের কথা বল!—দৈবশক্তি!—অদ্ভুত! আমার দৈবশক্তির—”

দলের মধ্য হইতে আর একজন এই স্থলে দলপতিকে নিস্তব্ধ করিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিতে আরম্ভ করিলেন, “কি! সত্যই ত তাই! সকল কথাই এককথা হুজুর!—আমরা যাকে আমরা আমরা বলি, তাহার কিছুতেই আপনি ছাড়া নন!—আপনি আমাদের দলের শিরোমণি!—আপনাকে ছাড়িয়া আমরা কোন্ কাজটাই বা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ?—অথবা কোন্ কথাটাই বা আপনাকে ছাড়িয়া, জোর করিয়া উচ্চারণ করিতে কেই বা আমরা সক্ষম?”

দলপতি তথাপি একটু রাগিয়া বলিলেন, “না-না-না,—এমন হইবে না,—কখনই হইবে না! তোমরা কে?—তোমাদের নাম কেন হবে?—সব আমি!—তোমরা সকলেই আমার নামের দোহাই দিয়া চলিবে!—তোমরা কে? কেউ নও,—আমিই সব!—তবে কেন বৃথা সময় নষ্ট কর?—কথা কহিতে দাও! না দাও, চলিয়া যাও;—চাই না! আমি জটাধরকে লইয়া নূতন সমাজের সৃষ্টি করিব!”

নূতন সমাজের নাম শুনিয়া দলস্থ লোকগুলির মুখ শুকাইল! যাহাকে লইয়া বর্ত্তমান রোজগারের পন্থা, তাহাকে

লইয়াই দলপতিমহাশয় নূতন সমাজ সৃষ্টি করিবেন, পুরাতন দলস্থ লোকের সেই ভয়টাই সর্ব্বাগ্রে প্রবল হইয়া উঠিল!

মোসাহেবেরা খোসামোদ জুড়িয়া দিল; "বাবু আমাদের কতবড় লোক!—বাবুর প্রতাপে বাঘ কাঁপে!—বাবুর অনুগ্রহে কি না হয়?—বাবুর অনুগ্রহেই জটাধরের পিতা—"

আর একজন বলিয়া উঠিল, "আর ধর, বাবুর অনুগ্রহ ত আছেই, তা ছাড়া, জটাধর বড় একটা ছোট খাট ঘরাণা নয়। বড় বংশে জন্ম। বাবু বিদ্যমান থাকিতে তাহাদের জাত মারে, কাহার সাধ্য?

বাবু একটু গম্ভীরভাব ধারণ করিয়া কহিলেন, "ওহে! তোমরা একজন যাও! জটাধরের মহাজনবাবু মোটেমাটে কত টাকা দিবে, সেইটে আগে জানিয়া আইস!—একজন যাও! একজন না হয়, দুজন যাও!"

একজন বলিতেই পাঁচজন উঠিতেছিল, দুজনের নামেও সেই পাঁচজন কোমর বাঁধিয়া ছুটিল।

জটাধরের পিতার সমন্বয় হইবে।—মোকদ্দমাতিনটী উঠাইয়া লওয়া হইবে। জটাধরের পিতার নামে একদিন মহোৎসব হইয়া যাইবে! টাকা দিবেন দ্বারকাদাস!

টাকা দিলেন দ্বারকাদাস।—নিখাদ্ জাতির বাট্টা লাগিল, এক সহস্র মুদ্রা!—দলপতি লইলেন অর্দ্ধেক,—দলপতির বাটীতে ভোজ হইল তাহার সিকিতে,—দলপতির বাটীর লোক-জনেরা বক্‌সিস পাইল কিছু কিছু,—যৎকিঞ্চিৎ যাহা কিছু বাকী রহিল, সমাজের দলস্থ লোকেরা তাহা হারহারিমতে ভাগ করিয়া লইলেন! ভাগের সময় এত অকুলান পড়িয়াছিল যে, কামেশ্বর

বাচস্পতির কন্যার দৌহিত্রীর দক্ষিণাহিসাবে চারি পয়সা দলপতিমহাশয়কে নিজতহবিল হইতে প্রদান করিতে হয়!

রীতিমত সমন্বয় হইয়া গেল। জটাধরের সহিত গ্রামের সকলেরই আবার কোলাকুলি হাসিখুসী চলিতে লাগিল। যাঁহারা টাকার অভাবে শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই এখন হারহারিমতে আধুলি, ছয় আনা, সিকি, অন্ততঃ দুই আনা পর্য্যন্ত উৎকোচ প্রাপ্ত হইয়া, পতিত পাপীর পরমবন্ধু হইয়া উঠিলেন! একত্রে তিনচারি নিশাকালে পতিতোদ্ধৃত জটাধরের স্কন্ধে সেই বন্ধুদলের ইচ্ছাতে পিরীতভোজন নির্ব্বাহিত হইল!—ফৌজদারী মোকদ্দমাটী ফরিয়াদীর গরহাজিরীতে ডিস্‌মিস হইয়া গেল। দেওয়ানী মোকদ্দমাদুটী রফাসূত্রে ধরাও নিষ্পত্তিক্রমে আদালত হইতে উঠিয়া আসিল। গোলমাল সমস্তই চুপ্‌চাপ্‌!

টাকাতেই সব হয়!—জাতিসঙ্কট হইতে জটাধরকে উদ্ধার করিবার ব্রতে সদাশয় দ্বারকাদাসের এক দফা গেল এক সহস্র মুদ্রা,—মোকদ্দমা মিটাইতেও প্রায় দুহাজার,—অপরাপর বিষয়েও বড় কম হইবে না! সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় চারি হাজারের ধাক্কা! এখনকার অজ্ঞ লোকে জানিয়া রাখুক, তখনকার এক একটী হিন্দুর জাতির মূল্য ছিল, অতি কম চারি হাজার টাকা!!!

বন্ধুবৎসল দ্বারকাদাস চারি হাজার টাকা ব্যয় করিয়া বন্ধুকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন। গ্রামের সর্দ্দার দলপতিমহাশয় ঠিক অবসরে দ্বারকাদাসের সহিত আলাপ করিয়া জটাধরের এবং জটাধরের বৃদ্ধ পিতার বিস্তর প্রশংসা জুড়িয়া দিলেন। কহিলেন, "জনকতক ষণ্ডালোকেই জটাধরকে জাত্যন্তর করি-

বার গোলযোগ বাধাইয়াছিল। আমি নই!—জটাধরের পিতার নামে মিথ্যা মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার ভিতরেও আমি না!—মোকদ্দমার কথা আমি জানিও না!”

দ্বারকাদাস মনে মনে হাস্য করিলেন। গ্রামের ভদ্রলোক, দস্তর মত টাকাও আছে;—দস্তরমত টাকাওয়ালাকে আদব্ কায়দা মানিয়া সমাদর করিতে হয়। মুখের সততায় কেনই বা তিনি কৃপণ হইবেন?—দস্তরমত খাতিরযত্ন করিয়া সবিশেষ সম্মানপূর্ব্বক দ্বারকাদাস ঐ দলপতিমহাশয়কে অনেকপ্রকারে বাড়াইয়া তুলিলেন। দলপতিও কহিলেন, “আপনাদের তুল্য মহৎলোক যাঁহাদের সহায়, তাঁহারাও অবশ্য মহৎলোক। জটাধরের পিতা এগ্রামের সকলেরই মান্য,সকলেই তাঁহার কাছে উপকার পায়। অবাধ্যলোকেরা অকারণে তাঁহাকে কষ্ট দেওয়াতে আমিও অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াছি। সেই সকল অবাধ্যলোককে উচিতমত শাসিত করিবার জন্য অবশ্যই আমি চেষ্টা করিব!”

দ্বারকাদাস কহিলেন, “আপনিও মহৎলোক!—একটা উপলক্ষ করিয়া এখানে আসা হইল, আপনাদের তুল্য মহৎ-লোকের চরণদর্শন করিলাম, ইহাই আমার পরমভাগ্য! জটাধর নিরীহ লোক,—জটাধরের শরীরে কোন দোষ নাই;—তাঁহার পিতাও ঋষিতুল্য। এমন নিরীহপরিবারের প্রতি অত্যাচার হইয়াছে, ইহা শুনিয়াই আমার আসা। দেখিলাম, সমস্তই ঠিক। গ্রামের সকলগুলিই ভাললোক। তবে কেন নিরীহ লোকের প্রতি এমন অসম্ভব দৌরাত্ম্য হইয়াছিল, অগ্রে তাহা বুঝিতে পারি নাই। এখন বুঝিলাম, আপনার তুল্য বড়লোকেরা তাহার মধ্যে ছিলেন না;—অনিষ্টকারী দুষ্ট লোকেরাই আপ-

নাদের অমতে,—আপনাদের অজ্ঞাতে,—আপনাদের অবাধ্য হইয়া ঐ অনর্থটা উৎপাদন করিতেছিল!"

"অমনধারা অনেক করে!"—একটু উল্লাসে দলপতিমহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "অমনধারা অনেক করে!—তাহাদের কর্ম্মই ঐ!—কিছুতেই সে সকল গোঁয়ারকে বাধ্য করা যায় না! সকল দেশেই অবাধ লোক থাকে। আমার দেশের অবাধ্য লোক, সকল দেশের সকলের চেয়ে বেশী!" এই পর্য্যন্ত বলিয়া দলপতিমহাশয় ঠিক যেন শক্তিমন্ত্র জপের প্রণালীতে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলীদ্বারা অঙ্গুলীর পর্ব্ব গণনা করিতে আরম্ভ করিলেন। জোর দিয়া দিয়া গণিতে গণিতে কহিলেন, "তাহারা ধরুন, গুলী খায়,—তাহারা ধরুন, গাঁজা খায়,—তাহারা ধরুন, দাঙ্গা করে, তাহারা ধরুন, মৌতাতের দোকানে ঢোল পেটে,—তাহারা ধরুন, বিবাহের বর পাইলে, পয়সার জন্য কাটাছেঁড়া করে,—বিবাহের সভায় মিথ্যা ফঁ্যাসাতে গণ্ডগোল বাধাইয়া গৃহস্থের শুভকর্ম্মে বিলক্ষণ বিঘ্ন জন্মাইয়া দেয়,—মাঝে মাঝে একটু কিছু সূত্র পাইলে (কিম্বা না পাইলেও,) জটাধরের পিতার তুল্য ইষ্টনিষ্ঠ ঐরকম ভালমানুষগুলিকে তাহারা প্রায়ই বৃথা বৃথা ঐরকমে কষ্ট দেয়! আমরা তাহার কিছুই জানি না। শেষকালে জানিতে পারিলে, তৎক্ষণাৎ প্রতীকার করি!"

মনে মনে হাসিয়া দ্বারকাদাস মনে মনে কহিলেন, "এই রকম নিয়মেই প্রতীকার করেন! জটাধরের পিতার প্রতি যেরূপ সুবিচার করা হইল, এইরূপ সুবিচারে প্রতীকার করিলেই ধর্ম্মানুসারে দলপতির কর্ত্তব্যকর্ম্ম সাধন করা হয়!"

দ্বারকাদাস কিছু ভাবিতেছেন, দলপতিমহাশয় সেদিকে

ভ্রূক্ষেপ না করিয়াই আপন মনে বলিয়া যাইতেছেন, "সকল দেশেই অবাধ্যলোক আছে। অবাধ্যকে বাধ্য করিতে আমি যেমন জানি, এমন আর ত্রিভুবনে কেউ জানে না!"

দ্বারকাদাস হাস্য করিলেন না। গম্ভীরবদনেই কহিলেন, "অবাধ্যলোকেরা আপনার কাছে বাধ্য হয়, সুখের বিষয়; কিন্তু কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে বাধ্য হইলেই সবদিক্ ঠাণ্ডা থাকে। শেষকালে বাঁধন খুলিতে গরিবকে আর ততটা নাস্তানাবুদ হইতে হয় না। অবাধ্যলোকে যাহা করে, অবাধ্যলোকেই তাহার জন্য দায়ী; কিন্তু দলপতির মজ্‌লিসে অবাধ্যলোকের দোষে গরিবকেই বেশী প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়!"

দলপতিমহাশয়ের ইচ্ছা ছিল, কথার বাঁধুনীতে দ্বারকাদাসের শরীরকে জল করিয়া যৎকিঞ্চিৎ পুরস্কার লাভ করিবেন। তাঁহার নিজের বে-আদবীর সময় দ্বারকাদাসের একটু একটু উগ্রভাব দর্শন করিয়া দলপতির সে আশাটী একটু মুখমরা খাইয়াছে! তিনি যখন অর্থশূন্য অবাধ্যলোকের কথা তুলিয়া আপনাদের সাফাই প্রমাণ করিবার চেষ্টা পাইলেন, সে সময়ে তাহার ভণ্ডামী দেখিয়া দ্বারকাদাস অত্যন্ত চটিয়াছিলেন। দলপতি টাকা ভালবাসেন, ইত্যগ্রে সেবিষয়টী দ্বারকাদাসের ভালরকমেই জানা হইয়াছে। দলপতির পূর্ব্ব আশাটীও একটু সজীব হইল।—দ্বারকাদাস পাঁচটী টাকা প্রণামী দিয়া দলপতিমহাশয়ের চরণে প্রণাম করিলেন! দলপতির সন্তোষের সীমা নাই!

এই ঘটনার পর দ্বারকাদাস কতদিন বন্ধুগৃহে ছিলেন, জটাধর নিজেই বা কতদিন আপন কর্ম্মস্থলে গমন করেন নাই, তদ্বিষয়ের ঠিক নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না। কোন্ সময়ে

এই আখ্যায়িকার ভবিষ্যৎকল্প অবতারিত হইবে, তাহা এখন কাজেই কিছুদিনের জন্য ভবিষ্যতের গর্ভে অপ্রকাশ রহিল।

জটাধর জাতি পাইলেন,—মোকদ্দমার দায় হইতে অব্যাহতি পাইলেন; সমাজের সকলের সঙ্গে পুনর্ব্বার সদ্ভাব ফিরিয়া আসিল,—সব গোল চুকিয়া গেল!—টাকার জোরে না হয়, এমন কাজ নাই!—জটাধর সচ্ছন্দে সমান সম্ভ্রমে,—বরং আরও কিছু উত্তম সম্ভ্রমে জাতীয় ডঙ্কা বাজাইয়া বসিলেন!

একাদশ কল্প।

পাঁচ বৎসর পরে।

বিধাতার লীলাচক্রে এই পাঁচ বৎসর যেন জলের মত চলিয়া গিয়াছে।—আখ্যায়িকার নায়কনায়িকারা এই পাঁচ বৎসর কাল কে কোথায় কি ভাবে রহিয়াছেন, সন্ধান নাই!

সন্ধান নাই! সন্ধান করিতে হইবে।—সন্ধানের আশু আবশ্যক।—পাটলিপুত্রে কি এক নূতন কাণ্ড হইতেছে, সেই স্থলেই সকলকে সন্ধান করিয়া বাহির করা নিতান্তই আবশ্যক হইবে।

একদিন সন্ধ্যাকাল।—ঠিক সন্ধ্যাকাল নয়, অল্প অল্প আলো আছে।—পাটলিপুত্রের যে স্থলে মহাজনপল্লীর নিকেতন, সেই স্থলের সংলগ্ন একটী উদ্যানে একটী কামিনী। অন্দরের গবাক্ষ

হইতে সেই উদ্যানটী বেশ খোলসা দেখিতে পাওয়া যায়। উদ্যানের একটী বকুলতরুতলে একটী কামিনী।

কামিনী মলিনবসনা,—রুক্ষকেশা,—অত্যন্ত বিষাদিনী। কতক্ষণ দাঁড়াইয়া আছে,—কেহই হয় ত দেখে নাই। হঠাৎ সেই উদ্যানসমীপস্থ অন্দরমহলের একটী কক্ষের গবাক্ষপথে একটী পরমসুন্দরী কামিনী।

গবাক্ষবাসিনী কামিনী সেই তরুতলবাসিনী কামিনীকে দর্শন করিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিতেছেন;--দুঃখিনী বলিয়া তাঁহার হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হইতেছে,—কোথাও কিছু নাই, তিনি যেন চক্ষের জলে ভাসিতেছেন! দয়া হইল। একটী কিঙ্করীর দ্বারা সেই উদ্যানবাসিনীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সে আসিল না;—ইসারা করিয়া বলিয়া দিল, "যাব না।"

গবাক্ষবাসিনী স্বয়ং উদ্যানে আসিয়া সেই তরুতলবাসিনী কামিনীকে যত্নপূর্ব্বক গৃহমধ্যে লইয়া গেলেন।

একটী সুসজ্জিত গৃহে দুটী কামিনী মুখামুখী উপবিষ্টা। একটী যেন রাজরাণী,—একটী যেন কাঙ্গালিনী!—যেটীকে রাজরাণীর তুল্য জ্ঞান হইতেছে, সেটীর কিন্তু ঘৃণা নাই; অভিন্নভাবেই সেই রাজরাণীটী ঐ কাঙ্গালিনীর সঙ্গে মুখামুখী বসিয়াছেন।

যাঁহাকে রাজরাণী বলা হইতেছে, যতক্ষণ পরিচয় না হয়, ততক্ষণ তাঁহাকে রাজরাণীই বলা যাউক। রাজরাণী সেই কাঙ্গালিনীকে সম্বোধন করিয়া সমাদরে কত কথাই বলিতেছেন, কত প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কাঙ্গালিনী একটীও কথা কহে না। কেবল চক্ষের জলে ভাসে, আর হাতমুখ নাড়ে!

রাজরাণী বুঝিলেন, এ কোন ভদ্রলোকের মেয়ে,—মনের বিকারে কোন কারণে গৃহত্যাগিনী ভিকারিণী হইয়াছে, মনের দুঃখে মানুষের কাছে কথা কহে না। রাজরাণী আরও আদর-যত্ন করিয়া, আরও অধিক সস্নেহবচনে ভিকারিণীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। কিছুই উত্তর পাইলেন না। কেবল সেই প্রকার ঠারে ঠোরে ইসারা।

রাজরাণী অবশেষে বুঝিলেন, বোবা!—আরও একটু সূক্ষ্ম করিয়া বুঝিলেন, বোবা বলিয়াই ভিকারিণী!—বাড়ীতে রাখিয়া দিবার জন্য আকিঞ্চন হইল, ইঙ্গিতে তাহা জানাইলেন, বোবা তাহা বুঝিল কি না বুঝিল, বোবাই জানিল,কিন্তু রাজরাণী তাহাকে গন্ধতৈলে স্নান করাইয়া, নূতন কাপড় পরাইয়া, কপালে নূতন সিন্দূর দিয়া, সুন্দরী সাজাইয়া লইলেন। ভিকারিণীকে পরমসুন্দরী দেখাইতে লাগিল।

ইসারা চলিতেছে।—ঘন ঘন চক্ষু টানা, ঘন ঘন মস্তক-সঞ্চালন, ঘন ঘন ভিকারিণীর বক্ষস্পর্শ, ঘন ঘন ললাটস্পর্শ, ঘন ঘন উভয়েরই অঙ্গুলীক্রীড়া প্রদর্শিত হইতেছে।

অকস্মাৎ এই অবকাশে কি মনে করিয়া, ভিকারিণী চকিত-নয়নে রাজরাণীর মুখপানে চাহিয়া দেখিল।—অকস্মাৎ কি যেন মনে পড়িল। ভিকারিণী আপনার কাপড়ের ভিতর হইতে একখানি পত্রিকা বাহির করিয়া রাজরাণীর হস্তে প্রদান করিল। পুরাতন বস্ত্র পরিবর্ত্তনের সময় ঐ পত্রিকাখানির কথাটী ভিকা-রিণী বিস্মৃত হয় নাই। পুরাতন বস্ত্র হইতে বাহির করিয়া নূতন বস্ত্রের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। নূতন বস্ত্র হইতেই এখন বাহির করিয়া লইয়া রাজরাণীর হস্তে সমর্পণ করিল।

পত্রিকা দর্শনেই রাজরাণী বিস্ময়াপন্না!—অক্ষরগুলি দেখেন, আর বিস্মিত হইয়া উঠেন!—দুবার তিনবার করিয়া আগাগোড়া সমস্তই পড়িলেন;—পড়িবার সময় বারংবার শিহরিয়া শিহরিয়া উঠিলেন;—বারম্বার ভিকারিণীর বদনপানে চাহিলেন;—পত্রিকায় যাহা যাহা লেখা ছিল, রাজরাণী তাহার যেন অনেকদূর পর্য্যন্ত টানে টানে বুঝিয়া লইলেন।

পূর্ব্বেই ভিকারিণীকে বাটীতে আশ্রয় দিবার জন্য রাজরাণীর আকিঞ্চন হইয়াছিল; শুধুমাত্র করুণা ভিন্ন উপস্থিতমত অন্যান্য প্রবল কারণে এখন আবার সেই আকিঞ্চন আরও অনেকগুণে বেশী হইয়া উঠিল। থাকিবার জন্য ভিকারিণীকে পুনঃপুন বিশেষ করিয়া অনুরোধ করা হইল। ভিকারিণী এদিক ওদিক, কোন দিকেই মাথা নাড়িল না।

পত্রিকা দেখিয়া রাজরাণী কি বুঝিলেন, ভিকারিণীর কাছে কোন ইঙ্গিতেই তাহা প্রকাশ করিলেন না;—অথচ একসঙ্গে থাকাই একান্ত বাঞ্ছনীয় মনে করিলেন।

ভিকারিণী কতপ্রকার ভঙ্গীদ্বারা কতপ্রকার ভাব জানাইল, রাজরাণী হয় ত তাহার চৌদ্দ আনাই বুঝিতে পারিলেন না!—একটী ইঙ্গিত বুঝিলেন, থাকিতে ভিকারিণীর ইচ্ছা আছে, কিন্তু এক বাড়ীতে থাকিতে ইচ্ছা নাই।—ভিকারিণী একাকিনী একটী নির্জ্জন বাটীতে থাকিতে চায়।

রাজরাণী তাহাই সৎপরামর্শ বুঝিলেন।—বাটী হইতে প্রায় তিনরসী দূরে ক্ষুদ্র একটী উদ্যান।—সেই উদ্যানে ক্ষুদ্র একটী বৈঠকখানা, সেই বৈঠকখানাতেই ভিকারিণীকে থাকিতে দেওয়া হইল।—ভিকারিণী যেমন করিয়া থাকে, তেমন করিয়া

থাকিতে দেওয়া হইল না,—রাজরাণী সেই ভিকারিণীর জন্য প্রয়োজনমত দাসদাসী নিযুক্ত করিয়া দিলেন। ইসারায় কথা থাকিল, গৃহস্বামী যখন গৃহে আসিবেন, সে সময় ভিকারিণীকে তাঁহার সম্মুখে বাহির হইতে দেওয়া হইবে না।

এই ত নূতন উদ্যানের বন্দোবস্ত ;—ভিকারিণী সেই উদ্যানেই বাস করিতে লাগিল। রাজরাণী প্রতিদিন বৈকালে ভিকারিণীকে দেখিতে যান,—সন্ধ্যাপর্য্যন্ত থাকেন,—এক একদিন সন্ধ্যার পর দুই চারি দণ্ড বেশীও হইয়া যায় ;—বেশ আমোদে আমোদে থাকেন,—ভিকারিণীর সঙ্গে কথা চলে না,—বেশ সকৌতুক ঠারাঠারি চলে,—দাসীচাকরের প্রতি ভিকারিণীর পরিচর্য্যার জন্য কতই ভাল ভাল নূতন নূতন আদেশ হয়, তাহার পর রাজরাণী আপনার শয়নমহলে ফিরিয়া যান। ভিকারিণীর সঙ্গে আহারের সময় দেখা হয় না। কাহারই হয় না।—ভিকারিণী যখন আহার করে, রাজরাণী তাহা দেখেন না ;—রাজরাণী যখন আহার করেন, ভিকারিণী তাহা দেখে না। এই রকমেই দিন যায় !

ভিকারিণী মধ্যে মধ্যে ইসারায় রাজরাণীর অনুমতি লইয়া, একজন দাসী সঙ্গে করিয়া, হপ্তান্তে, অথবা পক্ষান্তে স্থানান্তরে গমন করে। কোথায় যায়, কাহাকেও জানিতে দেয় না। সহচরীকেও প্রকাশ করিতে নিষেধ করে। যায়, আবার ফিরিয়া আসে।—হায়, আবার পাটলিপুত্রকে মনে করিয়া কাঙ্গালিনী যেন উন্মাদিনীর ন্যায় ফিরিয়া আসে !

আবার প্রায় পাঁচসাত মাস গেল। ভিকারিণী কেবল খায় আর থাকে।—মাঝে মাঝে সহচরী সঙ্গে করিয়া হাওয়া

বদ্‌লায়!—কোথায় আছে,—কেন আছে,—কাহার অপেক্ষা করে, ভিকারিণী তাহা ভাবে কি না, সে কথা আমরা জানি না। রকম দেখিয়া বোধ হয়, ভাবে না!

ভিকারিণী যে পত্রিকাখানি রাজরাণীর হস্তে অর্পণ করিয়াছিল, রাজরাণী সেখানি আর প্রত্যর্পণ করেন নাই। ভিকারিণীও চাহিয়া লয় নাই। আছে ত আছে, ভালই আছে!

ভিকারিণীর পাটলিপুত্রে আগমনের দিন হইতে ৫। ৭ মাস অতীত হইয়াছে। এত দিনের মধ্যে কোন নূতন সংযোগ হইল না।—যাঁহার বাটীতে আছে, তাঁহার সঙ্গেও সাক্ষাৎ হইল না। স্ত্রীলোকের দ্বারা স্ত্রীলোকের আদর-অভ্যর্থনা হইতেছে, কথা অবশ্যই ভাল; কিন্তু গৃহস্বামী ইহা জানিতে পারিলে কতই সুখের বিষয় হয়, তাহা ভিকারিণীই মনে মনে বুঝিতে পারিতেছে।

কথা পড়িলেই এখনকার কথা মনে আসে।—এই যে আতিথ্যব্রতটী, একালে ইহার আদর কমিয়াছে। এই যে এক জন মহাজনের বাটীর কুলাঙ্গনা সাহস করিয়া, একজন অপরিচিতা ভিকারিণীকে উদ্যানভবনে বাসা দিয়া সদয় আতিথ্য-ব্রতের সুন্দর পরিচয় দিতেছেন, গৃহস্বামী যদি মানুষ হন, তাহা হইলে প্রত্যাগত হইয়া এই অতিথিসেবা দর্শন করিয়া কুলবালার প্রতি কতই তুষ্ট হইবেন। গৃহস্বামী যদি মানুষ না হইয়া গাধা হন, তাহা হইলে দয়াময়ী হিন্দুকুলবালাকে যারপরনাই লাঞ্ছনা করিবেন! অনাথিনী ভিকারিণীটীকে হয় ত উদ্যান হইতে বাহির করিয়া দিবেন। গৃহস্বামীর ইচ্ছা থাকিলেই গৃহস্থের গৃহে অতিথির আগমন হয়।—সংসারে গৃহস্থালীর সুপ্রণালী

থাকিলেই বাটীতে অতিথির আগমন হয়। যেখানে ভক্তি, যেখানে মর্য্যাদা, যেখানে সাধুভাব, সেইখানেই সাধু অতিথি। হিন্দুর অতিথিসেবায় বিমল আনন্দ। যিনি সেবা করেন, তাঁহারও আনন্দ,—যাঁহার সেবা হয়, তিনিও আনন্দিত।

এখানে গৃহস্বামী উপস্থিত নাই, গৃহস্বামিনী ভক্তিভাবে অতিথিসেবা করিতেছেন। স্বামী যদি গৃহে আসিয়া ইহা দেখিয়া চটিয়া যান, তাহা হইলে ভিকারিণীকে শীঘ্র শীঘ্র সরাইয়া দিতে হইবে! আহা!—বোবা বড়ই দুঃখিনী! কত যে কি ভাবে, কিছুই ফুটিতে পারে না! এমন দুঃখিনীকে যদি কেহ কিছু অপমানের কথা বলে, তাহা হইলে বড়ই কষ্টের বিষয় হইবে। গৃহস্বামী আসিলে অগ্রে তাঁহার মনের ভাব জানিয়া, তাহার পর ভিকারিণীকে ঐ উদ্যানে রাখা না রাখার বন্দোবস্ত করিবার অন্য কথা।

পাঁচ বৎসর পরে কোথাকার এ বোবামেয়ে পাটনাসহরে আসিয়াছে?—যাঁহার বাটীতে আসিয়াছে, তিনিও ত বাটীতে নাই। স্ত্রীলোকে যাহা করিতেছে, পুরুষ তাহা ভালর দিকে অথবা মন্দের দিকে লইবেন, পুরুষ উপস্থিত না থাকিলে তাহাই বা কে বলিবে? একটী আশ্রয়বিহীনা ভিকারিণী একজন বড়-মানুষের বাটীতে আশ্রয় পাইয়াছে, আহ্লাদের কথা বটে, কিন্তু গৃহস্বামী উপস্থিত না থাকিলে সে আহ্লাদটুকু যেন অকত পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় না।

পাঁচ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে।—পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে এই ভিকারিণীর সঙ্গে আর কোথাও সাক্ষাৎ হইয়াছিল কি না, পাঠকমহাশয়েরা যদি ভ্রান্তিক্রমে সে কথাটী জানিতে চাহেন,

তাহা হইলে আমরা অনিচ্ছাসত্তেও বলিয়া দিব, এই সেই অভাগিনী বনবালা!

অভাগিনী বনবালা এই পাঁচবৎসরকাল কিকরিয়া বেড়াইতেছে, কোথায় কোথায় ঘুরিতেছে, কি অভিপ্রায়ে এক স্থান ছাড়িয়া অন্য স্থানে ছুটিয়া যাইতেছে, বোবামেয়ের এসকল মনের কথা কেই বা বাহির করিয়া লইবে?

বনবালা পাটলিপুত্রে রহিয়াছে। অপরিচিত সহরের, অপরিচিত গৃহস্থের অনুগ্রহে অপরিচিত বাসভবনে বনবালা এখন বাস করিতেছে। এমন সুন্দর মনোরম হর্ম্ম্যে বাস করা বনবাসিনী বনবালার জীবনে বোধ হয় আর কখনো ঘটে নাই!

বনবালা কি ঐ মনোরম হর্ম্ম্যে বাস করিয়া সুখে আছে? না, বনবালা সুখে নাই!—বনবালা কেবল ভাবে, আর কাঁদে! যখন একাকিনী হয়, তখনি তাহার কপোলদেশ করতলে,—তখনি তাহার নেত্রপুট অশ্রুপূর্ণ,—তখনি তাহার সর্ব্বশরীর অবসন্ন। নয়নরঞ্জন সুসজ্জিত গৃহে বাস করিয়া বনবালা সুখী হয় নাই! বনবালা আমাদের যে দুঃখিনী, সেই দুঃখিনী!

বনবালা কি ভাবে, কেন কাঁদে, বনবালা ত সে কথা বলিতে পারে না। দুঃখের নাটকের এই অঙ্কটাই ভারি কঠিন!

একপ্রকার অবধারিত হইয়া গিয়াছে, পৃথিবীতে সুখ নাই! কোন না কোন প্রকারে পৃথিবীর মনুষ্যমাত্রেই অসুখী।—বাহ্য দর্শনে কোন অভাব না দেখিলেও, কোন না কোন বিষয়ে সেই আনুমানিক অভাবশূন্য মনুষ্য অবশ্যই মনে মনে অসুখী! আবার পরিষ্কার করিয়া বলা যাউক, পৃথিবীতে সুখ নাই!—পৃথিবীর মনুষ্যমাত্রেই অসুখী!—এখন বিবেচনা করিতে হইবে,

অসুখী মনুষ্য যদি তাহার স্বজাতীয় অসুখী মনুষ্যকে আপন অসুখের কারণ প্রকাশ করিয়া বলে, তাহা হইলে কোন না কোন প্রকারে হয় ত সে অসুখটীর সম্ভবমত প্রতীকার হওয়া মানুষের সাধ্যায়ত্ত হয়। এখানে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত!—সম্পূর্ণ নিরাশা! বনবালা কেবল কাঁদে আর ভাবে! প্রকাশ করিয়া কাঁহাকেও কিছু বলিতে পারে না!

কষ্টের উপর এটী আবার শতসহস্রগুণ বেশী কষ্ট!—এ কষ্ট কেবল এক পক্ষেই সীমাবদ্ধ নহে। যে ভোগে, যে দেখে, যে শোনে, এই তিন পক্ষই বুকের ভিতর আঘাত পায়! (যাঁহাদের বুক আছে, তাঁহারাই বুকে আঘাত পান। যাহাদের বুক নাই, তাহারা এ কথা বুঝিবে না!) এখানে কাহার কাহার বুকে আঘাত লাগে, তাহা ঐ দুঃখিনী বনবালাকে দেখিলেই অতি পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারা যাইবে।

বনবালা অসুখী!—সেই অসুখে কাঁদে আর ভাবে!—অসুখের কারণ কি, প্রকাশ করিয়া বলিবার শক্তি নাই! কপালক্রমে শিশুকাল হইতেই বিধাতা তাহাকে কোন কথা প্রকাশ করিবার শক্তি হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন!

বনবালা কতদিন পাটনাসহরে এক অজ্ঞাত নিকেতনে বাস করিতেছে, গৃহস্বামী গৃহে আসিলেন না!—বনবালা ভাবে, গৃহস্বামীর সঙ্গে বুঝি দেখা হইল না!—গৃহস্বামীটী কে, বনবালা তাহা মনে মনে জানে;—জানিয়াই বনবালা ভাবে, নিতান্ত অপরিচিত স্থানে আইসে নাই।

গৃহস্বামীর নাম কি?—বনবালা তাহা জানে না!—বনবালা তাহা বলিতে পারিবে না। সেই নামটী আমরাও শুনিয়াছি।

গৃহস্বামীর নাম দ্বারকাদাস।—যে বাটীতে রাজরাণীর দ্বারা আহূতা হইয়া ভিকারিণী বনবালা সর্ব্বপ্রথমে প্রবেশ করে, সেই বাটীখানি দ্বারকাদাসের বাটী।—যে উদ্যানে বনবালা বাস করিতেছে, সে উদ্যানটীও দ্বারকাদাসের উদ্যান।

দ্বারকাদাসের কি প্রকার আকৃতি, বনবালা তাহা জানে, সেই আকৃতির এই বাটী,—সেই আকৃতির এই উদ্যান, ইহাও বনবালা জানিয়াছে; কেবল নামটী জানিতে পারে নাই! শুনিতে পায় না বলিয়াই নাম শিখিতে পারে নাই!—শুনিতে পাইলে কাঙ্গালিনী বনবালা সে নামটী সর্ব্বদা ভক্তিভাবে কণ্ঠমালা করিয়া রাখিত! বিধাতা তাহাকে শুনিবার শক্তিতে বঞ্চিতা করিয়া, আশ্রয়দাতার নামটী জানিতেও অভাগিনীকে বঞ্চিতা রাখিয়াছেন! দ্বারকাদাসকে বনবালার এখনকার আশ্রয়দাতা কেন বলা হইতেছে, তাহা পাঠকমহাশয় অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন। দ্বারকাদাস সদাশয়, চিত্ত অতি উদার। অতি সদাশয় মহাশয় যুবাপুরুষ;—তাঁহার হৃদয় অতিমহৎ; পরের দুঃখ দেখিলে তাঁহার হৃদয় আর্দ্র হয়; তিনি গৃহে থাকিলেও দুঃখিনী ভিকারিণী বনবালা বরং আরও অধিক যত্নে তাঁহার নিকেতনে আশ্রয়প্রাপ্ত হইত। তৎপরিবর্ত্তে রাজরাণীর দ্বারা সেই মহৎব্রতটী পরিপালিত হইয়াছে। সমান কথা।—এই রাজরাণীকে লইয়া দ্বারকাদাস প্রকৃত একজন লক্ষ্মীমন্তপুরুষ হইয়াছেন!—ঐ রাজরাণীই মহাশয় দ্বারকাদাসের দ্বিতীয়া সহধর্ম্মিণী;—ইঁহারই নাম যোগমায়া।

যোগমায়াকে এতক্ষণ রাজরাণী বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইতেছিল, দ্বারকাদাস কি তবে রাজা?

দ্বারকাদাস রাজা নহেন,—রাজতুল্য সম্ভ্রম রাখেন। রূপেও তাঁহার রাজসৌভাগ্যের নিদর্শন আছে।—কার্য্যেও যথাশক্তি রাজবদান্যতার আদর্শ দেখান! মহৎলোক!—অল্প বয়সে পরমধার্ম্মিক,—পরমপণ্ডিত। সকলেই বলেন, তাঁহাকে রাজা বলিয়া তাঁহার পত্নী যোগমায়াদেবীকে রাজরাণীর সম্মান দান করা অবশ্যই উচিত। যোগমায়াদেবীর শরীরেও অত গুণ!

যাঁহারা বলেন, তাঁহারা হয় ত উচিত কথাই বলেন। পাঠক মহাশয় স্মরণ করিবেন, হুগ্‌লীর হরিণবাড়ী গ্রামের নবাব রামহরি মুখোপাধ্যায়ের কন্যা এই যোগমায়াদেবী। মহাশয় দ্বারকাদাস ইহাঁকে দ্বিতীয়পক্ষে বিবাহ করিয়াছেন। যোগমায়ার হস্তরেখা দর্শনে সামুদ্রিকশাস্ত্রজ্ঞ গণকপণ্ডিতেরা বলিয়াছিলেন, "এ মেয়ে রাজরাণী হবে!"—যোগমায়ার ভাগ্যে সেই সকল দৈবজ্ঞের বাক্যই সত্য হইয়াছে।

বনবালার পত্রিকাদর্শনে যোগমায়াদেবী কতক কতক পরিচয় পাইয়াছেন। ডুব দিয়া অন্বেষণ করিলে সমস্তই প্রাপ্ত হইতে পারিতেন। স্ত্রীলোক,—ততদূর পারিয়া উঠেন নাই। স্থূল স্থূল জানিয়াছেন মাত্র। যোগমায়ার জ্যেষ্ঠা সপত্নী ভবরঞ্জিকা দেবী বনবালার কিছুই বৃত্তান্ত জানিতে পারেন নাই। বনবালা আছে,এই পর্য্যন্তই তিনি জানেন। মধ্যে মধ্যে যোগমায়ার সঙ্গে এক একদিন সন্ধ্যাকালে বেড়াইতে গিয়া, বনবালাকে দেখিয়াও আসিয়াছেন। বনবালা কে, কি বৃত্তান্ত, কেন রহিয়াছে, ভবরঞ্জিকা তাহার কিছুই জানেন না। ভবরঞ্জিকাও পরমদয়াবতী কামিনী।—ইহাঁর চরিত্রের বিষয় পূর্ব্বকল্পে যৎকিঞ্চিৎ বিবৃত হইয়াছে। যোগমায়ার সহিত ভবরঞ্জিকার গলাগলা ভাব!

বিবাহের পর হইতে এপর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরকাল দুটীতে ঠিক যেন স্নেহযত্নে সহোদরা ভাব!—সেদুটী ছবিতে সপত্নীভাবের লেশমাত্রও পরিলক্ষিত হয় না!—গলাগলা ভাব!

এত ভাব, তথাপি যোগমায়াদেবী বনবালার পরিচয়ের কথা একটীও ভবরঙ্গিকার কাছে ভাঙ্গেন নাই। ভবরঙ্গিকা জানেন, বিদেশিনী,—সকলে জানে ভিকারিণী,—যোগমায়া জানেন, অভাগিনী বনবালা!

গৃহস্বামী গৃহে আসিলেন। কথা যখন পূর্ব্বেই ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে, তখন এক্ষেত্রে গৃহস্বামীর নাম ধরিয়া ডাকাই ভাল।—পুণ্য হইবে।—দ্বারকাদাস গৃহে আসিলেন। আনন্দ পড়িয়া গেল! বনবালা কিছুই জানিল না! লোকের কলরব তাহার কাণে যায় না, কিসেই বা কি বুঝিবে? উৎসব একটু থামিয়া গেল; উভয় পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দ্বারকাদাস বহির্ব্বাটীতে গমন করিলেন। যোগমায়াদেবীর মন তর্কিয়া গেল। তিনি যেন অত্যন্ত চঞ্চলা হইয়া উঠিলেন। চঞ্চলচরণে চঞ্চলভাবে ভবরঙ্গিকার নিকটে গমন করিয়া, চঞ্চলস্বরে বলিতে লাগিলেন, "দিদি! বনবালাকে দেখাবো!—আজিই দেখাবো!—দেরি করা ভাল নয়!—আজিই দেখাবো!"

ভবরঙ্গিকা সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বনবালা কার নাম?"—যোগমায়া গম্ভীরবদনে উত্তর করিলেন, "যেটীকে তোমরা ভিকারিণী মনে কর, সেই বোবামেয়েটীর নাম।"

"ভিকারিণীর নাম বনবালা?"

"হাঁ!"

"কাহাকে দেখাবে?"

"কেন?—যাঁহার গৃহ,—যাঁহার—বাগান, যাঁহার বিলাস-গৃহ, তাঁহাকে দেখাবো।"

"কর্ত্তাকে?"

যোগমায়া হাসিয়া ঢলিয়া পড়িলেন।—মুখখানি ঘুরাইয়া বক্রভাবে উঠিয়া বসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন, "ঐ ফাঁদেই ত ধরি!—দিদির আমাদের "কর্ত্তা" কথাটীর উপর ভারি টান!—অত করিয়া বুঝাইতেছি, বনবালাকে দেখাবো বলিতেছি, যাঁহার বাড়ী, যাঁহার ঘর, তাঁহাকেই দেখাবো, এটা পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া দিতেছি, তথাপি, দিদির আমাদের কেমন পণ, যতক্ষণ পর্য্যন্ত "কর্ত্তা" কথাটী আমার মুখে না শুনিবেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত যেন ন্যাকা!—সমস্তই বুঝাইতেছি,—সমস্তই বুঝিতে-ছেন, তথাপি কেমন টান, "কর্ত্তা" কথাটী না শুনিলে কাণও জুড়ায় না, প্রাণও জুড়ায় না!"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া যোগমায়াদেবী আবার খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। দিদিটীও যোগমায়ার হাসিকে তিরস্কার করিয়া আপনি একটু অভিমানের হাসি হাসিলেন।—অভিমান করিয়া যোগমায়াকেও তিরস্কার করিলেন।—যোগমায়া চুপ করিলেন না। আমোদের সময় পাইলেই তিনি ভবরঙ্গিকার সঙ্গে অকপটহৃদয়ে আমোদের লড়াই করেন!—ভবরঙ্গিকাও তাদৃশী ভক্তিবিনিময়ে তাদৃশ স্নেহে যোগমায়ার সহিত আহ্লাদ আমোদে কাল কাটাইতে ভালবাসেন। যোগমায়া হাস্য করিয়া কহিলেন, "ধন্য ভালবাসা দিদি তোমাদের!—দেবেরও যেমন, দেবীরও তেমন!—ধন্য!"

দিনমান কাটিয়া গেল। দ্বারকাদাস বাটীর ভিতর আসিলেন না।

শ্রীমতী যোগমায়াদেবী বনবালাকে দেখাইবার আয়োজন করিতেছেন। কি আয়োজন, তিনিই জানেন।—সন্ধ্যা হইল, মেঘ উঠিল। দ্বারকাদাস যেন অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন।

পতিকে পরিশ্রান্ত দর্শনে কিঙ্করীগণের অগ্রে ভবরঞ্জিকা এবং যোগমায়া উভয়েই দ্রুত তাঁহার শয়নগৃহে প্রবেশিলেন। ববিধপ্রকারে শুশ্রূষা ও সান্ত্বনা করিয়া অনেকদূর শান্ত করিলেন। বহুশ্রমের কারণ এবং অতদূর অবসন্নতার প্রকৃত হেতু জিজ্ঞাসা করিলে, দ্বারকাদাস যেন অধিক অবসন্ন হইবার উপক্রম দেখান।—এব্যাধির চিকিৎসা হইবার উপায় নাই!

যোগমায়া ভাবিলেন, এই সময়ে বনবালা দেখাইলে বোধ হয়, অনেকটা আরাম পাইতে পারেন। ভবরঞ্জিকার দিকে সঙ্কেত করিয়া চক্ষু টিপিলেন। আবার মনে মনে ভাবিলেন, "অগ্রে দেখা করানো ভাল, কিম্বা অগ্রে সেই পত্রখানি পাঠ করিতে দেওয়া ভাল?"

পত্রের কথা আর কেহই জানেন না।—জানেন কেবল যোগমায়া আর বনবালা।—যাঁহাকে এখন সেই পত্রখানি দেখাইবার ভাবনা যোগমায়ার হৃদয়ে সমুদিত হইতেছে, তিনি এখন সেই পত্রখানি চিনিবেন কি না, তাঁহারই মানসের উপর তাহা নির্ভর করিতেছে। যোগমায়া আবার ভাবিলেন, "অগ্রে দেখা-করানই ভাল,—অগ্রে পত্রখানি তাঁহাকে না দেখানই ভাল।" আমরাও বলি, ভাল!

দ্বারকাদাস একটু সুস্থির হইয়া উপবেশন করিলে পর যোগমায়াদেবী করুণস্বরে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—ভবরঞ্জিকা

শুনিতে লাগিলেন, দ্বারকাদাস নিজেও অন্যমনস্ক না হইয়া স্থির-কর্ণে যোগমায়ার সমস্ত কথাগুলি শ্রবণ করিলেন।

যোগমায়া কহিলেন, "বড় এক আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়াছে! একটী ভিকারিণী আসিয়াছে!"

হাস্য করিয়া দ্বারকাদাস কহিলেন, "ভিকারিণী আসিয়াছে, ইহার অধিক আশ্চর্য্য ঘটনা পৃথিবীতে আর হইতেই পারে না!"

ভবরঙ্গিকা হাসিতে লাগিলেন।—হাস্য করিয়া যোগমায়া-দেবী কহিলেন, "শোনো আগে, তাহার পর বিচার হইবে, আশ্চর্য্য কি নয়!—সেই ভিকারিণীকে আমি রাখিয়াছি!—ভিকারিণী পৃথিবীর নরলোকের সঙ্গে কথা কয় না!—কেমন,—এ কাণ্ডটা আপনার বিচারে আশ্চর্য্যকাণ্ড বলিয়া বোধ হইবে কি না? সেই আশ্চর্য্য ভিকারিণী আকার ইঙ্গিতে সমস্ত কথাই বুঝিতে পারে,—যতদূর সাধ্য, সমস্ত কথাও বুঝাইতে পারে।—দেখিতেই এক চমৎকার!—রূপখানিও চমৎকার! চলুন,—যদি আর বেশী শ্রান্তিবোধ না থাকে, একটু সন্ধ্যাকালের বাতাসে পদব্রজেই চলুন। আমরাও পদব্রজে যাইতেছি।—চলুন! বনবালা দেখিবেন।"

পৃথিবীর নরলোকের সঙ্গে কথা কয় না, নাম আবার বনবালা, এই দুই কথা শুনিয়াই দ্বারকাদাসের মুণ্ডু ঘুরিয়া গেল! কোথায় আছেন,—কি করিতেছেন,—কাহার সঙ্গে কথা কহিতেছেন, কিছুই মনে রহিল না। রোমাঞ্চিত-কলেবরে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কৈ আমা—কৈ?—কৈ, বনবালা কৈ?"

"বনবালা এ ঘরে নাই!"—মৃদু হাসিয়া যোগমায়া কহিলেন, "বনবালা এ ঘরে নাই!—আমি তাহাকে বাগানবাড়ীতে

রাখিয়াছি। পদব্রজে যাইতে যদি কষ্টবোধ হয়, অনুমতি করুন, অশ্বের আয়োজন হউক।"

দ্বারকাদাস কহিলেন,"অশ্ব প্রয়োজন হইত না, চলিতে পারিতাম; কিন্তু আমি যাইব না।—বনবালা দেখিব না!"—এই শেষ কথাগুলি যেন কতই হতাশের সহিত উচ্চারিত হইল। বুদ্ধিমতী যোগমায়া তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন। গম্ভীরভাব ধারণ করিয়া তিনি পুনর্ব্বার কহিলেন, "আপনি চলুন,—বনবালা বেশ ভালমানুষ!—মারে না, ধরে না, কামড়ায় না, কিছুই করে না, বেশ ভালমানুষ!—ভয় কি?—আপনি চলুন!—আমোদ পাইবেন!—বনবালাটী দিব্য সুশ্রী!—ঠিক যেন আকাশপথের একটী ফুট্‌ফুটে পরী!"

মেঘ উঠিয়াছিল, উড়িয়া গেল।—দিব্য জ্যোৎস্না ফুটিল। ইঁহারা তিনজনে বাহির হইলেন। দ্বারকাদাস এক দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।—পুনঃপুন কহিলেন,"বনবালা দেখিব না!"

ভবরঞ্জিকা এবং যোগমায়া উভয়েই পুনঃপুন উত্তেজনা করিয়া (এক প্রকার জোর করিয়াই) নিরুৎসাহিত দ্বারকাদাসকে উদ্যানভবনে লইয়া গেলেন। তিনজনেই ভিন্নভিন্ন মৎলবে উদ্যানভবনের দ্বারদেশে উপস্থিত।

দ্বারকাদাস গৃহে আসিয়াছেন, বনবালা তাহা জানে না। সন্ধ্যার পর নিত্য নিত্য যোগমায়া থাকিতেন, তিনিও আজ আসেন নাই,—কিম্বা হয় ত আসিতে কিছু বিলম্ব হইলেও হইতে পারে। মাঝে মাঝে হয়ও তেমন। বনবালা শয়ন করে নাই:—সকাল সকাল শয়ন করা তাহার অভ্যাসও নয়। ঘরের একটী ধারে একাকিনী বসিয়া আছে।—ঘরের মধ্যস্থলে

কিঞ্চিৎ সূক্ষ্মশিখায় একটী বাতী জ্বলিতেছে। বনবালা বসিয়া গালিচার আসনের কারিকুরী পরীক্ষা করিতেছে।—গৃহের দরজা আবৃত ছিল, কিন্তু আবদ্ধ ছিল না। সহসা কে আসিয়া দরজা ঠেলিল;—বনবালার কাণ নাই,—সে দিকে কাণ দিবার দরকারও নাই! বনবালা আপন মনেই আসনের কারিকুরী পরীক্ষা করিতেছে।—কে আসিয়া দরজা ঠেলিল, দরজা খুলিয়া গেল, তিনটী লোক প্রবেশ করিল।—বনবালা আসন পরীক্ষা করিতেছে!—অন্যদিকে ভ্রূক্ষেপমাত্রও নাই!

ভবরঞ্জিকার কাণে কাণে যোগমায়াদেবী চুপি চুপি বলিলেন, কেন জানি না,—কাণে কাণেই বা কেন,—চুপি চুপিই বা কেন, কিছুই জানি না,—উচ্চ চীৎকারে কথা কহিলেও তাঁহারা তিনজন ছাড়া সে কথা শুনিবার চতুর্থ লোক সে ঘরে আর অন্য কেহই ছিল না,—তথাপি, কেন জানি না,—যোগমায়াদেবী ভবরঞ্জিকাদেবীর কাণে কাণে চুপি চুপি বলিলেন, "বনবালাকে লইয়া মজা করি দেখ!—চক্ষু টিপিয়া ধরিব!"

গৃহে যাঁহারা আসিয়াছেন, পাঠকমহাশয়ের তাহা বোধ হয় বুঝিতে বাকী নাই।—ভবরঞ্জিকা, যোগমায়া আর দ্বারকাদাস। একটু পূর্ব্বের পরামর্শ অনুসারে তাঁহারা তিনজনেই বনবালাকে দেখিতে আসিয়াছেন।

যোগমায়া আস্তে আস্তে পা টিপিয়া টিপিয়া, (কেনই বা অত সাবধান!) অল্প অন্ধকারে একটু তফাত দিয়া ঘুরিয়া গিয়া বনবালার চক্ষু টিপিয়া ধরিলেন। বনবালা আসন দেখিতেছিল, দেখা হইল না,—চক্ষু বন্ধ হইয়া গেল,—বনবালার বুকে একটু আঘাত বাজিল। যে হস্তদ্বারা নয়ন আবৃত হইয়াছে, তীক্ষ্ণবুদ্ধি

প্রভাবে বনবালা তাহা একবারমাত্র স্পর্শ করিয়াই চিনিয়া ফেলিল। চক্ষে না দেখিয়াও অঙ্গুলীর ইঙ্গিতে যোগমায়ার গাত্রে তিনটী চিহ্ন দিয়া বনবালা বুঝাইল, " তুমি ভিন্ন এতরাত্রে এত দয়া কার ?"

বনবালার ইঙ্গিত অবশ্যই ঠিক।—তিনি ভিন্ন এত রাত্রে এত দয়া কার ?—যাঁহার অকৃত্রিম আদরযত্নে সুরক্ষিতা হইয়া অভাগিনী বনবালা এই অপরিচিত পুরীমধ্যে নিরাপদে বাস করিতেছে, সেই দয়াময়ী যোগমায়াদেবী ভিন্ন এত রাত্রে অভাগিনী বনবালাকে আর কে দেখিতে আসিবেন ? যোগমায়াদেবীই আসিয়াছেন। বনবালার এ ইঙ্গিত অবশ্যই ঠিক।—এই ঠিকের উপর তাঁহার ভাগ্যে আরও ঠিক দাঁড়াইতেছে।—একজনের স্থলে তিনজন আসিয়াছেন।

চক্ষু টিপিয়া ধরিয়া বোবামেয়ের সঙ্গে ভালরকম কৌতুক চলে না। খানিকক্ষণ অঙ্গুলী ঠারাঠারীর পরেই কৌতুক ভাঙ্গিয়া গেল।—যোগমায়া চক্ষু ছাড়িয়া দিলেন। বনবালা শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল।—উঠিয়াই পশ্চাতে দেখিল, যোগমায়া সম্মুখে দেখিল ভবরঞ্জিকা।—অগ্রবর্ত্তিনী ভবরঞ্জিকার পার্শ্বে দেখিল, রূপবান যুবাপুরুষ!—এ পুরুষের চেহারা বনবালা দেখিয়াছে, কিন্তু বনবালা ইহাঁর নাম জানে না। চেহারার প্রতি ভক্তিও আছে, লজ্জাও আছে। দ্বারকাদাসকে দর্শন করিয়া, লজ্জায় বনবালা বিস্মিত বিশুষ্ক বদনখানি অবনত করিল। দ্বারকাদাসও বিস্ময়াপন্ন হইয়া ভাস্করনির্ম্মিত প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় অচঞ্চলে চাহিয়া রহিলেন। ভবরঞ্জিকা এবং যোগমায়া উভয়েই বনবালার বদন উন্নত করিয়া সঙ্কেতে

সঙ্কেতে দ্বারকাদাসকে দেখাইতে লাগিলেন। বনবালা এক একবার দেখে, এক একবার চক্ষু মুদ্রিত করে। দ্বারকাদাস আর সে স্থলে বহুক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিলেন না। অকস্মাৎ তাঁহার সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল।—ঘর্ম্ম হইতে লাগিল। বেগতিক দেখিয়া ভবরঞ্জিকাদেবী সেই গৃহের পাল্‌কী করিয়া পতিকে গৃহে লইয়া গেলেন। যোগমায়াদেবীও পতির তাদৃশ অসুখ দর্শনে অধিকক্ষণ বনবালার নিকট বিলম্ব করিতে পারিলেন না। ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে বনবালাকে কতক কতক বুঝাইয়া দিয়া, যোগমায়াদেবীও শীঘ্র শীঘ্র প্রস্থান করিবার উপক্রম করিলেন। বনবালাও সঙ্গে যাইবার জন্য ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে অত্যন্ত আগ্রহ জানাইল। যোগমায়া ইঙ্গিতে কহিলেন, "না ভাই!—তোমার যাওয়া হইবে না! তোমাকে দেখিয়া ব্যামো হইয়াছে, তোমাকে দেখিলে আরাম হইবে না! তুমি থাকো,—আমি একাকিনী যাই।"

যোগমায়া চলিয়া গেলেন। বনবালা একাকিনী রহিল। কেন যে এই সব কাণ্ড,—কেন যে অকস্মাৎ দ্বারকাদাসের সর্দ্দিগর্ম্মী,—কেন যে শ্রীমতী যোগমায়াদেবীর শীঘ্র শীঘ্র প্রস্থান, বনবালা এ সকল মনে মনে বুঝিতেছে কি না, বনবালাই জানে। অন্য কোন চিন্তা না আসিলেও পাঁচ বৎসর পরে ঐ মূর্ত্তির দর্শন পাইল, এই অভিনব আহ্লাদের চিন্তা অবশ্যই বনবালার হৃদয়ে উদয় হইতেছে। বনবালা কি ভাবিতেছে।—বনবালা ভাবিতেছে, পাঁচ বৎসরের পর সাক্ষাৎ!

কেন?—বনবালা এমন কথা কেন ভাবে?—পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে দ্বারকাদাসের সঙ্গে কোথাও কি বনবালার কখনও সাক্ষাৎ

হইয়াছিল?—দ্বারকাদাসের সঙ্গে কি বনবালার চেনাশুনা আছে?—কথাবার্ত্তার গতিকেই উত্তর পাওয়া যাইবে। ফল কথা, বনবালা ভাবিতেছে, পাঁচ বৎসরের পর সাক্ষাৎ!

দ্বাদশ কল্প।

সত্যই কি জানাশুনা?

বনবালার সঙ্গে সত্যই কি দ্বারকাদাসের জানাশুনা আছে? সত্যই কি বনবালা আর কখনো দ্বারকাদাসকে চক্ষে দেখিয়াছিল? সত্যই কি পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে উঁহাদের পরস্পর কোনরূপ বিশেষ সৌহার্দ্দ সঞ্চারিত হইয়াছিল? এ সকল প্রশ্নের সন্তোষকর উত্তর পাওয়া যাইবে না।—বোধ হয়, এক্ষণে তাহা প্রয়োজনও হইবে না। বনবালা ভাবিতেছে, পাঁচবৎসর পরে সাক্ষাৎ! বনবালাকে ক্ষণকালমাত্র দর্শন করিয়া দ্বারকাদাস আপনার উদ্যানভবনে একপ্রকার মোহপ্রাপ্ত!—তাঁহাকে লইয়াই হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছে! তিনি উদ্যানভবন হইতে কাঁপিয়া আসিয়াছেন, ঘামিয়া আসিয়াছেন, গৃহে আসিয়া ক্ষণকাল বাক্য-শূন্য হইয়াছিলেন! এখন বাক্যস্ফূর্ত্তি হইয়াছে।—বাক্যস্ফূর্ত্তি হইবার পরেই দ্বারকাদাস বারম্বার যোগমায়াকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, "বনবালা এখানে কবে আসিল?—কেন আসিল? তোমরাই বা কেন উহাকে আটক করিয়া রাখিয়াছ?"

যোগমায়া হাস্য করিয়া কহিলেন,"আটক করিয়া রাখি নাই! যথার্থ রাজরাণীর মত যত্ন করিয়া রাখিয়াছি! বনবালা এখন স্বামী চায়!—বনবালা এখন—"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া, পুনর্ব্বার একটু হাসিয়া, যোগমায়া-দেবী একটু একটু শ্লেষব্যঞ্জকস্বরে বলিতে লাগিলেন, "বনবালা এখন স্বামী চায়!—স্বতন্ত্র স্বামী চায় কিম্বা আমাদের এই গৃহ-স্বামীতেই ভাগ বসায়, সেই ভয়েই আমরা আকুল হইতেছি! দ্বারকাদাস যেন চেষ্টাশূন্য হইয়া পড়িলেন। অন্বেষণ করিতে করিতে বনবালা এতদূর আসিয়া পড়িয়াছে, ইহা ত সামান্য আকর্ষণের কার্য্য নহে!—তবে যাহারা বনবালাকে কলঙ্কিনী বলিয়া দোষ দেয়, তাহারা মিথ্যাকথা কয়। বনবালা সাধ্বী। ক্ষণকালমাত্র মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিয়া আশুক্লিষ্ট দ্বারকাদাস অকস্মাৎ শরীরে যেন কতই বল পাইলেন। উঠিয়া বসিলেন। যোগমায়াকে কহিলেন, "প্রাণাধিকে! আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম, বনবালা দেখিব না।—প্রাণাধিকে! সে কথা তুমি শুনিলে না। জোর করিয়া বনবালা দেখাইলে! প্রাণাধিকে! এখন যে আমার প্রাণে কত বড় আঘাত লাগে, তাহা তুমি—"

"তাহা আমি ঠিক বুঝিতে পারিব না সত্য, তথাপি একটু একটু বুঝিতেছি।"—যোগমায়াদেবী কথা কহিতে কহিতে অধ-রের উপর ওষ্ঠ চাপিয়া পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, "তথাপি একটু একটু বুঝিতে পারিতেছি, আপনি ঐ বনবালাটীকে ভালবাসেন, বনবালাও আপনাকে ভালবাসে!"

দ্বারকাদাস নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।—বনবালার কথা আর

বেশী আন্দোলন করা তাঁহার প্রাণে ভাল লাগিল না। তিনি একটু ওকথাটা চাপা দিবার অভিপ্রায়ে পাশকথা পাড়িবার ছলনা আরম্ভ করিলেন।

আসিবে কেন?—বসিবে কেন?—অমন সময় সরল অন্তঃকরণে পাশকথা আসিয়া বসিবার স্থান কোথায়?—বনবালার প্রসঙ্গের আন্দোলন তাঁহার প্রাণে ভাল লাগিল না; পাশকথাই বা ভাল লাগিবে কেন?—ছলনাই বা টেঁকিবে কেন? কিছুই হইল না।—ঘুরেফিরে সেই বনবালার কথাই আসিয়া পড়িল!

দ্বারকাদাস জিজ্ঞাসা করিলেন, "যোগমায়া! তুমি কি বনবালাকে এখানে আশ্রয় দিয়াছ?—বনবালা এখানে কবে আসিয়াছে?"

হাস্য করিয়া যোগমায়া কহিলেন, "যার যেখানে ব্যথা, তার সেখানে হাত! আপনিই অনুমান করুন না, বনবালা কবে আসিয়াছে?—আচ্ছা, প্রাণেশ্বর! সত্যই কি আপনি বনবালাকে চেনেন? কোথাও কি দেখিয়াছেন?"

যেন কতই অন্যমনস্ক হইয়া দ্বারকাদাস উত্তর করিলেন, "বোধ হয় যেন কোথাও দেখিয়া থাকিব।"

পুনর্ব্বার হাস্য করিয়া যোগমায়া কহিলেন, "ঐ "বোধ হয়" কথাটা আমারে যেন কেমন কেমন লাগে!—যদি কোথাও দেখিয়া থাকেন, স্পষ্ট করিয়া বলুন, দেখিয়াছি। বোধ হয় যেন, বোধ হয় কোথাও দেখিয়া থাকিব, বোধ হয় কোথাও দেখিয়াছি, অতশত ঘোরফের আমি বুঝিতে পারি না।—সত্য বলিতেছি, "বোধ হয়, জ্ঞান হয়, মনে কর, ঠিক যেন," এই রকম কথাগুলা আমার কাণে যেন ছুঁচ ফুটাইয়া দেয়।"

লজ্জা, সংশয়, ভয়, এই তিনটী একত্র হইলে কোন কোন মানুষের ওষ্ঠাধরে এক প্রকার মলিন মলিন হাসি আইসে। সে হাসির অর্থ সকলে বুঝিতে পারে না। যাঁহারা হাসেন, তাঁহারা হয় ত বুঝিতে পারেন, হাসিলাম; কিন্তু হাসি তাঁহাদের নয়নগোচর হয় না! দেখুন দেখি, বুঝাইবার পক্ষে এটা একটা কত বড় সঙ্কট!—লজ্জা, ভয় এবং সংশয়, এই তিনটীর একটীতেও হর্ষসূচক হাসি আসা অসম্ভব। অথচ, অমন সময়েও কাহারো কাহারো বদনে অমন হাসি দেখা যায়। যাঁহারা হাসেন, তাঁহারা বলিতে পারেন না, সে হাসি কেমন! যাঁহারা দেখেন, তাঁহারাও সকলে ঠিক করিয়া বলিতে পারেন না, সে হাসি কেমন!—যাঁহারা দেখেন,—যাঁহারা ভাল করিয়া দেখেন,—মনের সঙ্গে, প্রাণের সঙ্গে, নয়ন মিলাইয়া, যাঁহারা সেই লজ্জাভয়ের হাসিটী ভাল করিয়া দেখেন,—যাঁহারা দুঃখের হাসি দেখিয়াছেন, তাঁহারা যদি এই দ্বারকাদাসের হাসির সঙ্গে সেই দুঃখের হাসি মিলাইয়া নিশ্চিন্তমনে বিচার করেন, তাহা হইলেই দ্বারকাদাসের তখনকার হাসির অর্থ বুঝিতে পারিবেন। দ্বারকাদাস লজ্জার হাসি হাসিয়াছেন, শঙ্কার হাসি হাসিয়াছেন, সন্দেহের হাসি হাসিয়াছেন, দুঃখের হাসিও হাসিয়াছেন। কেন এসব উৎপাত তাঁহার মনে?

উৎপাত কি সূত্রপাত, লোকে তাহা কি বুঝিবে?—যখন হাসিয়াছেন, তখন অবশ্যই তাহার কিছু মানে আছে। সকারণ হউক, নিষ্কারণ হউক, অবশ্যই সে হাসির কিছু নিগূঢ় তাৎপর্য্য আছেই আছে। যোগমায়া কত বড় বুদ্ধিমতী, এইবারে তাহার পরীক্ষা হইবে।—যথার্থই তিনি রাজরাণী

হইবার যোগ্যপাত্রী হইতে পারেন কি না, এইবারে তাহার পরীক্ষা হইবে।—দেখা যাউক, যোগমায়াদেবী যদি এইবারে মহাশয় দ্বারকাদাসের অসাময়িক হাস্যের কারণ বাহির করিতে পারেন, তিনি যদি এইবারে এই উপলক্ষে মনের কথা বাহির করিয়া লইতে পূর্ণক্ষমবতী হন, তাহা হইলেই বুঝিব, শ্রীমতী যোগমায়াদেবী প্রকৃতই বুদ্ধিমতী, প্রকৃতই রাজরাণী,—প্রকৃতই স্বামিসোহাগিনী!

দ্বারকাদাসের চিবুকখানি স্পর্শ করিয়া, মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া, যোগমায়া অতি অমিয়বচনে কহিলেন, "নাথ! আপনি হাসিলেন কেন?—এ সময় ত হাসিবার সময় নয়। আরো দেখুন, আপনার মুখে হাসি দেখিলেই আমার হাসি পায়; এখন আপনি হাসিলেন, আমার ত কৈ একটুও হাসি পাইল না!—এমন ত হয় না!—কেন এমন হইল!—বলুন, আপনি হাসিলেন কেন?"

ভাবটী গোপন করিবার অভিপ্রায়ে কিয়ংক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া দ্বারকাদাস উত্তর করিলেন, "হাসিলাম মনের দুঃখে! আমার দুঃখে—"

বাধা দিয়া যোগমায়াদেবী সচঞ্চলে কহিলেন, "কেন? কেন?—আপনার আবার দুঃখ কিসের?—এই আমরা দুজন আজ্ঞাধীনা কিঙ্করী অষ্টপ্রহর মুখের কাছে সেবা করিতেছি, সে দুঃখের কথা আমাদের কাছে প্রকাশ করেন না কি জন্য? আমাদের আর কে আছে? আমরা—"

কথায় বাধা পড়িল।—চঞ্চলপদে ভবরঞ্জিকা প্রবেশ করিলেন।— আসিতে আসিতে চঞ্চলকণ্ঠেই বলিতে লাগিলেন,

"তাই ত!—আপনার আবার দুঃখ কিসের?—পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আমি সব কথাই শুনিতেছি,—সব কাণ্ডই দেখিতেছি। বিধুমুখী যোগমায়া যথার্থই আপনার উপযুক্ত রাজরাণী! আপনি বলুন,—আপনি আজ্ঞা করুন আপনার আবার দুঃখ কিসের?"

হাস্য করিয়া যোগমায়া কহিলেন, "সে কথা এখন বলে কে?—এই আমরা আছি, অষ্টপ্রহর কাছছাড়া হই না, আবার একজন আসিতেছে!—আবার—"

সবটুকু না শুনিয়াই ভবরঞ্জিকা প্রশ্ন করিলেন, "আবার একজন কে যোগি?"—ভবরঞ্জিকাদেবী স্নেহবশে যোগমায়া-দেবীকে 'যোগি' বলিয়া সম্ভাষণ করেন। ভবরঞ্জিকা জিজ্ঞাসা করিলেন "আবার একজন কে যোগি?"

যোগী উত্তর করিলেন, "আবার একজন নূতন আসিতেছে! নূতন কি পুরাতন, কর্ত্তাই জানেন!"

"নূতন পুরাতন কি ভাই?—কে আবার এখন আমাদের ভালবাসার ভাগ বসাইতে নূতন আসিতেছে?"

"কেন?—বনবালা?"

"বনবালা কি আমাদের সতীন হবে?"

"তাই ত দেখ্‌ছি!—গতিকে ত তাহাই বোধ হয়!"

"সে কি?"

"আর সে কি!"

দ্বারকাদাস আরও অধিক লজ্জা পাইলেন। তিনি ভাবিলেন, সমস্তই ত প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। তিনি যদি তখন সেখানে উপস্থিত না থাকিতেন, তাহা হইলেই ভাল হইত। এখন ভাবিলেন, "আর তবে বেশীক্ষণ অপ্রকাশ রাখিয়া উদ্বেগ

বৃদ্ধি করা নিষ্প্রয়োজন।”—মনে মনে এইটী ভাবিলেন বটে, কিন্তু মুখে প্রকাশ করিবার সময় রসনা যেন উদরমধ্যে প্রবেশ করিতে চায়!—যোগমায়া কহিলেন, “আমার সে কথাটা যে অনেকক্ষণ চাপা পড়িয়া রহিয়াছে! সত্যই কি বনবালার সঙ্গে আপনার জানাশুনা আছে?”

ভূতলে অঙ্গুলী আঘাত করিয়া ভবরঞ্জিকা কহিলেন, “ঐ কথাটাই বেশকথা! যোগি! তুমি বেঁচে থাকো,—ঐ কথাটাই বেশকথা! উভয়ের সঙ্গে জানাশুনা আছে কি না, সেইটী জানিতে পারিলেই আমরা সূত্রপাতের সূত্র পাই।” চতুর্দ্দিকে চাহিয়া গম্ভীরভাবে যোগমায়া কহিলেন, “ঘরের কথা এখন যেন বাহিরে না যায়।—জানাশুনা আছে;—জানাশুনা বেশ আছে! এখন তোমরা চুপ্ কর! আমি একখানা দলীল পড়ি!”

বসনাভ্যন্তর হইতে একখানি কাগজ বাহির করিয়া যোগমায়াদেবী একবার ইতস্ততঃ চাহিয়া দেখিলেন। ভবরঞ্জিকাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বিনম্রস্বরে কহিলেন, “দিদি! দয়া কোরে জানালা-দরজা বন্ধ কর! কেবল তুমি, আমি, আর বাবু, এই তিনটী ছাড়া আর কেহই এখন এই পত্রখানির পাঠ শুনিবার অধিকারী নয়।—এটী এখন ভারি গুপ্তকথা!—দলীল!”

দলীলের কথা শুনিয়া দ্বারকাদাসের মুখখানি আরও যেন কেমন একপ্রকার ভাব ধারণ করিল!—একবার ভাবিলেন, পত্রিকাখানা যোগমায়ার হস্ত হইতে কাড়িয়া লইয়া আপনি পড়িবেন,—মনে মনে পড়িয়া দেখিবেন,—কেহই কিছু জানিতে পারিবে না।—আবার ভাবিলেন, “যোগমায়ার হাতে যখন দলীল, তখন অবশ্যই উহা পাঠ করা হইয়া গিয়াছে। যোগমায়া

জানিয়াছেন, ভবরঞ্জিকাও শুনিয়াছেন। তবে আর গোপন করি কাহার কাছে?” এই ভাবিয়া পণ্ডিত দ্বারকাদাস সেই ক্ষেত্রে যোগমায়াদেবীর হস্তস্থিত পত্রিকা দর্শন করিয়া, যোগমায়াদেবীর কাণে কাণে সমস্ত সত্য স্বীকার করিলেন। সে স্বীকার যে, তৎক্ষণাৎ ভবরঞ্জিকার কর্ণে গেল না, এমন সন্দেহ করাও নিরর্থক। ভবরঞ্জিকা আর যোগমায়া, দুটীতে যেন অভেদাত্মা।—পতিও উভয়পক্ষে সমভাব।

পত্রিকাখানি ছিঁড়িয়া ফেলা কর্ত্তব্য কি না, দ্বারকাদাস সে তর্কটীও একবার বিবেচনাধীনে আনয়ন করিলেন। সুবিবেচনা তাঁহার কুসংকল্পে সায় দিল না।—পত্রখানি ছেঁড়া হইল না। দ্বারকাদাস অবনতবদনে কহিলেন, “বনবালা থাক্!”

যোগমায়া হাস্য করিয়া কহিলেন, “কেহ ত বলে নাই, বনবালা থাকিবে না!”

দ্বারকাদাস কহিলেন, “কেহ বলে নাই থাকিবে না, সত্য কথা।—কেহ যদি বলিত থাকিবে না, তাহা হইলেও আমি এমনি অটলভাবে বলিতাম, বনবালা থাক্!”

বনবালা থাকিল।—দ্বারকাদাস অপরাপর বিষয়কার্য্যে সর্ব্বদাই পরিলিপ্ত, বনবালার সঙ্গে বড়ই বিলম্বে বিলম্বে দেখা হয়। বনবালাও ইঙ্গিতে জানায়, “প্রকাশ করিয়া কাজ নাই।” দ্বারকাদাসও ইঙ্গিতে উত্তর দেন, “প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে!” সে প্রকার প্রকাশকেও একপ্রকারে অপ্রকাশ বলা যাইতে পারে। কেন না, বাড়ীর লোকেরা ছাড়া, বাহিরের জনপ্রাণীও এ বার্ত্তার বিন্দুমাত্রও অবগত নহে।

জানাশুনা আছে, আশ্রয় পাইয়াছে, কষ্টে পড়িয়াছিল,

সদাশয় দ্বারকাদাস সাহায্য করিতেছেন, এই সকল পরিচয়েই দ্বারকাদাসের উদ্যানভবনে বনবালা রহিল।—যোগমায়া দেখা করেন, ভবরঞ্জিকা দেখা করেন, দ্বারকাদাস স্বয়ং দেখা করেন, সময়ে সময়ে বনবালা নিজেও দেখা করিতে যায়, এই ভাবেই বনবালা স্বতন্ত্র ভবনে রহিল। পাঁচ বৎসরের পর দেখা হইলে উভয়ে যেপ্রকার কথোপকথন হয়, বনবালার সঙ্গে দ্বারকা· দাসের পাঁচবৎসরের কথোপকথন সেপ্রকার পরিষ্কার হইবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। আকার ইঙ্গিতে কেবল প্রকাশ পাইয়াছিল, দীর্ঘবিরহ!—সে বিরহ তাঁহারাই মনে মনে বুঝিতেন, অপরে কিছুই বুঝিত না।—গৃহিণীরাও নহেন।

ত্রয়োদশ কল্প।

রাখিলেই থাকে।

রাখিবার জন্য যাহা কিছু রাখিয়া দেওয়া হয়, তাহা থাকে। যিনি রাখেন, তিনি মনে করেন, আমার সে জিনিসটী আছে। দ্বারকাদাসের গৃহে বনবালাকে রাখা হইল,—দ্বারকাদাসের উদ্যানেই বনবালা আছে। বনবালার পরিচয় কি, জাতি কি, পেশা কি, তাহা কেহই জানেন না। এই উপলক্ষে গোলমাল হইতে পারিত, কিন্তু দ্বারকাদাস একজন প্রধান লোক। তাঁহার অর্থ আছে, সামর্থ্য আছে, সাহস আছে, কুচক্রী লোকেরা

তাঁহার তেজের কাছে ঘেঁসিতে পারিল না। বনবালা নিরাপদে উদ্যানভবনে রহিল।

রাখিলেই কিছুদিন থাকে।—রাখিব বলিয়া রাখিয়া দিলেই কিছুদিন থাকিয়া যায়।—না রাখিলে থাকে না। দ্বারকাদাস ধর্ম্ম রাখিতেছেন, ধর্ম্মরক্ষা হইতেছে।—বনবালা আশ্রয় পাইয়াছে। তিনি বনবালার পরিচয় জানেন, বনবালার সঙ্গে একত্র আহারাদিও করা হয়, স্থানীয় লোকেরা তাহা শুনিয়াছে। দ্বারকাদাসকে ধর্ম্মত্যাগী মনে করিয়া লোকেরা তাঁহার মানসম্ভ্রম পূর্ব্বাপেক্ষা একটু কমাইয়া দিয়াছে।

কথাটাই পাপের কথা! ধর্ম্মত্যাগী হইবার কথাটাই ভারতবর্ষের আর্য্যজাতির পক্ষে মহাপাতকের কথা বলিয়া মনে হয়। ভারতে ধর্ম্মবিপ্লব ঘটাতে অনেক হিন্দুসন্তান অনেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ে মিশিয়া পড়িয়াছেন। মুসলমানের হস্তে অনেক হিন্দুসন্তান যবনত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে, খৃষ্টানের হস্তে কতক হিন্দুসন্তান পতিত হইয়াছে। পলাসীর যুদ্ধের পর হইতে ক্রমাগত অনেক বৎসর কতিপয় ইয়ুরোপীয় খৃষ্টানের হস্তে কতিপয় হিন্দুসন্তান খৃষ্টানত্ব লাভ করিয়াছে! ইহাতে হিন্দুসমাজের বলক্ষয় হইতেছে সত্য, পূর্ব্ব হইতেই বলক্ষয় আরম্ভ হইয়াছে সত্য, কিন্তু এখনো যেন বোধ হয়, হিন্দুসমাজের কিছুমাত্র বলক্ষয় হয় নাই! হিন্দুধর্ম্মকে ভগ্ন করিয়া চূর্ণ করিবার অভিলাষে কতক লোক কতই স্থলে সভা-সমিতির ঘর বাঁধিবার বাঁশ কাটিতেছেন,—হিন্দুধর্ম্মের চূর্ণ লইয়া ডেলা পাকাইবার জন্য কত লোক কত স্থলেই সভা-সমিতির মধ্যে ভাল ভাল আলো জ্বালিতেছেন; কতই হিন্দুসন্তান আজকাল ইংরেজের আমলে ইংরেজী ধরণে চলিতেছেন।

কতই হিন্দুসন্তান হিন্দুসমাজ ছাড়িয়া রচনান্তরে সুখী হইতে ছুটিয়াছেন! তথাপি যেন আমরা দেখিতেছি, হিন্দুসমাজের কিছুমাত্র বলক্ষয় হয় নাই।

রাজার দৃষ্টিপাত না থাকিলেই প্রজার ধর্ম্ম বিকৃত হইয়া যায়;—সমাজও নষ্ট হয়। ভারতে আজকাল তাহাই হইতেছে। ক্রমাগত বহুদিন পরকীয় ধর্ম্মের এবং পরকীয় সমাজের অলঙ্কৃত কথা আলোচনা করিতে করিতে একদেশের লোকে স্বধর্ম্মে আস্থাশূন্য হইতে পারে,—আপনাদের সমাজবন্ধন ভুলিয়া যাইতে পারে,—ভালমন্দ বিচার করিবার শক্তি হারাইয়া ফেলিতে পারে! ইহা কিছুই বিচিত্র কথা নয়! পরাধীন দেশে এপ্রকার ঘটনা অনেক শুনিতে পাওয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষে অধুনা তদপেক্ষাও অধিক বিপ্লব উপস্থিত! এখানে আর এখন প্রায় স্বধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝাইবার লোক নাই!—সে কথার প্রায় প্রসঙ্গই নাই!—যাঁহারা সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন, কিম্বা শাস্ত্রসিদ্ধ সামাজিক নিয়মে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা হাস্যাস্পদ হন!—লাভ হয়, উপহাস টিট্‌কারী!

দেশে এখন সংস্কৃত ভাষার আদর কম।—সংস্কৃতের বিরলচর্চ্চা হওয়াতে হিন্দুসন্তানেরা এখন আর হিন্দুশাস্ত্র ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন না। তাহার উপর আবার পরের মুখে পুনঃপুন সেই শাস্ত্রের ভাসা ভাসা অপযশ শ্রবণ করিয়া আরও বিভ্রান্ত হন! স্বভাবতঃ অনেকেরই মতিভ্রম ঘটে। প্রথম প্রথম খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারকেরা এদেশের জনকতক লোককে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া, এবং গুটীকতক বালককে জননীর কোল হইতে কাড়িয়া, যথেষ্ট বাহাদুরী দেখাইয়াছিলেন!

মোটা মোটা গরু মারিতে পারিলে কশাইদিগের মনে যেমন আনন্দ হয়, বড়বড় ঘরের দুটীপাঁচটী মোটামোটা হিন্দুসন্তানকে স্বধর্ম্মভ্রষ্ট করিতে পারিলে প্রচারকদিগের মনে তখন তদপেক্ষাও বোধ হয়, বেশী আনন্দ হইত। কিন্তু আমরা অনুমানে নির্ণয় করিতে পারি, এদেশে খৃষ্টান মিশনরির পদার্পণ অবধি আজি-পর্য্যন্ত যতগুলি হিন্দুসন্তান খৃষ্টান হইয়াছেন, তাহার সংখ্যা বড়ই কম!—ভগ্নাংশ অনুসারে হিসাব করিয়া দেখিলে, তাঁহাদের মধ্যে ভাল ভাল ঘরের,—লেখাপড়াজানা, আসামী খুব কম!—শতকরা বোধ হয়, একটীরও অধিক হইবে না। ইহাও আমরা বোধ হয় কিঞ্চিৎ বেশী অনুমান করিলাম। দেশীয় খৃষ্টানদলের মধ্যে যে দুই একজন ধার্ম্মিক ইংরাজী "রেভারেণ্ড" উপাধি পাইয়া পাদ্‌রী হইয়াছেন,—খৃষ্টানমিশ-নরিগণের বেতনভোগী চাকর হইয়াছেন, তাঁহাদের ত গৌরবের সীমা নাই! অপরে মনে করুক আর নাই করুক, তাঁহারা নিজে মনে করেন, স্বধর্ম্ম জানি না, অথচ স্বধর্ম্মের নিন্দা করিয়া মাসে মাসে খৃষ্টানের তহবিল হইতে টাকা পাওয়া যায়! এমন মজা আর কি আছে?—স্বধর্ম্মনিন্দায় এমন উচ্চপুরস্কার পৃথিবীর আর কোন রাজ্যেই নাই!!!

যাঁহাদের ঐরূপ উচ্চ পুরস্কার লাভ করিবার আশা, তাঁহারা তাহা লাভ করিয়া স্বচ্ছন্দে স্বর্গে গমন করুন, কোন আপত্তি নাই,—তাহাতে আমরা বরং খুসীই আছি;—আর যেন কোন হিন্দুসন্তান তাঁহাদের অনুসরণ কিম্বা অনুকরণ করিতে ছুটিয়া না যান, সেইটীই আমাদের আকাঙ্ক্ষা। যদিও হিন্দুসমাজে অধিক লোক খৃষ্টান হয় নাই সত্য, তথাপি খৃষ্টানের দেখাদেখি

অনেক বিভ্রান্ত হিন্দুসন্তান আচারভ্রষ্ট হইয়াছে! আর যাহাতে সই স্রোত প্রবল হইতে না পায়, তাহার উপায় করাই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। হিন্দুর যদি পূর্ব্বরূপ সমাজ থাকিত, আজ যদি হিন্দু সমাজে কোন হিন্দুরত্ন সমাজপতিরূপে অধিষ্ঠিত থাকিতেন, তাহা হইলে হিন্দুসমাজের প্রত্যেক আশাভরসার কথায় আমরা উৎফুল্ল হইয়া উঠিতাম। এখন ত তাহা হয় না। দেখুন, বঙ্গদেশে পূর্ব্বাপেক্ষা আজকাল বেদ, বেদাঙ্গ, স্মৃতি, পুরাণ, অভিধান, ইত্যাদি বিবিধ মূল্যবান শাস্ত্র বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইতেছে, এক এককালে সহস্র সহস্র খণ্ড প্রচারিত হইয়া যাইতেছে, তবে কেন প্রাচীন আর্য্যসমাজের আচারের উপরে আর্য্যসন্তানগণের ভক্তি ফিরিয়া না আইসে? বিবিধ ধর্ম্মশাস্ত্রের বঙ্গানুবাদ সাধারণ বঙ্গবাসীর নেত্রগোচর ও জ্ঞানগোচর হইতেছে. তথাপি লোকে আচারভ্রষ্ট কেন হন?

কপাল ভাঙ্গিয়াছে. তাই হন!—পূর্ব্ব হইতে বিরুদ্ধকথা শুনিয়া শুনিয়া যেসকল ক্ষীণবুদ্ধি লোকের মন খারাপ হইয়া রহিয়াছে, অনুবাদিত হিন্দুশাস্ত্রপাঠে তাঁহাদের ভক্তির উদয় হয় না; বরং শাস্ত্রকারগণের বিজটিল রূপকালঙ্কার বুঝিতে না পারিয়া, সহসা উপরি উপরি কতকগুলি অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড দর্শন করিয়াই. সেই সকল শাস্ত্রের প্রতি সেই সকল লোকের ঘৃণা বৃদ্ধি হয়,—অপরের সহিত কলহ করিবার সময় বিপরীত তর্কশক্তি বৃদ্ধি হয়। ইহা অপেক্ষা বরং তাঁহাদের অন্ধকারে থাকাই ভাল ছিল। সিংহের চর্ম্ম গায়ে দিয়া গিরিগুহার সম্মুখে গাধা ডাকে, তাহা দর্শন করিয়া কেহই তুষ্ট হইতে পারেন না।

সমাজের লোকে নানা প্রকারে আচারভ্রষ্ট হইতেছেন। কলিকালের মাহাত্ম্যে আপনা আপনিই এইপ্রকার ঘটিতেছে, ইহা যাঁহারা বলেন, তাঁহাদের কথা আমরা শুনিব না। অপর লোকের বিরুদ্ধ উপদেশ শ্রবণ এবং বিরুদ্ধ দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়াই অল্পবয়স্ক যুবকেরা জ্ঞানবুদ্ধির পরিপক্কতার অভাবে ভিন্ন ভিন্ন পথে গতি করিতেছেন, ইহাই ত আমাদের অনেকটা বিশ্বাস; যাহারা তাহা শুনিতে চায় না, কিম্বা বুঝিতে পারে না, তাহারা ত বরং ঠিক আছে;—বুঝিতে পারিয়াও যাঁহারা হিতাহিত ভেদ করিবার শক্তি পাইয়াছেন, তাঁহারাও ত ঠিক আছেন। ইহা দেখিয়াও আমরা কেমন করিয়া স্বীকার করিব যে, মূর্ত্তিমান কলিযুগের মাহাত্ম্য আপনা আপনি কৃষ্ণবর্ণ মুখস পরিয়া সমাজের আসরে রোজ রোজ নাচিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে!

লৌকিক আচারের কয়েকটী উদাহরণ প্রদর্শন করা হইয়াছে। এখন একটী দৈব আচার দর্শন করুন। কলিকাতা সহরের একটী বাবুর পৈতৃক ভদ্রাসনে ঝুলনযাত্রা। বাবুরা ছয় ভাই ছিলেন;—পাঁচটী ক্রমে ক্রমে যমপুরী দর্শন করিতে যাত্রা করিয়াছেন, একমাত্র ছোট ভাইটী এখন সেই বাড়ীর কর্ত্তা। ছয় অংশের বিষয় এক হাতে পড়িয়াছে, অবস্থাও সুতরাং ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছে;—ক্রিয়াকর্ম্মে এখন বেশ ঘটা হয়! তাঁহাদের বাড়ীতে শক্তিপূজা হয় না। কেবল রাস, দোল, ঝুলন, জন্মাষ্টমী, রামনবমী. এই পাঁচটী পর্ব্ব হয়। ঝুলনের শেষরাত্রে, অর্থাৎ রাখীপূর্ণিমার রজনীতে বেশী সমারোহ। কলিকাতার দস্তুর, নিশাকালেই অধিক লোক নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন। সহরের দেখাদেখি আজকাল মফস্বলের অনেক স্থলেই ঐ

রীতি আরম্ভ হইয়াছে। অনেক বড় বড় লোকে ঝুলনের নিমন্ত্রণে আসিতেছেন, কেবল পানের খিলি দক্ষিণা পাইয়া, রাধাকৃষ্ণের রজতমূল্য প্রণামী প্রদান করিয়াই; তাঁহারা ঠাকুর-দালান হইতেই বিদায় প্রাপ্ত;—বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার আকিঞ্চন রাখিতেছেন না। শেষকালে একটী সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধ আসিলেন। তিনি প্রণামী দিলেন, তাম্বূল পাইলেন, অথচ বিদায় হইলেন না। তিনি বাবু চান! কিন্তু বাবুকে তখন পায় কে? বাড়ীতে পালপার্ব্বণ হয়, বাড়ীর কর্ত্তা কেবল টাকাখরচ ভিন্ন সে পার্ব্বণের আর কোন বিশেষ ধার ধারেন না!—পূজার ভার কৃষ্ণের উপরেই নির্ভর করে!—বাবু কেবল বৈঠকখানার গেলাস-বাসন লইয়া ব্যতিব্যস্ত! পূজার শেষদিনটী বড়ই জাঁকের দিন! সেই দিন নিশাকালে কলিকাতাসহরে আজকাল বড় বড় শ্বেতবর্ণ মনুষ্যগণকে আদরে ভোজন করাইতে হয়। শ্রীপাট লালদীঘীর ঠাকুরবাড়ীর সঙ্গে বন্দোবস্ত, সেখানকার পাণ্ডারা বড় বড় সিন্দুক মাথায় করিয়া ঘন ঘন আসিয়া উপস্থিত হয়, পূজার কাছে বাবু থাকিলে সেই সকল মহৎলোকের অভ্যর্থনা করে কে?—এই রীতিটা আজকাল কলিকাতা সহরেই অত্যন্ত বাড়িয়াছে! যে সময়ের আখ্যায়িকা, সে সময় ইহার কিছুই ছিল না, লোকে ইহার নামগন্ধও জানিত না। প্রসঙ্গের উদাহরণস্বরূপ এখনকার নূতন প্রথাই বলা হইতেছে।—বৃদ্ধ কিছুতেই উঠিলেন না!—আপনার কুসংস্কারবশে বাবুর বৈঠকখানার গুরুতর ভক্তিভাবটী তিনি কিছুই বুঝিলেন না!—তিনি বাবু চান!—পাঁচসাতবার খবর গেল, বাবু মহাবিরক্ত হইয়া, পরিশেষে উপর হইতে একবার নামিলেন। দালানে উঠিবার সময়

বিলক্ষণ একবার টলিলেন!—টলিতে টলিতে ঝুপ্ করিয়া নীচের উঠানে ঢলিয়া পড়িলেন!—পপাত প্রাঙ্গণীগর্ভে ঝড়েন কদলী যথা!—এটী তাঁহার ভক্তিরস!—একা তাঁহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিতেই পঞ্চাশজন লোকের দরকার!—কর্ত্তার গায়ের ধূলাকাদা ধুয়াইতেই ভোজপুরে ত্রিশজন লোক রুজু চাই!—এখন বিবেচনা করুন,—পূজার কাছেই বা কে থাকে, প্রণামীই বা কে লয়, কাহার কথাই বা কে শোনে, বৈঠকখানার তোয়াজের দিকেই বা কে খাতির দেয়, পাণ্ডারাই বা দাঁড়ায় কোথায়,—কোন্ দিকেই বা কে চায়?—বাবু হইলেন বাড়ীর কর্ত্তা, তাঁহার বাড়ীতে কৃষ্ণপূজা,—পূজাবাড়ী লোকারণ্য, দশজন ভাল ভাল ভদ্রলোকের সমাগম, বাড়ীময় রোস্‌নাই, আসর সর্‌গরম, এমন সময় বাবু নিজে আপনার নর্দ্দামায় পড়িয়া,—সর্ব্বাঙ্গে কাদা মাখিয়া, গড়াগড়ি খাইতে লাগিলেন! দর্শকলোকেরা অবাক্ হইয়া তাহা দেখিতে লাগিল! কৃষ্ণভক্তের গৌরবের সীমা কি!—এধারে তিনি হয় ত কলিকাতা সহরের একজন মুনিসিপাল কমিশনর অথবা অবৈতনিক মেজেষ্টর হইতে পারেন! এটী আমাদের অনুমান। কেন না, দেখা যায়, সহরের বাবুদলের লোকেরা ঐ দুটী আকাঙ্ক্ষিত পদের নিমিত্ত অত্যন্ত লালায়িত! প্রথম পদের জন্য ত অনেকেই দ্বারে দ্বারে ভোট্ (Vote) ভিক্ষা করেন।—যিনি পড়িলেন, তিনি যে কি, সে কথাটী আমরা ঠিক জানি না।

এই দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে কি?—আচার এক বস্তু, ভক্তি অন্য বস্তু। ধর্ম্মকর্ম্মে ভক্তি থাকা না থাকা, মানুষের ইচ্ছাধীন। যাঁহারা ধর্ম্ম রাখিতে জানেন, তাঁহাদের ধর্ম্ম থাকে।

ধর্ম্ম রাখিবার জন্য এক এক বিষয়ে ভারতেশ্বরীর নিকটে আইন প্রার্থনা করিতে হয়। এখন কথা হইতেছে, ভারতেশ্বরীকে সে সকল কথা জানায় কে?—ইংরাজী সংবাদপত্র সম্পাদকেরা সে প্রার্থনা লিখিবেন না। যদি লেখেন, আমাদিগকে গালাগালি দিয়া সে প্রার্থনাটী উপহাসেই উড়াইবেন। ডাকে দরখাস্ত লিখিয়া পাঠাইলে তাহা হয় ত চৌতা কাগজের সামিল হইয়া থাকিবে! তবে আমাদের প্রত্যাশিত প্রার্থনাগুলি কি উপায়ে রাজ্যেশ্বরীর কর্ণগোচর করা হইবে?

এই আখ্যায়িকা লিখিতে আরম্ভ করিবার প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে আমরা একদিন স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, হিমালয় পর্ব্বতের সমীপদেশে কে যেন কাতরকণ্ঠে বলিতেছেন, "এদেশে একজন মহাবীরের অবতার আবশ্যক।—মহাবীরের অবতার শীঘ্র শীঘ্র হয় না। গুটীকতক দৃষ্টান্ত দেখুন, অবতারের বিষয় অনুমানে আনিতে পারিবেন। এক সময় কপিলবাস্তু নগরে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এক সময় জুডিয়া নগরে যিশুখৃষ্ট জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এক সময় মক্কানগরে মহম্মদ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কাহার কতদিন পরে কোন্ অবতার, তাহা চিন্তা করিলেই মহাবীরের অভ্যুদয় কতদিন পরে হওয়া প্রকৃতিসঙ্গত, তাহার কতটা আভাস অবশ্যই বোধগম্য হইবে। চারিশত বৎসর পূর্ব্বে নবদ্বীপে মহাবীর গৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাব হয়। ১৪০৭ শকাব্দে চৈতন্যদেবের জন্ম। দুই বৎসর পূর্ব্বে চারিশত বৎসর পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। এই দীর্ঘকালের মধ্যে বঙ্গদেশে আর তাদৃশ মহাবীর একটীও জন্মগ্রহণ করেন নাই। আবার কতদিন পরে যে, এই অভাগা বঙ্গে গৌরাঙ্গদেবের ন্যায় মহাবীর আর

একটী আবির্ভূত হইবেন, সে কথা কেহই বলিতে পারেন না। আমাদের স্বপ্নলব্ধ কবি আমাদের অদৃশ্য থাকিয়া হিমালয়কে সম্বোধনপূর্ব্বক যেন এই ভাবে মহাবীর অন্বেষণ করিলেন। দূর হইতে যেন এই সুললিত সকরুণ সঙ্গীতটী আমাদের শ্রবণকুহরে প্রবেশ করিলঃ—

শৈলরাজ হিমালয়! প্রণিপাত করি!
দুখিনী ভারতমাতা বেন অভাগিনী!
অধর্ম্ম অস্ত্রের কোপে, জরজর দেহ,
সমাজে যথেচ্ছাচার, স্রোতোবেগে চলে!
রোধিতেছে স্রোতোমুখ, দাঁড়ায়ে সম্মুখে,
ধরেন এমন শক্তি যিনি ভবক্রোড়ে,
হেন মহাবীরে শীঘ্র আছে প্রয়োজন!
নগরাজ! ভবমাঝে মহাশয় তুমি!
কোলে, পিঠে, বুকে, পায়ে, আরো পদতলে,
মস্তকে, বাহুতে, স্কন্ধে, সর্ব্বকলেবরে,
কতই অমূল্য নিধি পরিতেছ তুমি!
ভূধর তোমার নাম তাই ঘোষে লোকে!
সাধিতে ভারতহিত, নাশিতে বর্ব্বর,
এক মহাবীরনিধি আছে প্রয়োজন!
হে ভূধর! করি আজি মিনতি তোমায়,
বল দেখি দয়া কোরে কাঁপাইয়ে চূড়া,
পারো কি সঁপিতে হেন মূল্যবান নিধি,
যে নিধি করিতে পারে ভারত উদ্ধার?
নিদ্রাগত থাকে যদি পরিশ্রান্ত হয়ে,

নিরাপদ অন্ধকার গুহার গহ্বরে,
জাগাতে কি পারিবে না?—হেন শক্তি নাই?
প্রকাণ্ড শরীর ধর, শিরে ঢালো হিম,
তবু কি শরীরে তব, নাহি কিছু বল?
বায়ুদেব! গুহাতে কি কর না প্রবেশ?
দেখিতে কি নাহি পাও প্রবেশের পথ?
চলহ আমার সঙ্গে, মিনতি চরণে;—
প্রবেশের পথ আমি দিব দেখাইয়ে!
দেবজ্যোতিঃ প্রকাশিয়ে, আলো কর গুহা!
খুঁজে দেখ, কোথা আছে, হেন মহাবীর,
যে বীরের হাতে হবে ভারত উদ্ধার!
ভারতের পাপপঙ্ক করিতে মোচন,
এত ডাকিলাম তবু, কেহ শুনিল না!
বিশ্বধামে চরাচরে, যত কিছু আছে,
স্থাবর জঙ্গম, শূন্য, ভূচর, খেচর,
কেহ যদি পার, দাও, সেই মহাবীরে!
এত ডাকিলাম তবু, কি জানি কি দোষে,
কেহই ত কিছু তার দিল না উত্তর!
তবেই বুঝিনু মনে অভাগা ভারতে—
নাহি সেই বীরেন্দ্রের অস্তিত্ব এখন!

গিরি, নদী, সমুদ্র, অরণ্য, সকলকেই পৃথক পৃথকরূপে সম্বোধন করিয়া হিমালয়ের অদৃশ্য কবি কতই আক্ষেপ করিলেন, কতই দুঃখের গীত গাইলেন, কেহই শুনিল না,—কেহই উত্তর দিল না!

স্বপ্নের সব কথা আমাদের মনেও নাই। বস্তুতঃ দুর্ভাগ্যের কথা মনে পড়িলেই ভারতবাসীর মাথায় ঐপ্রকার স্বপ্ন আইসে। ভারত উদ্ধার এখন কেবল কথার কথা মাত্র। যাহাতে জাতি-সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া মানে মানে সম্ভবমত ধর্ম্মপথে জীবনকাল কাটাইয়া ভবরঙ্গভূমি হইতে শীঘ্র শীঘ্র প্রস্থান করিতে পারা যায়, গৃহস্থলোকে এখন দীর্ঘজীবনের কামনা না করিয়া অহরহ কেবল সেই কামনাই করিতেছেন!

যাহা রাখ, তাহাই থাকে।—তখনকার কালে জাতি রাখিবার জন্য যত্ন করিলে ভদ্রলোকের জাতি থাকিত, এখনো যত্ন করিলে থাকে। কিন্তু যত্ন করে, এমন লোক কম। বেশীর ভাগে আজ-কাল ভাসা ভাসা যত্ন করিয়া কিছুই রাখিতে পারিতেছে না!

তখনকার কালে জাতি লইয়া হুলুস্থূল বাধিত, আবার মিটা-ইতে জানিলে শীঘ্র শীঘ্রই মিটিয়া যাইত। যাঁহারা জাতি রাখিতে জানেন, তাঁহাদের জাতকুল থাকে। নবাব রামহরির জাতি গিয়াছিল, বিশ্বদুর্লভের কল্যাণে তিনি এখন জাত পাইয়া-ছেন। জটাধরের পিতার জাতি যাইতেছিল, দ্বারকাদাসের রজতের কল্যাণে অতি আশ্চর্য্যপ্রকারে রক্ষা হইয়াছে!—জলন্ত-মুখেই নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে!—দ্বারকাদাসের নিজের জাতি পাটলিপুত্রে সঙ্কটাপন্ন হইতেছিল!—বনবালাকে তাঁহার স্ত্রী আপনাদের উদ্যানে বাস করিতে দেওয়াতেই দ্বারকাদাসের জাতি মারিবার কাণাকাণি!—কেবল অর্থের জোরে, আর সততার জোরে দ্বারকাদাস পরিত্রাণলাভ করিয়াছেন। তাঁহার যেপ্রকার প্রতাপ, তাহাতে কতশত দলপতি তাঁহার কক্ষতলে লুটাপুটি খাইতে পারেন, সেই কারণেই দলপতিরা তাঁহার উপর বড়

একটা ফোঁস্ ফাঁস্ করিতে পারিলেন না। দিন চলিল! জাতি ছিল, জাতি থাকিল!

ত্রয়োদশ কল্প।

জটাধরের স্বপ্ন।

আরও দুইতিন মাস কাটিয়া গেল।—দ্বারকাদাসের বন্ধু জটাধর পুনর্ব্বার বঙ্গদেশ হইতে পাটলিপুত্রে আসিয়াছেন। দুই বন্ধুতে অত্যন্ত প্রণয়।—দ্বারকাদাসের প্রথমা পত্নী ভবরঞ্জিকা এই জটাধরকে জ্যেষ্ঠ সহোদরতুল্য ভক্তি করেন। জটাধরেরও তেমনি স্নেহ। যোগমায়ার বিবাহের পর জটাধর প্রথমেই ত দুইমাসকাল পাটনায় বাস করেন, তাহার পর মধ্যে মধ্যে আরও অনেকবার পাটনায় আসিয়াছিলেন। পাটনায় আসিবার তাঁহার অন্য প্রয়োজন আর কিছুই নহে, অকপট প্রিয় বন্ধু দ্বারকাদাসের সহিত সাক্ষাৎ করিবার আনন্দ লাভ মাত্র। যখন যখন আইসেন, দ্বারকাদাসের আবাসেই বাস করা হয়; অন্দরেও অবশ্য গতিবিধি আছে। ভবরঞ্জিকা ত সহোদরা। যোগমায়া আরও এক চূড়া বাড়াইয়া লইয়াছেন। জটাধরকে তিনি পিতা বলেন। দ্বারকাদাসের উভয় পত্নীর সঙ্গেই জটাধরের নিরবচ্ছিন্ন স্নেহভক্তির সম্বন্ধ। দ্বারকাদাস গৃহে না থাকিলেও অন্দরের কুলবধূগণের সহিত জটাধরের সাংসারিক কথাবার্ত্তা সমস্তই হয়।

একদিন শেষবেলায় দ্বারকাদাস কোথায় বেড়াইতে গিয়াছেন, জটাধর ঘুমাইয়া ছিলেন, সঙ্গী হইতে পারেন নাই, শেষবেলায় আরক্তচক্ষে গাত্রোত্থান করিলেন। গাত্রোত্থান করিয়াই সর্ব্বাগ্রে বন্ধুর সমাচার লইলেন। শুনিলেন, বন্ধু কার্য্যান্তরে স্থানান্তরে গিয়াছেন, গৃহে ফিরিয়া আসিতে একটু বেশী রাত্রি হইবার সম্ভাবনা।

জটাধরের এমন অবসর প্রায়ই ঘটিয়া উঠে না। দ্বারকাদাস বাহিরে যান, জটাধর বাটীতে থাকেন, একথা শুনিলেই যেন পরিচিত লোকেরা অসম্ভব মনে করেন। আজিকার নিদ্রা তাঁহার উপকার করিয়াছে। নিদ্রোত্থিত জটাধর শীঘ্র শীঘ্র হস্তমুখ প্রক্ষালন করিয়া কাপড় ছাড়িলেন।—চিকণ ছাঁদে চুল আঁচ্ড়াইলেন।— চুলেরা প্রকৃতির মাহাত্ম্যে শ্বেতবর্ণে কৃষ্ণবর্ণে একত্র মিশ্রিত হইয়া জটাধরের মস্তকে দিব্য শোভা সম্পাদন করে। চিকণছাঁদে আঁচ্ড়াইয়া লইলে আরও অপূর্ব্ব শোভা হয়! জটাধর সেই শোভাই ধারণ করিলেন। পরিধানবস্ত্র হাতীদার ঢাকাই, গায়ে গুল্‌বাহার ওড়্‌না, গলদেশে গোচ্ছাকার যজ্ঞপৈতা মালাকরা,—গোঁফে একটু আতর। সূক্ষ্মরূপে দর্শন করিলে বোধ হয়, বামদিকের উপর কাণেও একটী সূক্ষ্ম রকমের চামিলী আতরের তুলী।

জটাধর এইরূপ সাজ সাজিয়া আর্শীতে একবার মুখ দেখিলেন। মাথায় একটী নকিবী-কেতার তাজ দিলেন। হাতে একখানি আতরমাখা রুমাল লইলেন। বামকক্ষে একগাছি কৃষ্ণবর্ণ ছড়ী রহিল। জটাধর ভাল ভাল মস্‌লাদার পান খাইয়া, জরীর জুতা পায়ে দিয়া, হাসিতে হাসিতে বাহির হইলেন।

দ্রুতপদে ফিরিয়া আসিয়া আর্শীতে আবার মুখ দেখিলেন। টুপিতে খোল্‌তা হইয়াছে। পান খাইয়া জটাধর যেন ঠোঁটদুখানিকে জবাফুল অপেক্ষাও রাঙা করিয়া তুলিয়াছেন! ঠোঁটের দুধারে ভুর্‌ভুর্‌ করিয়া মস্‌লার গন্ধ বাহির হইতেছে।

জটাধর বাহির হইলেন। বাহির হইয়া যান কোথা?. দেখা যাউক, কোথায় যান।

জটাধর অন্দরে চলিলেন!—কি আশ্চর্য্য!—অন্দরে যাইবার অত সাজ!—স্ত্রীলোকেরা পল্লীতে পল্লীতে নিমন্ত্রণে যান, গহনা-বস্ত্র দেখাইতে! রাজা অথবা বাবুর সন্তানেরা সভাবিশেষে অথবা মজ্‌লিস্‌বিশেষে সাজিয়া গুজিয়া যান, আপনাদের রূপ দেখাইতে আর ঐশ্বর্য্য দেখাইতে!—জটাধর এখানে বন্ধুর বাটীর অন্দরমহলে ভগিনী ও কন্যার সহিত দেখা করিতে যাইতেছেন, অতপ্রকার বেশভূষা কেন?—জটাধর জানেন!

যোগাযোগটীও হইল ভাল!—ভবরঞ্জিকা এবং যোগমায়া, উভয়েই উদ্যানের দিকে বারাণ্ডায় বসিয়া হাস্যকৌতুক করিতেছেন।—বৃক্ষলতা দেখাইয়া কতই প্রশংসা করিতেছেন। উভয়ের নয়নভঙ্গীতে কতই মধুর মধুর পবিত্রভাবের লহরী খেলিতেছে। তাঁহারা কথা কহিতেছেন,—হাসির সঙ্গে সঙ্গে কথাগুলি বাহির হইতেছে, দেখিলে শ্রবণ-দর্শন উভয়ই জুড়ায়! সেদিনের বেশভূষাও অতি সামান্য।—সামান্য বটে, কিন্তু দুটীরই এক রকম। একপ্রকার কাঁচুলী, একপ্রকার নীলাম্বর, এক প্রকার কঙ্কণ, একপ্রকার হার, পৃষ্ঠদেশে একপ্রকার বেণী। দুটীতে দুখানি আসনে বসিয়া, হাতমুখ নাড়িয়া গল্প করিতেছেন,—এমন সময় জটাধর গিয়া সম্মুখে দর্শন দিলেন।

দর্শনদিবামাত্রই দর্শনে পড়িলেন।—ক্ষণমাত্রও প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারিলেন না।—জটাধরের হাসি আসিল। লুকাইতে পারিলেন না বলিয়াই হাসি, সেটুকুও যেন বড় একটা স্পষ্ট বুঝা গেল না।—জটাধর হাসিয়া ফেলিলেন।

ভবরঙ্গিকা এবং যোগমায়া, উভয়েই সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সে ক্ষেত্রে হাস্য করিবার নূতন কারণ উপস্থিত না থাকিলেও তাঁহারা জটাধরের হাসি দেখিয়া হাসি রাখিতে পারিলেন না। তাঁহারাও পরস্পর মুখ চাহাচাহি করিয়া দিব্য একহাত হাসিয়া লইলেন!

জটাধরকে আসন প্রদান করা হইল, জটাধর বসিলেন। মেয়েরাও বসিলেন। হাস্য করিয়া যোগমায়া জিজ্ঞাসিলেন, "বাবা! আজ কি আপনি কোথাও যাবেন?"—ভবরঙ্গিকাও সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ যে আপনি একা?"

জটাধর উত্তর করিলেন, "নিদ্রা আসিয়াছিল।—দিবাভাগে এমন নিদ্রা আমার কখনই হয় না। বাহিরে যাইবার সময় বন্ধু বোধ হয় ডাকিয়া থাকিবেন, বোধ করি নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। তিনি চলিয়া গিয়াছেন, আমি আছি। আরও শোন চমৎকার! দিনের বেলাও স্বপ্ন হয়!—আমি স্বপ্ন দেখিতেছিলাম!—বেশ চমৎকার স্বপ্ন!—নিদ্রাভঙ্গ হইবামাত্র সেই চমৎকার স্বপ্নের কথাটী তোমাদের কাছে বলিবার জন্যই ছুটিয়া আসিতেছি!"

ভবরঙ্গিকা কহিলেন, "সব চমৎকার নয়!—দিনেই কি, রেতেই কি, সব সমান!—কোনটা বা চমৎকার, কোনটা বা সর্ব্বনেশে!—ডাকছেড়ে কাঁদাবার!

জটাধর কহিলেন, "এ স্বপ্ন তেমন নয়। যাকে তোমরা বল

তালপত্রের খাঁড়া, পক্ষীরাজ ঘোড়া, আমার স্বপ্নে তেমন গল্প নাই!—যাকে তোমরা বল, ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী, * পায়রা-রাজা, আমার স্বপ্নে তেমন গল্প নাই! আমার স্বপ্নে কেবল সব ঘরের কথা,—ঘরাও কথা।

কৌতূহলে জটাধরের দিকে একটু ঝাঁকিয়া শ্রীমতী ভবরঞ্জিকা তাড়াতাড়ি কহিলেন, "কাদের দাদা?—কাদের ঘরের? কওনা শুনি!—কাদের ঘর?—কাদের চমৎকার কথা তুমি স্বপ্নে দেখেছ?—কাদের ঘর?—আমাদের?"

হাস্য করিয়া জটাধর কহিলেন, "হাঁ লক্ষ্মি! তোমাদের! তোমাদের! তোমাদের! ঐসব কথাই আমি রাতদিন ভাবি কি না, তাই জন্যই ঐ হয়!—রাত নেই, দিন নেই, যখনি স্বপ্ন দেখি, তখনি কেবল ঐ সব কথা!—যদি আমি কেবল দিবানিশি ঘুমাতেম, তাহা হইলে আমার মাথায় কত স্বপ্নই যে আসিত, গল্প করিয়া তাহা আমি ফুরাইতে পারিতাম না।"

যোগমায়া হাস্য করিয়া কহিলেন, "বাবার কেবল ভূমিকাই বেশী!—বোল্‌বেন কি না একটী স্বপ্নের কথা, তারি জন্যে কতখানি গোড়াবাঁধুনী দেখ! মেয়ে আমরা,—আমাদের কাছেও নকলটুকু ফাঁক যায় না!"

জটাধর কহিলেন, "তুই মা একটু চুপ্ কর্! যে স্বপ্ন

* "ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী"।—গৃহিণীদের মুখের রূপকথায় প্রায় সর্ব্বদাই "ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী" শুনিতে পাওয়া যায়। এই দুটী অপভ্রংশ বাক্যের শুদ্ধ উচ্চারণ বিহঙ্গ-বিহঙ্গিনী।

দেখেছি, তা যদি শুনিস্, অবাক্ হবি!—চমৎকার স্বপ্ন! হেসে অম্নি গড়াগড়ি খাবি!”

অগ্রেই হাসিয়া যোগমায়া কহিলেন, “অগ্রেই যদি হাসিয়া মরিব, তবে স্বপ্ন শুনিয়া হাসিব কি? নূতন হাসি আবার পাবো কোথা? আপনি বলুন আপনার স্বপ্ন।”

একটু আড়ে আড়ে চাহিয়া, যোগমায়াকে দেখাইয়া, জটাধর-ঠাকুর একটু আস্তে আস্তে ভবরঙ্গিকাকে কহিলেন, “এ বেটী সব জানে!—স্বপ্ন দেখিবার আগেই ইহার ভাবভক্তি আমি অনেকদূর বুঝেছি!—সব না জানুক, অনেক জানে!”

ভবরঙ্গিকাদেবী চমকিতা হইয়া যোগমায়ার মুখপানে চাহি-লেন। যোগমায়াও তাঁহাদের দিকে চাহিয়া টিপিটিপি হাসিতে-ছিলেন, ওষ্ঠের কাছে অঙ্গুলী আনিয়া কহিলেন, “সব শুনেছি! আমারে দেখিলে কিছুই হইবে না!—স্বপ্ন শোন!”

স্বপ্ন শুনিবার জন্যই আগ্রহ বাড়িতে লাগিল। জটাধর স্বপ্নের কথা গল্প করিতে আরম্ভ করিলেন।

আর বেলা নাই। যাহারা সূর্য্যদেবের অদর্শনে আপনাদের আশ্রয়ের বাহিরে থাকিতে ভালবাসে না, তাহারা স্ব স্ব আশ্রয়াভিমুখে প্রধাবিত হইতে লাগিল। ইহাদের মধ্যে দিবাচর পক্ষী এবং গৃহপালিত পশুগণের আশ্রয় প্রাপ্তির ব্যগ্র-তাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। তাহারা বিশ্রামলাভার্থ আশ্রয়লাভের জন্য ব্যস্ত হইতে লাগিল। জটাধর স্বপ্নকথার সূত্র ধরিলেন।

জটাধর বলিতে লাগিলেন, “দেখ ভবরঙ্গিকা! শুন যোগমায়া! মঙ্গল সমাচার!—ভগবান তোমাদের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন! নিজেই তোমরা লক্ষ্মী!—লক্ষ্মীশ্রী প্রাপ্ত

হইয়াছ,—লক্ষ্মী তোমাদের উপর কৃপা করিয়াছেন। লক্ষ্মীশ্রী ছিলই, তথাপি, তোমরাই যেন মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী আসিয়াছ! তোমরাই যথার্থ ভক্তিভাবে কমলার পূজা করিতে শিখিয়াছ। আচ্ছা যোগমায়া, এবারে যেদিন আমি এখানে প্রথম আসি, সে দিন কি তুমি আমারে চিনিতে পারিয়াছিলে?"

হাস্য করিয়া যোগমায়া উত্তর করিলেন, "এই বুঝি আপনার স্বপ্ন?—দুমাস ছমাসে বাপকেও বুঝি লোকে ভুলিয়া যায়?"

জটাধর কহিলেন, "ভুলিয়া যাইবার কথা বলিতেছি না। এবারে সন্ধ্যাকালে যখন আমি প্রথম আসিয়া দাঁড়াইলাম, তখন কি তুমি আমাকে চিনিতে পারিয়াছিলে?"

ভবরঞ্জিকা কহিলেন, "কেন ওকথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন? সেদিন আপনার অন্যপ্রকার বেশ ছিল, এখনকার মত বেশ ছিল না, সেই জন্যই কি—"

"আহা! তুমি চুপ্ কর না!—তোমার প্রতি কোন প্রশ্ন নাই। দেখি না, যোগমায়া কি বলেন।"

যোগমায়া কহিলেন, "যোগমায়া আর কি বলিবে?—স্বপ্ন শুনিবার নিমন্ত্রণ করিলেন, যোগমায়া স্বপ্ন শুনিবে। আর কি? আপনি স্বপ্ন বলুন।"

জটাধর কহিলেন, "ঐ জন্যই ত বলিতেছি, সেদিন চিনিতে পার নাই। আমিও যখন (আজ দিবাভাগে) প্রথম স্বপ্ন দেখিতে আরম্ভ করি, তখন স্বপ্নের লোকগুলিকে প্রথমে ভাল করিয়া চিনিতে পারি নাই!"

ভবরঞ্জিকা এবং যোগমায়া, উচ্চহাস্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "সত্য সত্যই আপনার স্বপ্নে ভারি হাসি আছে!—স্বপ্নের

কথা আরম্ভ করিবার অগ্রেই আপনি আমাদের হাসাইয়া মারিলেন! পায়ে ধরি, ডালপালা ছাড়িয়া, স্বপ্ন বলুন।”

জটাধর বলিতে লাগিলেন, “দেখ, আমি ত ঘুমুলেম! ঘুমুলেম ত ঘুমুলেম,—একেবারেই যেন অচেতন!—সেই অচেতনের ভিতরেও যেন চাহিয়া দেখিলাম, একটী রাজপুরী। খাসা একখানা অট্টালিকা!—বুঝ্‌তেই পেরেছ কেমন,—ঠিক যেন একখানা রাজপুরী!—সেই বাড়ীর অন্দরের গবাক্ষে আমি যেন বসিয়া রহিয়াছি। বুঝ্‌লে কি না?—বসিয়া বসিয়াই যেন ঘুমাইতেছি!—বুঝ্‌লে কি না?”

ভবরঙ্গিকা জিজ্ঞাসা করিলেন,“অট্টালিকাখানা কোন্ দেশে?” যোগমায়াও সেই প্রশ্নের প্রতিধ্বনি করিয়া তাহাতে যোগ করিলেন, “ অট্টালিকাখানা কাহার?”

জটাধর উত্তর করিলেন, “কোন্ দেশে, কাহার, কি বৃত্তান্ত, এত কথায় তোমাদের দরকার কি?—ছোট ছোট মেয়ে,—অতশত খোঁজে কেন তোমাদের অভিলাষ?—বলিতে বসিয়াছি, বলিয়া যাই; শুনিতে বসিয়াছ, শুনিয়া যাও!—বস্ আছে!”

অঞ্চলে মুখ ঝাঁপিয়া হাসিয়া যোগমায়া মৃদুস্বরে কহিলেন, “আচ্ছা, বলিয়া যান।”

জটাধর আবার আরম্ভ করিলেন, “ বুঝ্‌লে কি না?—আমি যেন সেই অট্টালিকাখানার অন্দরের গবাক্ষে বসিয়া রহিয়াছি। নীচেই একটা বাগান।—বুঝ্‌লে কি না?—সেই বাগানে যেন অনেকরকম গাছপালা। বুঝ্‌লে কি না?—আমি যেন সেই সকল গাছপালাই দেখিতেছি। দেখিতে দেখিতে দেখি, একটী বকুলগাছ।—সেই বকুলতলায় দেখি, দিব্য একটী মেয়ে!

আশ্চর্য্য মেয়ে! কিন্তু বেহাল!—আমি যখন দেখি, মেয়ে কিন্তু তখন আমায় দেখিতে পায় নাই!"

যোগমায়া যেন একটু শিহরিয়া উঠিলেন। কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "আপনার স্বপ্নের এ জায়গাটায় হাসি নাই। আচ্ছা, বলিয়া যান।"

জটাধর বলিতে লাগিলেন, "মেয়ে আমাকে দেখিতে পায় নাই।—আমি তাহাকে কাছে আনাইয়া আদর করি, পরিচয় জানিতে চাই, কথা কয় না!—আশ্চর্য্য স্বপ্ন!—শোন একবার! দেখি ত দেখি,—বলি ত বলি,—কথা ত কথা,—স্বপ্ন ত স্বপ্ন, কিছুতেই কথা কয় না! শেষকালে ঘুমের ঘোরে,—স্বপ্নের ঘোরেই বিরক্ত হইয়া ভাবিয়া লইলাম, মেয়েটীর কথা কহিবার শক্তি নাই!—জন্মাবধি বোবা!"—পাঠকমহাশয় স্মরণ রাখিবেন, জটাধর নিজেই ভাবিয়া লইলেন, তাঁহার স্বপ্নদৃষ্ট মেয়েটী "জন্মাবধি বোবা।"

যোগমায়া নিস্তব্ধ।—পুনর্ব্বার নতমুখে মৌনবতী হইয়া রাজরাণী কি চিন্তা করিলেন, ভবরঞ্জিকা তাহা বুঝিলেন না। জটাধরও একটু একটু বুঝিলেন কি না, তাহাও বুঝা গেল না। যোগমায়া কি ভাবিলেন, একটু একটু মাথা নাড়িলেন,—নতমুখেই যেন একটুখানি হাসিলেন। তৎক্ষণাৎ সে ভাবটী গোপন করিয়া বুদ্ধিমতী যোগমায়াসুন্দরী প্রফুল্লবদনে জটাধরকে কহিলেন, "বাবা! আপনার স্বপ্নগুলি কিন্তু বেশ হয়!—যখন যাহা স্বপ্ন দেখেন, তাহাই যেন আমার মতন!—এটীও বেশ স্বপ্ন! আমিও যেন একদিন ঐরকম স্বপ্নে ঐরকম একটী মেয়ে পেয়েছিলেম! সে মেয়েটীও কথা কয় না,— স্বপ্নের মেয়ের

প্রায়ই বুঝি ঐ রকম কথা কয় না!—বেশ স্বপ্ন!—বেশ স্বপ্ন! তার পর কি হলো?"

জটাধর কহিলেন, "তার পর তাই হলো!—স্বপ্ন কি না, বোবাই সাব্যস্ত হলো।—ক্রমে ক্রমে যেন আরও বেশী বোবা হইয়া গেল! আমিও যেমন মরামানুষ,—তাতে,—বুঝ্‌তেই ত পার,—আমি হলেম ঘুমন্ত মানুষ,—ঘুমন্ত না মরন্ত,—সব কথা কি শুন্তে পাওয়া যায়?—কাজেই স্বপ্নের মেয়েটী যেন আমার কাছে এসে আরো বেশী বোবা হইয়া গেল!"

মুখ তুলিয়া যোগমায়াদেবী কহিলেন, "আমার বোবাও ক্রমে ক্রমে আরও বোবা হইয়া যাইতেছিল!"

জটাধর জিজ্ঞাসা করিলেন, "হইল না কেন?"

"সেটাও ত স্বপ্নের কথা।—আপনার বোবাও আবার দেখা দিলে, বেশী বোবা না থাকৃতে পারে।—আমার বোবাও গোটা-কতক স্বপ্নের পর যেন একটু ভাল হইয়া আসিতেছিল।"

চমৎকৃত হইয়া জটাধর কহিলেন, "গোটাকতক স্বপ্ন? গোটাকতক স্বপ্নেই কি একরকম একটী বোবামেয়ে তোমার কাছে উপস্থিত হইয়াছিল?"

"হ্যাঁ গো!—নিত্যই যেন উপস্থিত হইয়াছিল!—এখনো যেন হয়!—তা যা হোক্, আপনার স্বপ্নটী সেরে ফেলুন।—মেয়ে-মহলে কথা আছে, দিনের স্বপ্ন, দিনেই গল্প করিয়া সারিতে হয়। রেতের স্বপ্ন, আবার নূতন রাত আসিলে গল্প করিয়া প্রকাশ করিতে হয়।"

একটু মুখভারী করিয়া ভবরঞ্জিকা কহিলেন, "যোগীর আমা-দের সব কথাই উল্‌টো!—দিনের স্বপ্ন দিনে বলে না,—রেতের

স্বপ্ন রেতে প্রকাশ করিতে নাই। দাদাবাবু সব জানেন!—সেই জন্যই আড়ম্বর করিয়া সন্ধ্যাকে ডাকিতেছেন।"

সন্ধ্যাকে ডাকিতে হয় না।—কেহ ডাকিলেও সন্ধ্যা আসে না।—না ডাকিলেও সন্ধ্যা কদাচ অর্দ্ধপথ হইতে ফিরিয়া যায় না। আপনা হইতেই সন্ধ্যা আসিল।—দ্বারকাদাসের অন্দর-মহলে ঘরে ঘরে বাতী জ্বলিল।—যেখানে বসিয়া স্বপ্নের গল্প হইতেছিল, সেখানেও একটী ছোট রকম বসা ঝাড় বসিল।

যোগমায়া কহিলেন, "তোমার দাদাবাবু সব কথা জানেন, আমিও তা জানি। উনি আমাদের সকলকেই ভালবাসেন, আমিও তা বেশ জানি।—স্বপ্নের কথা আমি যদি উল্টো বুঝিয়া থাকি, উনিও তবে ত উল্টো করিয়াছেন! সূর্য্য থাকিতে থাকিতে দিনমানের স্বপ্নকথা কেন উনি আরম্ভ করিলেন? বাতী জ্বালিবার পূর্ব্বে স্বপ্নযোগের বোবামেয়েটীর কথা কেন উনি উত্থাপন করিলেন?"

জটাধর হাস্য করিয়া যোগমায়ার কাণে কাণে অনেকগুলি কথা বলিলেন। কাণে কাণে কথা বলিয়া নিতান্ত চুপি চুপি নয়,—ভবরঞ্জিকাও তাহার দুটী পাঁচটী কথা শুনিতে পাইলেন। শুনিতে পাইলেন বটে, কিন্তু কাহাদের কথা, তাহা ঠিক করিয়া বুঝিতে পারিলেন না।

সবিস্ময়ে জটাধরের মুখপানে চাহিয়া যোগমায়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি তাহাকে জানেন?"

"অনেক জানি!"—সংক্ষেপে এইটুকুমাত্র উত্তর দিয়া সহর্ষে জটাধর একবার হাস্য করিলেন,—একবার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

হর্ষহাস্য আর দীর্ঘনিশ্বাস, এক সঙ্গে খেলা করে, ইহা সকলের বদনে ও সকলকার নাসিকায় সকল সময় পরিলক্ষিত হয় না। জটাধরের বদনে পরিলক্ষিত হইল। কেন তিনি হাসিলেন,—কেনই বা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, যোগ-মায়া কিম্বা ভবরঞ্জিকা কেহই তাঁহাকে সেক্ষেত্রে সে কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। হঠাৎ বা কিসের আহ্লাদ,—হঠাৎ বা কেন বিষাদ, জটাধর নিজেও তাহা বুঝাইয়া দিবার প্রয়াস পাইলেন না। যোগমায়ার কাণে কাণে তিনি এইমাত্র যে সকল কথা বলিলেন, তাহার একটী কথায় যোগমায়ার অত্যন্ত কৌতূহল বৃদ্ধি হইয়াছিল। সেই কৌতূহলের উপ-দেশে অনায়াসেই তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন, জটাধরের স্বপ্ন এবং তাঁহার নিজের অতিথিস্থাপন, দুটীই যেন এক প্রকার। জটাধরও বলিলেন, অনেক জানি।—ব্যাপার কি?

যোগমায়া শীঘ্র এ ব্যাপারের মীমাংসা করিতে পারিলেন না। জটাধরের যে কথাটী শুনিয়া যোগমায়ার কৌতূহল বাড়িল, সে কথাটী অপর আর কিছুই নহে. সেই অভাগিনী বনবালার পরমযত্নের অঞ্চলরত্ন—অভাগিনীর জীবনকাহিনীপূর্ণ সেই সংক্ষিপ্ত নিদর্শনপত্রিকা। পত্রিকাখানি পাঠ করিলেও যে ফল, জটাধরের স্বপ্নের কথা সবিস্তারে শ্রবণ করিলেও প্রায় সেই ফল। বরং পত্রিকাগর্ভে অনেকগুলি বেশী কথা আছে, জটাধরের স্বপ্নে তাহা আইসে নাই। পত্রিকাখানি পাঠ করিলেই জটাধরের স্বপ্নবৃত্তান্তটী আর পৃথক করিয়া বলিবার প্রয়োজন হইবে না। পত্রিকাবৃত্তান্তকে স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিয়া গ্রহণ করিলেই পাঠকমহাশয়েরা সন্তুষ্ট হইতে পারিবেন।

জটাধর সেই পত্রিকাখানি চাহিলেন। পত্রিকাখানি পাই-লেন। মনে মনে সমস্তই একবার দেখিয়া লইলেন।, যেরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, সমস্তই প্রায় ঠিক ঠিক মিলিল, কেবল শেষের গুটীকতক কথা নূতন বোধ হইল। স্বপ্নে ততদূর পর্য্যন্ত জটাধরের অগ্রসর হওয়া হয় নাই।—খানিকদূরেই নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল!—যাহা হউক, বনবালার পত্রিকাতে আর জটাধরের স্বপ্নতে এপ্রকার চমৎকার মিলন, বড়ই আশ্চর্য্য! জটাধর নিজেও গৌরব করিয়া কহিলেন, "তোমাদের পত্রিকার সঙ্গে আমার স্বপ্নপদার্থের মিলনটী অভাবনীয় আশ্চর্য্য!"

সত্যই অভাবনীয় আশ্চর্য্য!—জটাধরের দিবা-নিদ্রা এবং দিবা-স্বপ্ন যদি কোন অংশে অসত্য না হয়, তাহা হইলে পত্রিকার সহিত ঐ মিলনটী যথার্থই অভাবনীয় আশ্চর্য্য! জটাধরের প্রকৃতি যেমন যেমন দেখিয়া আসা যাইতেছে, তাহাতে ত তাঁহাকে অসত্য বক্তা বলিয়া দোষারোপ করিতে সন্দেহ জন্মে। তবে কি?—ইহার মধ্যে কোন প্রকার নিগূঢ় রহস্য আছে কি?—জটাধর জানেন।

পত্রিকাখানি যোগমায়ার হস্তে কি প্রকারে আসিয়াছিল, পাঠকমহাশয় তাহা ইত্যগ্রেই অবগত হইয়াছেন। জটাধর সেই পত্রিকাখানি কিঞ্চিৎ উচ্চকণ্ঠে স্পষ্টাক্ষরে পাঠ করিলেন। পাঠ শ্রবণ করিয়া ভবরঞ্জিকা কিয়ৎক্ষণ অবাক্ হইয়া রহিলেন।

জটাধর স্বপ্নে দেখিয়াছেন, এক অট্টালিকার সমীপস্থ উদ্যানে বৃক্ষতলে বোবামেয়ে!—পত্রিকা পাঠ করাতে যাহা প্রকাশ পাইল, তাহাতেও বিস্তারপূর্ব্বক ঐ কথা। স্বপ্ন বড়ই সংক্ষিপ্ত, পত্রিকা তদপেক্ষা অনেকটা বিস্তৃত। ঐ পত্রিকায়

কি কি আছে, তাহার অধিকাংশই পূর্ব্বপূর্ব্ব কল্পে পাঠকমহাশয়কে একটু একটু জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। পত্রিকার অর্থই একটী বোবামেয়ের জীবনকাহিনী।—সেই কথাগুলি স্মরণ করিলেই জটাধরের স্বপ্নের কথা শ্রবণ করা হইল, ইহাই নিশ্চয়। বস্তুতঃ পত্রেই হউক, স্বপ্নেই হউক, অথবা যাহাতেই হউক, ঘটনাগুলি বড়ই আশ্চর্য্য!—বড়ই শোকাবহ!

চতুর্দ্দশ কল্প।

বনবালার প্রতিগ্রহ।

জটাধরকে সম্বোধন করিয়া যোগমায়া কহিলেন, "বাবা! আপনার স্বপ্নের বস্তুকে যদি*আমি সজীব অবস্থায় সম্মুখে আনিয়া দেখাইতে পারি, তাহা হইলে কি হয়?"

"আমিও তোমার মুখে ঐ কথাটী শুনিবার জন্য স্বপ্নের কথায় ততটা আড়ম্বর জুড়িয়াছিলাম।" মৃদু মৃদু হাস্য করিয়া জটাধর ঐ কয়েকটী গোলমেলে বাক্য উচ্চারণ করিলেন। পশ্চাৎদিকে একবার ফিরিয়া চাহিয়া, ভবরঙ্গিকাকে সম্বোধনপূর্ব্বক তিনি একটু বিস্মিতভাবে কহিলেন, "ভাব কিছু বুঝিতেছ?"

ভবরঙ্গিকাও একটু চমকিত হইয়া উত্তর করিলেন, "আগে হইলে হয় ত বুঝিতাম না, এখন কিছু কিছু বুঝিতেছি। বোবামেয়ে আমা—"

"না—না—না।—ওকথা বুঝিতে বলিতেছি না। তোমার যোগী বলিতেছেন, আমার স্বপ্নের বস্তুকে এখানে সজীব আনিয়া দেখাইবেন!—সে কথার ভাব কিছু বুঝিতেছ?"

ভবরঞ্জিকা একটু চুপ করিলেন।—যোগমায়া কহিলেন, "বুঝিবার অপেক্ষা কি? আমি যাঁহাকে সজীব আনিয়া দেখাইতে পারি, তাঁহাকে সশরীরে আনিয়া উপস্থিত করিলেই ত সকলের চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন হইবে। বুঝিতে যাঁহাদের কিছু বাকী আছে, মূর্ত্তি দেখিলে তাঁহাদের আর কিছুই বুঝিতে বাকী থাকিবে না।"

জটাধর একটু যেন থতমত খাইয়া যোগমায়াকে কহিলেন, "এখানে ত বেশী লোক নাই বাছা! কেবল তুমি, আমি, আর ভবরঞ্জিকা। তবে কেন ও রকম করিয়া, "যাঁহাদের,—তাঁহাদের, সকলের" ইত্যাদি গোলের কথা বলিয়া আমাকে ভয় দেখাইতেছ? কেহ কি লুকাইয়া শুনিতেছে না কি?—কাহাকেও দরজার পাশে লুকাইয়া রাখিয়াছ না কি?"

হাস্য করিয়া যোগমায়া কহিলেন, "গোলের কথা তুলি নাই, কাহাকেও লুকাইয়া রাখি নাই, লুকাইয়া কেহ শুনিতেছে না, আমি কেবল আমার আপনার কথাই বলিতেছি। যদি আমি আপনার স্বপ্নের নিধিকে নজরের নিধি করিয়া দিতে পারি, তাহা হইলে কি হয়?"

হাস্য করিয়া সুচতুর জটাধর কহিলেন, "ওকথার উত্তর আমার বন্ধু দিবেন।"

ভবরঞ্জিকা হাসিয়া হাসিয়া বলিলেন, "বন্ধু উত্তর দিতে পারিবেন না।"

"জটাধর জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন?"—ভবরঙ্গিকা সমভাবে উত্তর করিলেন, "স্বপ্নের নিধিকে ক্ষণকালমাত্র নজরের নিধি করিতে গিয়াই আপনার বন্ধুটী মূর্চ্ছা গিয়াছিলেন!"

যোগমায়া হাসিয়া উঠিলেন। জটাধর হাসিবেন মনে করিলেন, হাসিতে পারিলেন না। যোগমায়া এতক্ষণ বসিয়া ছিলেন, সহসা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বিনম্রভাবে জটাধরকে কহিলেন, "পিতা! এখানে আমার দুই কথা।—স্বপ্নের বস্তুকে এখানে আনিব, কিম্বা আপনি নিজে আপনার সেই মনোময় স্বপ্নের বস্তুর কাছে যাইবেন?"

একটু যেন চিন্তা করিয়া উত্তরচ্ছলে জটাধর প্রশ্ন করিলেন, "সে বস্তু কতদূর?"

যোগমায়া কহিলেন, "দূর নয়!—স্বপ্নে যাহা দেখা যায়, স্বপ্ন ভাঙ্গিলে বোধ হয় যেন সে স্বপ্ন দূরে গেল। যায়ও তা। কিন্তু সব স্বপ্ন সমান নয়। আপনার এ স্বপ্নটী আমাদের বেশ কাছেই আছে।"

"কাছেই আছে" শ্রবণ করিয়া, স্বপ্নের কাছে যাওয়াই জটাধরের মতস্থির হইল। তিনজনে এক সঙ্গে যাওয়াই অবধারিত পরামর্শ। এর ভিতর আবার এ কি?—স্বপ্ন দর্শনে যাত্রা করিবার অগ্রেই যে, ঘরের ভিতর সংখ্যা বাড়ে!—এটী কে? স্ত্রীলোক!—এ কি!—স্ত্রীলোকটী কোথাকার?

সত্যই ত তাই!—চুপি চুপি আর একটী স্ত্রীলোক ভবরঙ্গিকার পার্শ্বদেশে লুকাইয়া রহিয়াছে!—সত্যই হয় ত তবে জটাধরের অনুমান। এই স্ত্রীলোকটীই হয় ত ঘরের ভিতর দরজার ধারে লুকাইয়া দাঁড়াইয়া চুপি চুপি স্বপ্নকথা

উপকর্ণন করিতেছিল! সত্যই তাই!—প্রমাণে প্রকাশ পাইল, সত্যই তাই! ঐ স্ত্রীলোকটী প্রচ্ছন্নভাবে অন্তরালে দাঁড়াইয়া প্রথমাবধি জটাধরের সহিত যোগমায়ার সমস্ত কথোপকথন উপকর্ণন করিয়াছে। স্বপ্নদর্শনে যাত্রা করিবার মঙ্গলাচরণ শুনিয়াই এখন চুপি চুপি বাহির হইয়া আসিয়াছে। স্ত্রীলোকটী আমাদের যোগমায়াদেবীর প্রধানা সহচরী। ইহার নাম শিশিরকুমারী। যোগমায়া ইহাকে গোলাপফুল বলিয়া ডাকেন। বনবালা ওখানে যোগমায়ার আগমনপ্রতীক্ষায় উদ্যানভবনের বাহিরের কক্ষে বারম্বার আসিতেছে আর যাইতেছে। বনবালা আজ আর অন্য বিষয়ে তত অন্যমনস্ক নাই, যোগমায়া আসিবেন বলিয়াই বনবালা অন্যমনস্ক।

রাত্রি চারি দণ্ড।—যোগমায়া, ভবরঞ্জিকা, জটাধর, শিশির-কুমারী, এই চারিজনেই টিপিটিপি উদ্যানভবনে উপস্থিত। তিনজনকে একটু অন্তরালে রাখিয়া যোগমায়াদেবী প্রফুল্লবদনে গৃহমধ্যে প্রবেশিলেন। প্রথম কক্ষ পার হইয়া দ্বিতীয় কক্ষে যাইতেছেন, মধ্যে বনবালার সঙ্গে দেখা হইল। বনবালা একটু হাসিল। যোগমায়াদেবী বনবালার হাত ধরিয়া বহির্কক্ষে আনিয়া বসাইলেন। সেই সময় যোগমায়ার ওষ্ঠ-রসনায় নূতন একপ্রকার সঙ্কেতধ্বনি বিস্ফুরিত হইল। যাঁহারা বাহিরে ছিলেন, তাঁহারা সেই সঙ্কেত শুনিবামাত্র হাসিতে হাসিতে গৃহমধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

জটাধরকে দেখিয়াই বনবালা শিহরিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ মুখখানি অবনত করিয়া, ভয়ে, সংশয়ে, লজ্জায়, এককালে জড়ীভূতা হইয়া পড়িল।—কাঁপিতে লাগিল। জটাধরকে দেখিয়া

বনবালার এ ভাব হইল কেন, বনবালাই তাহা বুঝিতে পারিল। জটাধর যদি কিছু বুঝিয়া থাকেন, তিনিও বুঝিলেন।

জটাধর আসিয়াছিলেন, প্রবেশ করিয়াছিলেন, চকিতের ন্যায় ক্ষণকাল বনবালার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াও ছিলেন, কিন্তু বসেন নাই।—বসিবেন ভাবিয়াছিলেন, ক্ষণকাল বনবালার দেহের উপর নয়ন রাখিয়াছিলেন, কিন্তু বসেন নাই। বসিতে পারেন নাই। ভোঁ করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। এককালেই একদৌড়ে উদ্যানবাটী হইতে পলায়ন!

যোগমায়া হাসিলেন।—ভবরঞ্জিকা স্তম্ভিতা হইলেন। শিশিরকুমারী কিছুই বুঝিল না। কেবল ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া দরজার দিকে চাহিয়া রহিল। জটাধর যখন পলাইলেন, বনবালা তখন একটীবার পলকমাত্র মুখ তুলিয়া চাহিয়া তৎক্ষণাৎ আবার নতমুখী হইলেন। মুখে কোন প্রকার বিস্ময়, বিষাদ, কষ্ট, অথবা আনন্দের লক্ষণ লক্ষিত হইল না। কেবল বোধ হইল যেন, সলজ্জভাব!

কেন?—জটাধরকে দেখিয়া বনবালার লজ্জা হইল কেন? জটাধরের সঙ্গে আর কখনও কি আর কোথাও বনবালার সাক্ষাৎ হইয়াছিল?—তাহা ত কোথাও প্রকাশ নাই। অথচ তাহাই যেন সম্ভব বোধ হয়। কেন না, দুই দিকেই দেখা যাইতেছে, সেই লক্ষণ!—সুলক্ষণ কি কুলক্ষণ, বুঝা যায় না,—ইঁহাদের যেন পূর্ব্বে আর কোথাও দেখাসাক্ষাৎ আছে, গতিকে ঠিক তাহাই প্রতিপন্ন হইয়া গেল। লজ্জায় বনবালা নতমুখী হইল, জটাধর ছুটিয়া পলাইলেন!—ইহা কি কখনও নূতন ব্যাপার বলিয়া বিবেচনা হইতে পারে?—উভয়ের এখন যদি এই

উদ্যানভবনে নূতন দেখা হইত, তাহা হইলে এমন হইবে কেন ? বনবালার লজ্জার আবির্ভাব বরং প্রকৃতিসিদ্ধ, কিন্তু জটাধরের পলায়নের ত কোন হেতুই অন্বেষণ করিয়া পাওয়া যায় না!—সবেমাত্র এই হেতুটী অনুমান করিয়া লইতে হয় যে, পূর্ব্বে একবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, কোন কারণে হয় ত তাহাতে কোনপ্রকার অপ্রিয় ঘটনা ঘটে;—যে ঘটনায় উভয়কে দেখিলেই উভয়ের লজ্জা হওয়া সম্ভব।—এমনও হইতে পারে যে, একজন হয় ত কোন বিষয়ে একের কাছে কোনপ্রকারে অপরাধী আছে, একজনকে দেখিলেই অপরাধী লোক ভয় পাইয়া অথবা লজ্জা পাইয়া পলায়ন করে। এখানে ত অপরাধের আশঙ্কা করিবার কোন লোক নাই। যাঁহারা ঘরে আছেন, তাঁহারা ত কেহই কাহারও অপরাধের কল্পনা করিতে জানেন না। বিশেষতঃ বনবালার স্বভাবও দেখা গেল, জটাধরের স্বভাবও দেখা যাইতেছে, ইঁহারা ত কেহ কাহারও নিকটে অপরাধী হইবার পাত্র নহেন। বনবালা জানতপক্ষে কাহারো কাছে কোন দোষ করিবে, এটা ত বড় অসম্ভব কথা!—জটাধর যেপ্রকার প্রকৃতির লোক, তাহাতে তিনিও যে প্রতারণা করিবেন, একথাটাও অবিশ্বাস্য।

তবে এমন ঘটনা কেন হইল ?—জটাধর পলায়ন করিলেন কেন ?—সে ঘরে আর এ মীমাংসা হইল না। বনবালার লজ্জা ভাঙ্গিলে বনবালার সহিত অনেকগুলি দস্তুরমত ইসারা চালাইয়া, অনেকগুলি দস্তুরমত ইসারার উত্তর পাইয়া, প্রায় এক ঘণ্টা থাকিয়া, ভবরঞ্জিকা, যোগমায়া ও শিশিরকুমারী, গৃহ হইতে সে রাত্রের মত বিদায় গ্রহণ করিলেন।

রাত্রি বড় বেশী হয় নাই।—বড় জোর একপ্রহর। জটাধর উদ্যান হইতে পলায়ন করিয়া এককালে দ্বারকাদাসের বৈঠকখানায় আসিয়া প্রবেশ করিয়াছেন। দ্বারকাদাসও তাহার কিঞ্চিৎ অগ্রে গৃহে আসিয়া বৈঠকখানায় বসিয়াছেন। উভয়ে বেশ হাস্যকৌতুক চলিতেছে। এই দেখুন এক আশ্চর্য্য তামাসা!—জটাধর কেমন বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া উদ্যানগৃহ হইতে পলায়ন করিয়াছেন, এখন কেমন প্রফুল্ল হইয়া বন্ধুর সহিত খোসগল্প করিতেছেন!—এ কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! জটাধর এমন লোক,—বয়স হইয়াছে,—প্রবীণ, ইহাঁর চিত্তের কি কোন ব্যবস্থা নাই?—এই রুষ্ট, এই তুষ্ট,—এই সহাস্য, এই বিষণ্ণ, এই নাস্তিক,এই শাক্ত, ক্ষণে ক্ষণে এরূপ চিত্তবিকার প্রাপ্ত হওয়া অর্ব্বাচীনের লক্ষণ!—জটাধর ত অর্ব্বাচীন নন,—তবে ইহাঁর চিত্তের এরূপ অব্যবস্থা কেন?

বোধ হয় কোন কারণ আছে।—বোধ হয়, বনবালা-জড়িত কোন গুহ্যব্যাপারে দ্বারকাদাস, জটাধর এবং যোগমায়ার যোগ আছে। তাহা না হইলে জটাধরের তুল্য শান্তপ্রকৃতির এমন অস্থিরতা কথনই সম্ভবে না। কথার ভাবে তাহাই যেন, ঠিক সেই যোগাযোগের ভাবটাই যেন কতকটা ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে ঘন ঘন আসিয়া পড়িতেছে।

জটাধর কহিলেন, "বন্ধু! ভাল তামাসাই লাগাইয়াছ! বনে যাহাকে দেখিয়াছিলাম, সেই মেয়েটী তোমার বাগানে! ব্যাপারখানা কি?—সংবাদ রাখ কিছু?"

হাস্য করিয়া দ্বারকাদাস কহিলেন, "রাখি ভাই!—মাপ্ কর! তাহা তোমাকে বলিতে মনে ছিল না। বনবালা আসিয়াছে।

যোগমায়া তাহাকে আশ্রয় দিয়া রাখিয়াছেন। জটাধর! ভাই! এখন করা যায় কি?"

"তুমি কি তাহাকে দেখিয়াছ?"

"নিত্যই দেখি!—বনবালা চক্ষের জলে ভাসে,—আমিও চক্ষের জলে ভাসি!"

জটাধর কহিলেন, "অতটা ভাসাভাসি ভাল নয়!—হয় একটা বন্ধাবন্ধি কর, না হয় এককালে একটা কাটানছাড়ান করিয়া দাও!"

দ্বারকাদাসের বদন বিবর্ণ হইল।—সকাতরে বন্ধুর দুটী হাতে ধরিয়া মিনতিবচনে কহিলেন, "বন্ধু! মাপ্ কর!—ঐ শেষের কথাটী আর আমার কর্ণে উচ্চারণ করিও না!"

কতই যেন বিস্ময় প্রকাশ করিয়া জটাধর কহিলেন, "কি! কাটানছাড়ানে তুমি রাজী নও?—দেশে দশজনে তোমাকে মানেগণে, সেই জন্যই বোধ করি, এতদিন সকল চুপ্‌চাপ্ রহিয়াছে। তাহা না হইলে,—তুমি একজন আমার মতন ফিক্রু লোক হইলে মজাটা টের পেতে!—দেশের এখন যে রকম ভয়ানক দুর্দ্দশা, তাহাতে শুদ্ধমাত্র গঙ্গাজল খাইয়া, শুদ্ধসত্ত্ব সন্ন্যাসী হইয়াও জাতিবাঁচানো দায়!—তাহার উপর আবার কিছু গন্ধ পাইলে সমাজের প্রবল ছদ্মবেশী গর্ব্বিতলোকেরা তাহাদের অপেক্ষা দুর্ব্বল লোকের কি আর রক্ষা রাখে?—তুমি ত জ্ঞানবান্ আছ,—বুদ্ধিমান আছ,—বিবেচক আছ,—বিবেচনা কর, কোথাকার এক বেদেশিনী, কাহার কন্যা, কি জাতি, কোথায় নিবাস, এদেশের কেহই কিছু জানে না;—তুমি তাহাকে আনিয়া বাটীতে রাখিয়াছ;—বাটীতেই রাখ, আর বাগানেই রাখ,

সমান কথা! আর কেবল তাহাও নয়,—একসঙ্গে আহারাদিও চলে!—লোকে কি ইহা জানিতেছে না?—লোকে কি ইহা শুনিতেছে না?—লোকে কি ইহা কাণাকাণি করিতেছে না? অবশ্যই করিতেছে। কেবল তোমাকে ভাললোক বলিয়া খাতির করে বলিয়াই, শীঘ্র শীঘ্র কেহ কিছু বলিতেছে না। কিন্তু ভাব দেখি বন্ধু, চিরদিন কি এইরূপ চলিবে?—তুমি যখন কাটানছাড়ান করিতে পারিবে না বলিতেছ, তখন কোন প্রকার দম দিয়া তাড়াইয়া দিতেও পারিবে না, এটী নিশ্চয়। কাটানছাড়ান অপেক্ষা তাড়াইয়া দেওয়াটা আরও বরং বেশী কষ্ট!—তবেই বোধ কর, সমাজের ধূর্ত্তলোকেরা কি চিরদিন চুপ করিয়া থাকিবে?—গোলে পড়িবে, ফ্যাঁসাতে পড়িবে, মান রাখিতে পারিবে না। সেই জন্যই বারম্বার বলিতেছি, শীঘ্র শীঘ্র সাবধান হও! একটা কিছু বন্দোবস্ত কর। হয় এদিক, নয় ওদিক!"

"না ভাই, আমি কিছুই পারিব না!—কাতরভাবে কম্পিত-কণ্ঠে দ্বারকাদাস কহিলেন, "না ভাই, আমি কিছুই পারিব না! তুমি বলিলে, এটা সহজ, ওটা কঠিন;—আমি ত বোধ করি, অনাথিনী বনবালার কপালের সঙ্গে যাহা কিছু জোড়াগাঁথা, আমি সর্ব্বক্ষণ তাহার সঙ্গে জোড়াগাঁথা থাকি, সর্ব্বক্ষণ আমার সেই চিন্তা,—সেই ইচ্ছা,—সেই প্রত্যাশা!"

গম্ভীরমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া জটাধর কহিলেন, "যদি এমন, তবে তাহাকে "অনাথিনী" কেন বল?—নাথিনী করিয়া লও! সাহস থাকে,—এসো,—দেশের লোককে সাহস দেখাও! প্রকাশ্যরূপে বিবাহ কর! তাহা—"

শিশিরকুমারী প্রবেশ করিল। দ্বারকাদাস তাহাকে দর্শন করিয়া, আগেকার কথাটা চাপা দিবার অভিপ্রায়ে শিশির-কুমারীকে প্রথমেই প্রশ্ন করিলেন, "শিশিরকুমারি! তুমি না বনবালার কাছে গিয়াছিলে?"

শিশিরকুমারী উত্তর করিল, "হ্যাঁ,—আমরা তিনজনেই গিয়েছিলেম। একটু পূর্ব্বেই ফিরে এসেছি।"

ব্যগ্রভাবে দ্বারকাদাস কহিলেন, "হাঁ, চল, আমিও যাইব। আমারও তাঁহাদের কাছে প্রয়োজন আছে!"—জটাধরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বন্ধু! তুমিও এসো; তোমাকেও সেখানে উপস্থিত রাখা চাই।"

বৈঠকখানায় চাবী পড়িল। জটাধরকে লইয়া, শিশিরকুমারীর সঙ্গে মহাশয় দ্বারকাদাস অন্দরমহলে চলিলেন। ক্ষণকাল-মধ্যেই সকলে একসঙ্গে মিলিত হইলেন। দ্বারকাদাসকে "মহাশয় দ্বারকাদাস" বলিতে মনে বড় আনন্দ জন্মে। ইহাঁর নামের সঙ্গে যদি একটু কিছু "আনন্দ" মিশ্রিত থাকিত, তাহা হইলে সোণার উপর রসান খুলিত!—দ্বারকাদাস সর্ব্বক্ষণই মহাশয়। তিনি এই কতক্ষণ একটী প্রবলা চিন্তার উৎপীড়নে একটু একটু অবসাদপ্রাপ্ত হইতেছিলেন, এখন সে ভাব নাই। সহাস্যবদনে সহধর্ম্মিণীযুগলকে নিকটে বসাইয়া রহস্যালাপ আরম্ভ করিয়া দিলেন। সর্ব্বপ্রথমে যোগমায়াদেবী জটাধরের দিকে চাহিয়া বিনীতভাবে কহিলেন, "পিতা! মাপ করিবেন, আপনার সম্মুখে আজ আমি গুটীকতক সংসারের কথা তুলিব। ইনি সর্ব্বদাই কিছু কিছু বিষণ্ন থাকিয়া আমার প্রাণে অত্যন্ত কষ্ট দেন। পিতা! জগদীশ্বর জানেন, ইহাঁর চরণে আমি

কিছুমাত্র অপরাধ করি নাই। আমি যেন মনে মনে জানি, পৃথিবীতে ইনিই আমার জগদীশ্বর! কিন্তু পিতা! আমি ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, শক্তি যদি আমার প্রতি নিদয়া না হন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি ইহাঁকে সুখী করিব!—আমার প্রাণ দিলে যদি পতি সুখী হন, তাহাতেও আমি প্রস্তুত থাকিব। নিরপরাধে আমারে বর্জ্জন করিলে যদি পতি সুখী হন, তাহাতেও আমি সর্ব্বক্ষণ প্রস্তুত থাকিব। সংসারে দাসী হইয়া রহিব, তাহাও স্বীকার, তথাপি প্রতিজ্ঞা,—নিশ্চয় প্রতিজ্ঞা, স্ত্রীজাতির প্রতিজ্ঞা,—নিশ্চয়ই পতিকে সুখী করিব!"

জটাধর কহিলেন, "কিসে তুমি পতিকে সুখী করিতে অপারক আছ মা?"

যোগমায়া উত্তর করিলেন, "আছি একবিষয়ে।—সে কথা আমি আজ পিতার সাক্ষাতে পতিকেই বলিব। পতির কথা, পতিকেই বলা কর্ত্তব্য।"—এই প্রকার একটু ভূমিকা করিয়া পতিকে সম্বোধনপূর্ব্বক সতী কহিলেন, "সাধু আপনি!—আপনি রাজা হইয়াছেন!—ধর্ম্মশীল রাজার জামাই হইয়াছেন! বনবালা রাজার মেয়ে!"

সজীব বিস্ময়ভাবকে অন্তরে অন্তরে যত্নে গোপন রাখিয়া, বনবালার কথাটীও প্রথমে উল্লেখ না করিয়া, উৎফুল্লবদনে দ্বারকাদাস কহিলেন, "সাধ্বী তুমি!—আমি যদি রাজা হইয়াছি, তবে অবশ্যই তুমি রাণী হইয়াছ;—তুমি আমার মহিষী!" আমার মহিষী বলিয়া, যোগমায়ার আদর বাড়াইয়া, ভবরঞ্জিকাকে সম্বোধনপূর্ব্বক, মহাশয় দ্বারকাদাস পুনর্ব্বার সগৌরবে কহিলেন, "পাটেশ্বরি! সতি! তোমাকে আর ওকথা বলিতে হইবে না,

জ্যেষ্ঠা মহিষীই পট্টমহিষী হন। অতএব রাণি! তুমিই আমার পট্টমহিষী! প্রাণাধিকে! বিধিমতে, শাস্ত্রমতে, লোকাচারমতে, তুমিই আমার পট্টমহিষী!"

ক্ষুদ্র বদনখানি একটু ঘুরাইয়া যোগমায়া প্রশ্ন করিলেন, "আর বনবালা?"

দ্বারকাদাস একটু চঞ্চল হইয়া যোগমায়াকে কহিলেন, "তুমি দেবী একটু চুপ্ কর!—তুমি কেবল বনবালাকেই স্বপ্ন দেখ! হইতেছিল মহিষীর কথা, আমি তুলিলাম মহিষীর কথা, তুমি তুলিয়া দিলে রাজার কথা, একথার সঙ্গে আবার বনবালার ঢেউ তুলিতেছ কি জন্য?"

পূর্ব্বভাবে মৃদু হাসিয়া যোগমায়া কহিলেন, "ঢেউ আমি তুলিতেছি না, ঢেউ আপনি উঠিতেছে। আমিও আপনার মতন মহিষীর কথা বলিতেছিলাম।—আমি মহিষী হইলাম, দিদি মহিষী হইলেন, বনবালা মহিষী হইবে না? সেই—"

মধ্যবর্ত্তী হইয়া জটাধর কহিলেন, "অবশ্য—অবশ্য—অবশ্য! অবশ্যই বনবালার মহিষী হইবার দাবী চলিতে পারিবে। তোমার পতি যদি এদেশের প্রচলিত শাস্ত্রমতে প্রকাশ্যরূপে বনবালাকে বিবাহ করেন, তাহা হইলে বনবালা অবশ্যই মহিষী হইবে। কিন্তু সে সাহস কৈ? এতক্ষণ ঐ কথা লইয়া বৈঠকখানায় আমাকে কতই বকাইতেছিলেন, এখন যেন ভালমানুষটী হইয়া বনবালার কথায় বিরক্তি প্রকাশ করিতেছেন! সাহস কৈ?—মহিষী করে কে?"

যোগমায়া পুনঃপুন সেই পত্রিকার কথা উল্লেখ করিয়া দ্বারকাদাসকে শাস্ত্রমতে বনবালা প্রতিগ্রহে অনুরোধ করিতে

লাগিলেন। ভবরঞ্জিকার অভ্যাস হইয়াছে, তিনি একবার পতির নূতন বিবাহ দিয়া আনিয়াছেন, সহিয়া গিয়াছে, তৃতীয়-বার বিবাহ দিয়া আনিলে তিনি তাহা হাস্যমুখেই সহ্য করিবেন। বনবালার সহিত নূতন বিবাহের প্রস্তাবে ভবরঞ্জিকাও আহ্লাদপূর্ব্বক অনুমোদন করিলেন। জটাধরের নির্ব্বন্ধ বাড়িল। এখন প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ ঠিক হইলেই হয়।

সে নির্ব্বন্ধ ঠিক হওয়া মানুষের শক্তিগম্য নহে। কথাটা এতদিন চাপা ছিল, এখন যখন প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে, তখন বিধাতার নির্ব্বন্ধকে সার্থক করিবার চেষ্টা করাই উচিত।

তর্কে তর্কে পাঁচসাত দিন কাটিয়া গেল।—আর একদিন সন্ধ্যার পর ঐপ্রকারে সকলে একসঙ্গে মিলিত হইয়া, বনবালার বিবাহের কথার মীমাংসার জন্য সভা করা হয়। দ্বারকাদাস তাহাতে আপত্তি উত্থাপন করেন। সাহসের অভাব, অথবা সত্যের অপলাপ, সে আপত্তির অঙ্গীভূত নহে।—সে আপত্তি এই হইল যে, পত্নী বলিয়া স্বীকার করা হইবে, কিন্তু শাস্ত্রমতে প্রকাশ্য বিবাহের কিছু বিলম্ব আছে।

ইহাতে আর নূতন মীমাংসা কি হইল? বনবালা যেমন ছিল, তেমনি রহিল। লোকে জানিল, দ্বারকাদাসের সহিত এক বিদেশিনীর বিবাহ হইবে। এই পর্য্যন্ত মীমাংসা।

পঞ্চদশ কল্প।

কর্ম্মক্ষেত্রের খেলা।

কর্ম্মক্ষেত্র অতি ভীষণ স্থান!--দেখিতে মনোরম্য বটে, দেখিতে নয়নরঞ্জন বটে, কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্র অতি ভীষণ স্থান! কর্ম্মক্ষেত্রই মানবকুলের পরীক্ষাস্থান।—কর্ম্মক্ষেত্রেই পাপপুণ্যের পরীক্ষা হয়। জীব এই কর্ম্মক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করিয়া কতশত মূর্ত্তিতে কত স্থানে বিচরণ করিতেছে। সকলের মধ্যে মনুষ্য-জীবেরাই পাপপুণ্যের জন্য বেশী দায়ী। আমাদের এই ক্ষুদ্র আখ্যায়িকার সামান্য সামান্য নায়ক-নায়িকারা এই কর্ম্মক্ষেত্রের কত পন্থায় কত স্থানে কতপ্রকারে বিচরণ করিতেছেন, তাঁহা-দের অদৃষ্টে কতপ্রকার আশ্চর্য্য সংঘটন ঘটিয়া পড়িতেছে, তাহার ঠিক নাই। এই নিয়মেই কর্ম্মক্ষেত্র চলে।

কর্ম্মক্ষেত্র চলে না।--যাহারা কর্ম্মক্ষেত্রে বাস করে, তাহা-রাই কর্ম্মক্ষেত্রকে চালায়। কেহ মরিতেছে, কেহ জন্মিতেছে, এক দিকে বিষাদ, এক দিকে আনন্দ! কেহ কাঁদিতেছে, কেহ হাসিতেছে! ইত্যাদি হর্ষবিষাদের ক্রিয়াগুলিই কর্ম্মক্ষেত্রের ধারা। উহাতেই লোকের আনন্দ, উহাতেই লোকের নিরানন্দ! উহাতেই লোকের ভ্রম, উহাতেই লোকের মোহ, উহাতেই সর্ব্ব লোকের চিরস্থায়ী বিশ্বাস। কর্ম্মক্ষেত্রে কাহার ভাগ্যে

কখন কি ঘটে, কেহই সে কথা ঠিক বলিয়া দিতে পারেন না। বনবালা কোথায় ছিল, কোথায় আসিয়াছে, কোথায় রহিয়াছে, তাহাকে লইয়া কত কাণ্ডই হইয়া যাইতেছে, এসকল কে জানিত? তাহার অদৃষ্টে ঐ সকল ভোগ ঘটিবে, কেই বা ইহা স্থির করিয়া রাখিয়াছিল?—কেহই না। কর্ম্মক্ষেত্রের ধারাবাহিক ধারাক্রমে ভাগ্যচক্র ঘুরিতেছে। কর্ম্মক্ষেত্রকে যাহা বল, তাহাই হয়। কর্ম্মক্ষেত্রকে কবিরা সমুদ্র বলিয়া বর্ণনা করেন। তাঁহাদের বাক্যানুসারে ভবসংসারের নাম ভবার্ণব।—এ অর্ণবে অনেক তরঙ্গ।—অর্ণবের গর্ভে অনেক হিংস্রজন্তুর বাস! এক জীব অপর জীবের হিংসা করিয়া অন্য জীবের দ্বারা নিজেও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।—হিংসাতেই ধ্বংস আছে। স্পষ্টতঃ ইহা বুঝিতে পারিয়াও কর্ম্মক্ষেত্রে মোহাবিষ্ট জীবগণ হিংসাবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে পারেন না। হিংসাতেই ধনক্ষয়, বলক্ষয়, অবশেষে কুলক্ষয় হইয়া যায়। অথচ সেই হিংসাটাই কর্ম্মক্ষেত্রের একপ্রকার যেন ধরাবাঁধা নিয়ম।

বাঘেরা ছাগল হিংসা করে, কুম্ভীরেরা কুক্কুর হিংসা করে, সে সকল হিংসা অপেক্ষা মানুষের হিংসাই বিপরীত! বিপরীত ভয়ঙ্করী! অথচ, সেই বিপরীত ভয়ঙ্করী হিংসাকে কর্ম্মক্ষেত্রে ভয়ঙ্করী স্বাধীনতা না দিলে কর্ম্মক্ষেত্রের ঘটা থাকে না! মানুষেরা হিংসা করিয়া মানুষকে সর্ব্বদা প্রাণে মারে না। মারে কেহ কেহ,—মারে চোরডাকাতে,—মারে দাঙ্গাবাজ লোকে,—মারে কোন কোন অংশীদার সরিকে; কিন্তু তাহা সাক্ষাৎসম্বন্ধে হিংসার কার্য্য নহে। হিংসার সঙ্গে লোভের বিলক্ষণ সংশ্রব!

মানুষ অহরহ কর্ম্মক্ষেত্রে মানুষের উপর যেপ্রকার

হিংসা প্রকাশ করে, তাহাতে শীঘ্র প্রাণ বাহির হয় না; রহিয়া রহিয়া দাহ হইয়া যায়! আমাদের পৌরাণিক ইতিহাসগুলিকে প্রমাণস্থলে গ্রহণ করিলেও সিদ্ধ হইবে, পৃথিবীর সৃষ্টিকালাবধিই পৃথিবীতে হিংসা চলিয়া আসিতেছে। তবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে যতটুকু ছিল, এখনকার যুগে তাহার অনেকগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে! হিংসা এখন পৃথিবীর প্রায় হৃদয়ে হৃদয়ে বাস করে! একজন মানুষ সুখে থাকে, দ্বিতীয় জনের সে ইচ্ছা নহে! এক জন রাজা রাজ্যভোগ করেন, দ্বিতীয় রাজার সে ইচ্ছা নহে! তাঁহার ইচ্ছা, সমস্ত রাজ্যই আমার হউক! পরিশ্রম করিয়া একজন বেশী বেতন পায়, আর একজন অল্প বেতনে গোলামী করিয়া সেই বড়লোকটীর হিংসা করে!—গোলামেরাও পরস্পর হিংসা না করিয়া সুস্থিরভাবে কর্ম্মক্ষেত্রে মনের সুখে সঞ্চরণ করিতে পারে না।

কর্ম্মক্ষেত্রের কুহক অনেক।—এখানে পরমার্থের কুহক অতি অল্পই খাটে, পাপার্থের চর্চ্চাই অধিক হয়। কর্ম্মক্ষেত্রে যত পাপ, তাহার বেশীর ভাগ কেবল অর্থ হইতেই সমুৎপন্ন! পৃথিবীতে যত খুন হয়, তাহার বেশীর ভাগ অর্থের জন্য! ভাই ভাই বিরোধ হয়,—পিতাপুত্রে বাক্যালাপ থাকে না, সতীনারীও পতিত্যাগ করিতে বাধ্য হন, সমস্তই কেবল অর্থের জন্য!—যে অর্থে এত পাপ, সে অর্থে এত মায়া, কর্ম্মক্ষেত্রের এটী একটী আশ্চর্য্য রহস্য বলিতে হইবে। অর্থকে ভাসাইয়া লইয়া খেলা করা অপেক্ষা অর্থের ভিতর ডুবিয়া থাকা ভাল, কর্ম্মক্ষেত্রমধ্যে ইহা যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারাই মোহকূপে ডুবিয়া আছেন!

কর্ম্মক্ষেত্রের পাকচক্র অনেক।—চড়ুকীরচক্রপাকের ন্যায় এক এক পাকে উত্তীর্ণ হইতে পারিলে তবে কর্ম্মক্ষেত্রের দ্বিতীয় পাকের সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে,—নচেৎ নয়।—বাহির হইতে দেখ, দিব্য ঝক্‌মক্ করিতেছে,—ভিতরে প্রবেশ করিতে যাও, দিব্য সুগন্ধের আঘ্রাণ আসিবে।—অগ্রসর হও, আলো। আরো যাও, আলো!—অধিক দূর যাইতে ইচ্ছা করিলেই অন্ধকারে পড়িতে হয়!—ক্রমশই ঘোর অন্ধকার! পরিশেষে বিলাপ আর অশ্রুপাত! ইহারই নাম কর্ম্মক্ষেত্রের খেলা! পুত্র হইতেছে, কন্যা হইতেছে, বধূ হইতেছে, জামাতা হইতেছে, ক্রমশই বংশবৃদ্ধি। সংসারীলোকের পরমানন্দ! বিশেষতঃ হিন্দুসংসারে পুত্রপৌত্রাদি স্নেহাস্পদ পরিজনসহ একত্র বাস করাই পবিত্র রীতি;—এই রীতিই আর্য্যসমাজে বাঞ্ছনীয়। কর্ম্মক্ষেত্রও ইহা দেখাইয়া দিতেছে। কর্ম্মক্ষেত্র হইতে যাঁহারা উদাসীন হইয়া যান, তাঁহারা অনেকটা মায়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারেন। যাহারা মায়াজালে জড়ীভূত হইয়া থাকে, তাহারা থাকিয়া থাকিয়া সকল কথাই ভুলিয়া যায়! তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর অর্থই অনেক আসল কথা ভুলাইয়া দেয়! কর্ম্মক্ষেত্রে বাঙ্গালীর এখন যে অবস্থা, তাহাতে মায়ার আধিপত্য ক্রমশই বাড়িতেছে! বাঙ্গালী বেশ্‌লোক! বাঙ্গালীকে একটী চাক্‌রী দিতে পারিলেই তাহার শোক,তাপ,জ্বালা, যন্ত্রণা, সমস্তই ভুলাইয়া দেওয়া যায়! বোধ করুন, একজন মাসিক পাঁচ টাকা বেতনের মুহুরী,—যদি অকস্মাৎ নূতন পুত্রশোকের সময় সেই মুহুরী পঁচিশ টাকা বেতনের নূতন চাক্‌রীর সনন্দ পায়, তাহা হইলে সে মহুরী নিশ্চয়ই পুত্রশোক ভুলিবে! এই অর্থের দ্বারা

ভালকার্য্য অনেক সাধিত হয় সত্য, কিন্তু মন্দকার্য্য যত হয়, কর্ম্মক্ষেত্রের বর্ত্তমান অবস্থায় ভাল কার্য্য তত হইয়া উঠে না। সংসারে বিপদসম্পদ যাহাই কিছু দেখুন, সমস্তই অর্থের সঙ্গে বিজড়িত। সাক্ষাৎসম্বন্ধে যদিও দর্শনমাত্রেই অর্থ আসিয়া উপস্থিত না হয়, তথাপি কোন না কোন প্রকারে তাহার সহিত অর্থসংশ্রব ঘটিবেই ঘটিবে। কর্ম্মক্ষেত্রে অর্থই প্রধান বলিয়া ধরা হইল। যাঁহারা প্রকৃত ব্যবহার জানেন, তাঁহারাই প্রধান বলিয়া মান রাখিবেন। যাঁহারা অপব্যবহার ভালবাসেন, তাঁহারা যে কি করিবেন, তাঁহাদের সেই সকল মনের কথা তাঁহারা ভিন্ন আর কেহই বলিতে পারিবেন না।

কর্ম্মক্ষেত্রে দিন দিন কত কাণ্ড হইতেছে, কোথাকার কাণ্ড কোথায় আসিয়া মিটিতেছে, কোথাকার কোন্ কাণ্ডের কি প্রকার পরিণাম দাঁড়াইতেছে, তাহা নিশ্চয় করিয়া সহজে বলিবার উপায় নাই। কর্ম্মক্ষেত্রে এখন বিলক্ষণ চাতুরী চলিতেছে। চাতুরী করিয়া অর্থলাভে অনেক লোকেই এখন প্রাণপণে অনুরাগী হইয়াছে। এপ্রকার কর্ম্মক্ষেত্রে দ্বারকাদাসের তুল্য নিষ্কলঙ্ক লোকের পক্ষে নির্ব্বিঘ্নে ধর্ম্ম বজায় রাখিয়া চলিয়া যাওয়া অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার!

কর্ম্মক্ষেত্র এখন কলুষিত হইয়াছে।—এক্ষেত্রে কখন্ কাহার ভাগ্য কোন্ দিকে ফেরে, তাহার ঠিক নির্ণয় হয় না। যাঁহারা সৎকীর্ত্তিশালী সাধু মহাপুরুষ ছিলেন, তাঁহাদের বংশেও পাপ প্রবেশ করিতেছে।—তাঁহারা হয় ত আর কিছুদিন পরে মাথা তুলিতে পারিবেন না। দ্বারকাদাস হয় ত রণবিজয়ী হইয়া শীঘ্রই জয়ডঙ্কা বাজাইবেন। ইহাই ত কর্ম্মক্ষেত্রের গতি!

কর্ম্মক্ষেত্র চলিতেছে।—ক্রমাগতই চলিতেছে। কতদিন চলিবে, নির্ণয় নাই। সমভাবে চলিবে, কিম্বা বিপর্য্যয় ঘটিবে, তাহারও নির্ণয় নাই। পৃথিবী ঘুরিতেছে। নূতন নিউটনের অগ্রে আর্য্যবর্ষে 'কোন "পুরাতন টন্" জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কি না, সে গূঢ় তর্কের মীমাংসা এখন প্রয়োজন হইতেছে না। কর্ম্মক্ষেত্র চলিতেছে। বৃক্ষ, লতা, ভূধর, সাগর, মহাসাগর, নদী, অরণ্য, লোকালয়, সমস্তই ঘুরিতেছে। ঘুরিতে ঘুরিতে কোথায় যাইবে, কোথায় যাইয়া থামিবে, থামিবে কি না থামিবে, কর্ম্মক্ষেত্রের কর্ম্মজীবী মানুষ তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারেন কি না, তাহার কোন বিশেষ প্রমাণ নাই। কোন কোন মতে কর্ম্মক্ষেত্রের খণ্ডপ্রলয় ও মহাপ্রলয় আছে। ইংরেজ একটা মহাপ্লাবন স্বীকার করেন।—সেই মহাপ্লাবনে একমাত্র নোয়া রক্ষা পান।—সেই নোয়ানামক পুরুষের বংশ হইতেই নূতন কর্ম্মক্ষেত্রের সৃষ্টি। এটী হইতেছে ইংরাজী মত।—এ মতের সহিত আর্য্যমতের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। পুরাণে পাওয়া যায়, একবার খণ্ডপ্রলয়ের সময় প্রিয়ব্রত নামে একজন ভারতীয় রাজা এক পর্ব্বতের তলদেশে তরণীসহ আশ্রয়প্রাপ্ত হন। সময়ের সামঞ্জস্য না থাকিলেও প্রিয়ব্রতকে নোয়া বলিয়া অনুমান করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।

কর্ম্মক্ষেত্র চলিতেছে।—কর্ম্মক্ষেত্রের সৃষ্টি কত দিন, আর্য্য শাস্ত্রকারেরা তাহা নিরূপণ করিতে পারিয়াছেন কিনা, পুরাণাদি শাস্ত্রের অমিল দর্শনে তাহাতে আমরা একবিধ বিশ্বাস স্থাপন করিতে সঙ্কুচিত হই।—ইংরেজ তাহাতে সঙ্কুচিত হইবার পাত্র নহেন। ইংরেজ সচ্ছন্দে কর্ম্মক্ষেত্রের সৃষ্টি নিরূপণ করিতেছেন।

ইংরাজী বর্ণমালাসজ্জিত বড় বড় গ্রন্থাবলীতে কর্ম্মক্ষেত্রের যেরূপ আশ্চর্য্য ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহা পাঠ করিবার সময় বিস্ময় আইসে, লজ্জা আইসে, সময়ে সময়ে হাস্যও সম্বরণ করা যায় না। ইংরেজ বলেন, "পৃথিবীর যখন চারি সহস্র চারি বর্ষ মাত্র বয়ঃক্রম, সেই সময় এসিয়ার তুরুস্করাজ্যের এক নগরীমধ্যে প্রভু যিশুখ্রীষ্টের জন্ম হয়।"

প্রভু যিশুর জন্মদিন হইতে এই সবে ১৮৮৭বৎসর গণনা করা হইতেছে। তাহা হইলেই ধরুন, চারি সহস্র চারি, আর এক সহস্র আট শত সপ্তাশীতি, একুনে পাঁচ সহস্র আটশত এক-নবতিতম বর্ষে কর্ম্মক্ষেত্র এখন উপনীত। ছয় সহস্র এখনও পূর্ণ হয় নাই। ইংরাজীমতে কর্ম্মক্ষেত্র এখন শিশু!—ইংরাজী-মতে কর্ম্মক্ষেত্র এই শিশুকালে কতপ্রকার লীলাখেলা করিয়াছে, ইংরেজ বহুকষ্টে এই অপূর্ণ ছয় সহস্র বর্ষের ভাণ্ডারে তাহা ঠাসিয়া ঠাসিয়া পুরিয়া রাখিতে সর্ব্বদাই চেষ্টা পান! আর্য্যশাস্ত্র-কারেরা বলেন, "জগৎসৃষ্টির আদি থাকিলেও মানবসংসারের প্রাকৃতিক জ্ঞানে তাহা অনাদি অনন্ত।"—এই অনাদি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকে,—এই অনাদি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের স্মরণাতীতকালের ঘটনাবলীকে ইংরেজ বলেন, সেদিনের কথা! ইংরেজের বিচারে কর্ম্মক্ষেত্রের এই পর্য্যন্ত মাহাত্ম্য! সাধারণমতে আরও উচ্চ মাহাত্ম্য প্রতীয়মান হয়।

কর্ম্মক্ষেত্রের সমস্ত খেলাই বিচিত্র!—কর্ম্মক্ষেত্র রথ নহে, তথাপি ঠিক যেন চক্রে চক্রে চলিতেছে। মানুষের মনে কতই আশা,—কতই লালসা, কতই পিপাসা!—আমি গরিব থাকি, আমি কষ্টে থাকি, দশজনে আমাকে পদতলে দলন করুক,

কর্ম্মক্ষেত্রে এ ইচ্ছা কাহারও নহে। ইচ্ছা না হইলেই যে, কর্ম্মক্ষেত্রে দুঃখ আসিবে না,—ইচ্ছা হইলেই যে, সমস্ত ইচ্ছাই পরিপূর্ণ হইবে, ক্ষেত্রস্বামীর এমন বিধি নহে। যাহা সুখদুঃখ-মিশ্রিত,—মাধবীলতার সঙ্গে কণ্টকীলতা জড়ানো, তাহাই এই মোহময় কর্ম্মক্ষেত্রের উপকরণ। সুখ নাই। যদি কিছু থাকে, তাহাও অসুখে ঢাকা। এই মোহময় অসুখময় কর্ম্মক্ষেত্রে পুরস্কার লাভের নিমিত্তই সকলে অগ্রবর্ত্তী হইতেছে। যে কর্ম্মের যে পুরস্কার, লোকে যদি তাহাই আশা করে, তাহা হইলে হয় ত পায়ও তাহা। কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে কতলোক কত কর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পুরস্কার প্রত্যাশা করে! এই প্রশস্ত পরীক্ষাক্ষেত্রে যাহা কিছু হয়, সমস্তই পরীক্ষা।—ডাকাতেরা এক বাড়ীতে ডাকাতী করিয়া আসিল,—ধনদৌলত বিস্তর পাইল,—আরো তারা চায় কি?—চায়, ডাকাতী করিবার সাহসের পুরস্কার! রাজকীয় বিচার হইতে অব্যাহতি পাইতে চায়!—যাহার বাড়ীতে ডাকাতী করিল, তাহাকে ত পথে বসাইল, তাহার বাটীর পরিবারগুলিকে অর্দ্ধদগ্ধ করিয়া আসিল,—তাহার উপর আবার ধর্ম্মাধিকরণের বিচারের হস্ত এড়াইতে চায়!—ইহার নাম আশা!—অন্য জীবের আশা আর ডাকাতের আশা ভিন্ন প্রকার হয়; কখনই একপ্রকার হইতে পারে না। ডাকাত আশা করে, "আমরা খুব অনেকদিন বাঁচিয়া থাকি,—অনেকের বাড়ীতে ডাকাতী করি,—অনেকের সর্ব্বনাশ সাধন করি,—পরের ধনে খুব বড়মানুষ হই।—ডাকাতীর তেল, মশাল, মদ, তেলকালী, লাঠি, চুণমাখা বাঁখারী ইত্যাদি অস্ত্রশস্ত্র পাল্‌কী করিয়া লইয়া যাই।—অন্য বেহারাকে বিশ্বাস হয় না। আপনারাই পাল্‌কী

বাহক হইয়া ডাকাতী করিতে যাই। কোথাও ধরা না পড়ি!" এই আশা ডাকাতের!

নরহন্তা আশা করে, "মানুষ মারিয়া অর্থ সংগ্রহ করি, মানুষ মারিয়া রাগ তুলি,—আড়ি তুলি,—মানুষ মারিয়া মনের জ্বালা, গায়ের জ্বালা নিবারণ করি।—কিছুতেই যেন ধরা না পড়ি!"—যাহারা খুন করে, তাহাদের এই রকম আশা!—সমস্ত পাপকার্য্যেই এই রকম আশা! কর্ম্মক্ষেত্রনিবাসী পুণ্যপ্রার্থী নরগণ আশাবর্জ্জিত হন, ইহাও অপ্রসিদ্ধ কথা।—কর্ম্মভূমে আশা সমস্ত জীবকেই পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। শাস্ত্রকারেরা আশাকে নদী বলেন। তাঁহাদের বাক্যানুসারেই প্রচার হইয়াছে, "আশা বৈতরণী নদী!" মানুষ দূরের কথা, দেবতারাও আশা-নদী পার হইতে পারেন না। আমরা বরং নদীর পরিবর্ত্তে আশাকে সমুদ্র বলিয়া আরো অধিক মহিমা বাড়াইয়া দিতে পারি। আশার নাম অপার সমুদ্র। এ সমুদ্রের পার নাই। ভবার্ণবে পার হইবার যেমন একজন কাণ্ডারী আছেন, আশার্ণবে পার করিবার কাণ্ডারী তেমন কেহই নাই। তুচ্ছ দৃষ্টান্তে পুস্তক বৃদ্ধি করা নিষ্ফল। দুইজন কবির দুটী মহার্থবচন স্মরণ করিলেই আশা-সাগরের পরিষ্কার ব্যাখ্যা পাইতে পারিবেন। একজন কবি বলিয়াছেন, "যাহার কিছুই নাই, সে ব্যক্তি শতপতি হইবার আশা করে। শতপতি সহস্রপতি হইবার আশা রাখেন। সহস্র-পতির লক্ষপতি হইবার আশা। লক্ষপতির আবার ক্রোরপতি হইবার আশা অত্যন্ত বলবতী। অতএব আশার পারে কেহই যাইতে পারে না।" আর একজন মহাকবি বলিয়াছেন, "দেব-রাজ ইন্দ্র ব্রহ্মপদের আশা করেন। ব্রহ্মা শিবপদ লাভের আশা

রাখেন। শিব আবার হরিপদলাভের আশায় শ্মশানবাসী! অতএব এই ত্রিভুবনের মধ্যে কে কোন্ কালে আশাপারে গমন করিতে সমর্থ হইয়াছেন?"

ষোড়শ কল্প।

ধনেশ্বরদের খেলা!

আশারূপ রজ্জুতে সংসারের জীবগুলিকে বন্ধন করিয়া কর্ম্ম-ক্ষেত্রে নৃত্য করানো হইতেছে। কর্ম্মক্ষেত্রে যাঁহাদের টাকা আছে, তাঁহারা অবশ্য ভাললোক। টাকায় সৎকার্য্য অনেক হয়।—টাকায় গৃহাশ্রমীর গৃহপালন ও ধর্ম্মকর্ম্ম সাধিত হয়। টাকায় বহুদশাপন্ন বহুলোকের উপকার করিতে পারা যায়। কেবল সন্ন্যাসীফকির প্রভৃতি গুটীকতক প্রকৃত বিবেকশীলা যথার্থ সংসারবিরাগী উদাসীন মানবগণ, আর কাননবাসী পশু-পক্ষীগণের টাকায় আকাঙ্ক্ষা নাই। তাহা ছাড়া কর্ম্মক্ষেত্রের সকল লোকেই অহরহ টাকা টাকা করিয়া ঘুরিতেছে। কেহ পায়, কেহ পায় না। একজন যোগী একবার বলিয়াছিলেন, "কর্ম্মক্ষেত্রের বড় আশ্চর্য্য রহস্য!—এ ক্ষেত্রের সমস্ত ক্রিয়াই যেন ইন্দ্রজাল!—যাঁহারা বাঁধামানুষ,—সংসারবন্ধনে যাঁহারা আষ্টে পৃষ্ঠে বিজড়িত, স্ত্রীপুত্রাদি পরিবারের দায়ে তাহারা দিবারাত্রি কর্ম্মভূমে ছুটাছুটি করে।—যাঁহারা সর্ব্ববন্ধন বিমুক্ত,

ইচ্ছা করিলেই যাঁহারা সমস্ত ভূমণ্ডল পরিভ্রমণ করিতে পারেন, তাঁহারা কোন নিভৃত কাননে একমাত্র যোগাসনে বসিয়া জগৎ-চিন্তামণির চিন্তায় সর্ব্বক্ষণ সুস্থির!"—এ রহস্য ভেদ করিবার লোক সংসারে অতি অল্প।

যাহারা বাঁধা, তাহারা ছুটাছুটি করিতেছে;—যাহারা খোলা, তাহারা চুপ্‌টী করিয়া একস্থানে বসিয়া রহিয়াছে!—দেখুন, দেখুন!—ভাবুন, ভাবুন! বিশ্বকর্ম্মার কি চমৎকার কর্ম্মক্ষেত্র! যাহাদের টাকা নাই, তাহারা দরিদ্র,—তাহারা দিবানিশি ক্রন্দন করে! দরিদ্রের চক্ষে সমস্তই শূন্যময়! কিন্তু দরিদ্র যখন আশা দেখে,—দরিদ্র যখন আশা ভাবে, তখন তাহার চক্ষে কিছুই শূন্যময় বোধ হয় না। তাহার চক্ষে তখন সমস্তই পূর্ণ, সমস্তই প্রফুল্ল। আশা তাহাকে নাচায়,—আশা তাহাকে হাসায়,—আশা তাহাকে সুহাসিনী মাসীপিসীর গীত গাইয়া ঘুম পাড়ায়! আশার অনুগ্রহেই কর্ম্মক্ষেত্রে দরিদ্রলোক বাঁচিয়া থাকে।—আশার মুখ চাহিয়াই আসন্নমৃত্যু রোগী রুগ্নশয্যাতলে গড়াগড়ি খাইয়া, বাঁচিবার আশায় অসহ্য যন্ত্রণাও সহ্য করে। আশার মুখ চাহিয়াই পুত্রশোকাতুরা দুঃখিনী জননীও দশের মুখে প্রবোধ পান, আবার পুত্র হইবে।—আশার অনুগ্রহে কর্ম্ম-ক্ষেত্রের সমস্ত লোকেই এক একবার হাসিয়া খেলিয়া বেড়ায়। জগতে আশার অস্তিত্ব না থাকিলে বিরিঞ্চিবাঞ্ছিত এই পরমসুন্দর মানবরাজ্য বোধ হয় যেন মরুভূমি হইয়া থাকিত!

আশা আছে,—ছুটাছুটি আছে,—ছুটাছুটির লক্ষ্য আছে, তাহাতেই কর্ম্মক্ষেত্র চলে। একজন জ্ঞানবান্ ভাবুক পণ্ডিত এই কর্ম্মক্ষেত্রের মানুষের ছুটাছুটি সম্বন্ধে একটী ভাবপূর্ণ শ্যামা-

বিষয় সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। আজিও এদেশে কোন কোন ভাবুক লোকের রসনায় সেই গীতটীর পুনরাবৃত্তি শুনিতে পাওয়া যায়। অভাবুক ভিকারীরাও সময়ে সময়ে ভক্তিমান হিন্দুর ভবনে সেই গীতটী গাইয়া প্রচুর পয়সা পায়। গীতটীর একটুখানি আমাদের মনে আছে। পাঠকমহাশয়েরাও অনেকে সে গীতটী জানেন, তথাচ ছাপার অক্ষরে একবার দর্শন করুন ঃ—

গীত।

" (তারা !) কোন্ অপরাধে, এ দীর্ঘ মেয়াদে,
সংসার গারদে, থাকি বল্ !
* * * * *
(ওমা !) প্রাতঃকালে উঠি, কত যে মা খাটি,
ছুটাছুটি করি, ভূমণ্ডল ঃ—
হয়ে অর্থ অভিলাষী, আনন্দেতে ভাসি,
সর্ব্বনাশি ! জানিস্ কতই ছল !
* * * * *
(আর) বাঁচিতে সাধ নাই, বাসনা সদাই,
ফণী-ঘোরে খাই, হলাহল !"

এই গীতের ভাব কর্ম্মক্ষেত্রে অনেক সময় অনেক দরিদ্রের হৃদয়ে উদিত হইয়া থাকে। সকল লোকেই কিছু কবি হয় না, কবিগণ দুটো ভাল রকম অলঙ্কার দিয়াই কথাটীকে সাজাইয়া গুজাইয়া লন, কিন্তু আসল কথাটী অ-কবির হৃদয়েও সমানভাবে সমুদিত হয়। সংসারযন্ত্রণায় জ্বালাতন হইয়া অনেক রোগাতুর, শোকাতুর, নির্ধনব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে আত্মহত্যাও সংসাধন করে। কিছুই আশ্চর্য্য নয়। কর্ম্মক্ষেত্র পরীক্ষার স্থান।—মানুষকে হাসাইবার কাঁদাইবার স্থান। যাহারা পরীক্ষা দেয়, পরীক্ষার ফল সন্তোষকর হইলে তাহারা হাস্য করে, পরীক্ষা ব্যর্থ হইলে বিষন্ন হয়। কর্ম্মক্ষেত্রে তাহা নয়। এখানে পরীক্ষার ফলাফল বিনির্ণয় হইবার- বহুপূর্ব্বেই পরীক্ষার্থী মানবকুল দুইভাগে বিভক্ত হইয়া আশার সঙ্গে লড়াই করে। একদল হাসে, একদল কাঁদে। এই কর্ম্মক্ষেত্রে অতি চমৎকার রঙ্গভূমি।—এখানে ছোট খাট নাটকের অভিনয় হয় না। প্রকাণ্ডতম বিশ্বনাটকের অভিনয় হয়। ক্রীড়া করে বিশ্ববাসী-গণ।—এ রঙ্গভূমিতে বাহবা দিবার এবং বাহবা লইবার অনেক লোক থাকিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা জানিতে পারেন না যে, যবনিকাপতনের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে কোন্ কোন্ অঙ্কের, কোন্ কোন্ বিষয়ের অভিনয় করিতে হইবে। সেই-টুকু জানা থাকিলেই মানুষ স্বয়ংসিদ্ধ হইতে পারিত। তাহা হইবার উপায় নাই। এই কারণেই মানুষকে কর্ম্মক্ষেত্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরিতে হয়!

কেবল গরিব লোকের কথাই বলা হইল,—বড়মানুষের উল্লেখ হইল না, বড়মানুষেরা কি কর্ম্মক্ষেত্রে রঙ্গভূমিতে কোন অভিনয়

করেন না?—অবশ্যই করেন;—তাঁহারা আরো বেশী করেন। তবে কি না, কর্ম্মক্ষেত্রে গরিবের ভাগ বেশী বলিয়াই গরিবের ক্রন্দনের কথা অগ্রে ধরিতে হইয়াছে। কর্ম্মক্ষেত্রে বড়মানুষের নিবাস অল্প।—তাঁহাদের অভিনয়ও অনেক প্রকার। অনেক লোকের বিশ্বাস আছে, মানুষের টাকা হইলেই ভুঁড়ি হয়, টাঁকা হইলেই অহঙ্কার হয়,—টাকা হইলেই সুখ হয়।—তাহারা মনে করে, কর্ম্মক্ষেত্রে টাকার মানুষেরাই সুখী।—টাকার মানুষেরা সে সুখ অনুভব করিতে পারেন কি না, চটকদর্শক দরিদ্র তাহার কিছুই অনুভব করিতে পারে না।—দরিদ্রের মধ্যেও অনেকগুলি সুখী লোক থাকে। তাহারা টাকার মানুষকে সুখী মনে করে না। যাহারা টাকার মানুষকে সুখী মনে করে, তাহারা নিজেই অসুখী। দারিদ্রনিবন্ধন যাহারা সর্ব্বদা সর্ব্ববিষয়েই অসুখী, তাহারা ত "ফর্সা কাপড়" দেখিলেই সুখী লোক মনে করিবে। তাহাদের বিচারে সত্যবিচার হইবে না। কর্ম্মক্ষেত্রে যাহারা বহুধনের অধীশ্বর, তাহারা বহুপ্রকার অসুখে অসুখী। তাহারা হতভাগ্য,—তাহারা আত্ম-বঞ্চক।—মধ্যে মধ্যে তাহারা নিজেই বলে, তাহাদের মৃত্যুই মঙ্গল। যাহাই হউক, কর্ম্মক্ষেত্রের নাম পরীক্ষাক্ষেত্র। কর্ম্মক্ষেত্রে পরীক্ষা দেওয়া সহজ নহে।

কত বয়স পর্য্যন্ত কি,—কত বয়স পর্য্যন্ত শাস্ত্র-চর্চ্চা, জ্ঞান-চর্চ্চা, সুনীতি-চর্চ্চা,—কত বয়স পর্য্যন্ত সংসারধর্ম্ম,—কত বয়স পর্য্যন্ত তপস্যা, ইহার কোন বিধান কর্ম্মক্ষেত্রে লেখা নাই। এ ক্ষেত্রে কেবল আকাঙ্ক্ষার খেলাই বেশীর ভাগ। অনেক ধনেশ্বর জীবনকাল পর্য্যন্ত সুখসম্ভোগে সাধু সাধু কার্য্যানুষ্ঠানে

বেশ সুযশ লাভ করেন। অনেক ধনেশ্বর আত্মাকে বঞ্চনা করিয়া টাকা জমাইবার চেষ্টা করেন, তিনিভিন্ন পৃথিবীতে আর কেহ টাকা পাইবার অধিকারী নহে, এইরূপ মনে করেন। হৃদয় লৌহ এবং পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন হইয়া যায়!—সেই প্রকার ধনেশ্বরের নিকটে দুই সপ্তাহের অনাহারী বৃদ্ধ ভিক্ষুক পদাঘাত উপহার পায়!

ধরুন, বঙ্গদেশে ধনেশ্বরের অভাব নাই, এটী মিথ্যাকথা। যদিও অভাব না থাকে, তথাপি বিলক্ষণ অভাব আছে। গরিবের সংখ্যা যখন সকল দেশেই বেশী দাঁড়ায়, তখন অবশ্যই ধনেশ্বরের সংখ্যা কম।—ধনেশ্বর নাই বলিয়াই যে, রীতিমত গৃহস্থলোক নাই, একথা বুঝিতে হইবে না। খাওয়াপরা চলে,—হিন্দুসংসারে দোলদুর্গোৎসবাদি ক্রিয়াকর্ম্ম চলে, উপস্থিতমত অথবা আপনাদের আবশ্যকমত মাম্‌লামোকদ্দমার খরচপত্র চলে,—বঙ্গদেশে এমন বড়মানুষ অনেকগুলি আছেন। তাহা থাকিলেও এখন অভাগা বঙ্গদেশে বেশী লোকেই অভাগা। যেদিক দিয়াই ধরুন, বঙ্গদেশে ধনেশ্বর বড় বেশী নাই। যাঁহারা আছেন, তাঁহারা বেশ আছেন। কেহ কেহ সুখে, সুনামে দিন কাটাইয়া যাইতেছেন, কেহ কেহ বা দুঃখে, ক্লেশে, অধর্ম্মে অপযশে, অপরের সর্ব্বনাশে জড়ীভূত থাকিয়া কেবল পরের জন্য টাকা জমাইতেছেন!

পরের জন্য টাকা জমাইয়া রাখা রীতিবিরুদ্ধ নয়। পুত্রপৌত্রাদি কখনই পর হইতে পারে না। আপনারাও যাহা, তাহারাও তাহা। প্রাপ্ত, উপার্জ্জিত, অথবা সঞ্চিত অর্থ আপনার ভোগসুখে পর্য্যাপ্তিবিধান করিয়া বাকীগুলি,—অথবা

পৈতৃক মূল থাকিলে সেই আসল মূলগুলি পুত্রপৌত্র উত্তরাধিকারীগণের নিমিত্ত রাখিয়া যাওয়া সুনীতিসঙ্গত। বিশেষতঃ হিন্দুশাস্ত্র এবিষয়ে পরম দয়াবান।—ক্ষমতাবানের পক্ষে পুত্রপৌত্রাদির ভবিষ্যৎ উপায় করিয়া যাওয়া ধর্ম্মসঙ্গত। তবে যদি উত্তরাধিকারীরা ইচ্ছাপূর্ব্বক ভাগ্যদোষে উদার দায়ভাগশাস্ত্রের কৃপায় অবহেলা করে, তাহা হইলে উদার হিন্দুশাস্ত্রই সে ক্ষেত্রে সেই ভাগ্যহীন উত্তরাধিকারীগণকে পিতৃধনে বঞ্চিত করিবার সহায় হইবে।

ধনপতি অনেক প্রকার।—এক প্রকার আছেন, পৃথিবীতে তাঁহারা কেবল টাকা ভিন্ন অন্য কোন পদার্থের কিছুমাত্র মূল্য আছে, একথা স্বীকার করিতে চাহেন না। এদিকে এই, ওদিকে সংসারে টাকা লইয়া যে কি করিতে হয়, সে তত্ত্বের বিন্দুবিসর্গও তিনি অবগত নহেন।—পাপের দ্বার প্রশস্ত করিয়া অর্থ আহরণ করা হয়, সেই অর্থ কিনা অবশেষে বাদেশ্রাদ্ধে যায়। তাঁহারা জানেন, টাকার নাম জমা,—টাকা হইলেই জমাইতে হয়! এই হুজুগেই তাঁহাদের টাকা জমে! তখন কিসে কিসে জমিত,—তখনকার লোকে তাহা জানিতেন, এখনকার অতি বৃদ্ধেরাও তাহার কিছু কিছু জানিতে পারেন।

এখন জমে কিসে?—এখনকার ধনকুবেরেরা কোথায় কোথায় টাকা জমা রাখিয়া চিরজীবনের জন্য নিশ্চিন্ত থাকেন, অনেকেই তাহা বুঝিতে পারিতেছেন। তাঁহাদের মূলমন্ত্রই জমা করা। তাঁহাদের বিশ্বাসস্থান বড় বেশী নাই। এখন অধিকাংশই বিশ্বাসপাত্র চিনিয়াছেন। ব্যাঙ্কে, কোম্পানীর কাগজে, ফ্যামিলী ফণ্ডে, জীবনচুক্তি এবং অগ্নিচুক্তির তহবিলে

দু পাঁচটী কোম্পানীর সেয়ারে, আরও কিছু কিছু অলঙ্কারপত্রে এবং ভিন্নভিন্ন আওলাতেই অনেক ধনকুবেরের খাস্ জমা। কুবের আবার তিন প্রকার।—প্রথম, দাতা;—দ্বিতীয়, মিত-ব্যয়ী;—তৃতীয়, কৃপণ। দাতাকে কেহ কেহ অপব্যয়ী বলেন, তাঁহারা ভ্রান্ত।—অপব্যয়ীশ্রেণী এই সুখসংসারেই নরকের কীট, দাতা স্বর্গধামের দেবতা!

যে শ্রেণী কৃপণ, তাঁহাদের সুনাম কুত্রাপি নাই। নিজের অর্থ যাঁহাদের নিজের ভোগে আইসে না,—সৎকার্য্যে যায় না, ভিকারীতে পায় না, এমন মানুষ কখনই প্রকৃত মানুষ নামের যোগ্য হইতে পারে না। অনেক কৃপণের অনেক দৃষ্টান্ত অনেকে শ্রবণ করিয়াছেন, এই স্থলে আমরা একটী পুরাতন দৃষ্টান্ত দেখাইব। পুরাতন হইলেও অনেকের চক্ষে নূতন লাগিবে। দৃষ্টান্তটী ইউরোপের।

একজন গরিব একটী আধুলী জমা করিয়াছিল। সেই আধুলীটী তাহার মূলধন। ক্রমে ক্রমে সেই কৃপণ পুরুষ সেই মূলধন বাড়াইয়া আটকোটি টাকা জমায়!!! না খাইয়া,—না পরিয়া, আঁতের জল দাঁতে মারিয়া, ঐ টাকার রাশি যে ব্যক্তি সঞ্চয় করিয়াছে, সে ব্যক্তি সর্ব্বদিকেই হুঁসিয়ার ছিল। বিবাহ করিলে পুত্রকন্যা হইবে,—কুটুম্ব জুটিবে,—খরচ বাড়িবে, এই আশঙ্কায় সেই আটকোটির ঈশ্বর যাবজ্জীবন বিবাহ করে নাই! শরীরগতিক পীড়িত হইলে অপব্যয় আছে, কপালের কেমন যোগাযোগ, জন্মাবধি সে ব্যক্তির এমন কোন পীড়া হয় নাই, যাহাতে চিকিৎসককে ডাকিতে হইয়াছিল!

শেষকালে মগজ গরম হইয়া গেল! টাকার গর্ম্মী, বেজায়

গর্ম্মী! মানুষটী কৃশ ছিল, খুব মোটাসোটা হইয়া উঠিল, চর্ব্বি জমিল। চর্ব্বিতে চর্ব্বিতে পাকস্থলীর উপরিভাগটা যেন ক্ষুদ্র একটা পর্ব্বতাকার ধারণ করিল! লোকে বলিত, টাকার ভুঁড়ি! লোকটা বেজায় মোটা হইল! ঘাড়ে গর্দ্দানে এক হইয়া গেল! বেজায় গরম হইল! ঘাড় দিয়া রক্ত বাহির না করিলে ঘোরতর পাগল হইয়া যাইবে!—কিম্বা হয় ত প্রাণ যাইতেও পারে!

প্রাণ যাইতেও পারে!—এই ভয়ঙ্কর কথায় মানুষটীর একটু ভয় হইল! অনেকে বিবেচনা করিয়া একজন ডাক্তার ডাকা স্থির করিল। কত বিবেচনার পর একজন ডাক্তার আসিলেন। ভিজিটের ডাক শুনিয়াই রোগীর আত্মাপুরুষ কম্পিত হইল। সে ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ ঐ ডাক্তারকে বিদায় করিয়া দিল! সস্তা-দরের আর একজন ডাক্তার আসিলেন।—সস্তা হইলেও উপস্থিত রোগীর পক্ষে অনেক বেশী! সে ব্যক্তি তাঁহাকেও বিদায় করিল! অবশেষে একজন হাতুড়ে জুটিল। তাহার ভিজিটের পরিমাণ দুই আনামাত্র। সেই হাতুড়েটী কোথাও কোথাও ফস্তখোলা * কার্য্যে যশ লইয়াছে। অভ্যাস আছে,—ঠকিবে না! স্বীকার করিল, আরাম করিবে তিনবারে। অন্ততঃ তিন পোয়া রক্ত বাহির করা আবশ্যক।—একে একে তিনবারে তিন পোয়া বাহির করিলে অল্প অল্প রক্তস্রাবে রোগীর তাদৃশ দুর্ব্বল হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

রোগী জিজ্ঞাসা করিল, "ভিজিট কি তিনবার দিতে হইবে?" হাতুড়ে উত্তর করিল, "সুতরাং তিনবার।"

---

* পাগল অথবা অত্যন্ত স্থূলকায় ব্যক্তির শরীর হইতে অস্ত্রচিকিৎসায় রক্তমক্ষণ করার নাম ফস্তখোলা।

রোগী কহিল, "তাহা হইবে না।—তিনবার আমি দিতে পারিব না। কেন আমার চারি আনা বৃথা নষ্ট করিবে? একেবারেই তিন পোয়া রক্ত বাহির কর!—এক ভিজিটেই চলিবে!—তোমাকেও আর অতিরিক্ত দুইবার কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে না।—বৃথা কেন আমার চারি আনা গুণাগার করিতে চাও?—এক কালেই—এক ভিজিটেই তিন পোয়া রক্ত বাহির কর!"

হাতুড়ে দেখিল বিভ্রাট!—তিন পোয়া বাহির করিলে লোকটা এখুনি নিশ্চয়ই ধড়্ ফড়্ করিয়া মরিবে!—হাতুড়ে অনেক আপত্তি করিল। রোগী কিছুতেই বর্গ মানিল না। তাহার প্রতিজ্ঞা দুই আনাতেই কার্য্য নির্ব্বাহ করা। সে কেন চারি আনা অপব্যয় করিতে রাজী হইবে?—কৃপণের রক্ত ভিতরে ভিতরেই জড় হয়,—ভিতরে ভিতরেই স্রোত বয়,—ভিতরে ভিতরেই গরম হয়, ভিতরে ভিতরেই ফোলে এবং—

ফুলিলে যাহা হয়, সেই হতভাগা ফরাসী কৃপণটার কপালে তাহাই ঘটিল! হাতুড়ে কিছুতেই তাহার গোঁ ফিরাইতে পারিল না। অথচ তাহার পক্ষে দুই আনার লোভ সংবরণ করাও কঠিন!—অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া উকীলী বুদ্ধি বাহির করিল। রোগীর কাছে লেখাইয়া লইল, প্রাণের জন্য দায়ী নয়!—চারি আনা বাঁচাইবার খাতিরে রোগী দর্প করিয়া লিখিয়া দিল, "আমি বেশ বলিষ্ঠ,—আমি স্থূলাকার, আমার শরীর চিরকাল নির্ব্যাধি; আমার শরীর হইতে এককালে তিন পোয়া রক্ত বাহির হইলে আমি মরিব না!—যদি মরি, আমার প্রাণের জন্য এই ব্যক্তি দায়ী হইবে না। আমি সজ্ঞানে,

ইচ্ছাপূর্ব্বক ইহাকে আমার দেহ হইতে এককালে তিন পোয়া রক্ত বাহির করিতে অনুমতি দিলাম।"

হাতুড়ে সেই দলীলখানা পকেটজাত করিয়া কৃপণের শূকর-দেহ হইতে তিন পোয়া রক্ত বাহির করিল!—দেহটাও রক্তের উপর পড়িয়া গেল!—নিশ্বাসটুকুও জন্মের মতন ভেঁা করিয়া উড়িয়া বাহির হইল!

তখন সেই আটকোটি টাকা যায় কোথায়?—তখন সে আটকোটি টাকা খায় কে?—রাজা।—দেশের রাজাই সেই হতভাগ্য নরাধম কৃপণের সর্ব্বস্ব লুঠিয়া লইয়া রাজভাণ্ডারে জমা করিলেন!—কৃপণের টাকার ইহা অপেক্ষাও সহস্রগুণ অধোগতি হয়!

আমাদের দেশেও বড় বড় কৃপণ ছিলেন, বড় বড় কৃপণ আছেন। তাঁহাদের কেহই ঐ প্রকারে রক্ত বাহির করিয়া মরেন নাই,—কিম্বা মরিবেন না,—কিম্বা মরিবেন কি না, সে তর্ক আমাদের নিষ্প্রয়োজন।—কৃপণের ধনের প্রায়ই সদ্গতি হয় না, ইহাই সকলে বলেন।

সপ্তদশ কল্প।

বংশরক্ষার খেলা।

আর একপ্রকার ধনকুবের আছেন, তাঁহারা নির্ব্বংশ। ধনবান হিন্দুর পক্ষে নির্ব্বংশ হওয়া ভারি গোল!—একে ত নির্ব্বংশ হওয়াটা পাপের ফল;—তাহাতে আবার সঙ্গে সঙ্গে আর দুটী আশা।—প্রথম আশা, জলপিণ্ড,—দ্বিতীয় আশা, টাকা লওয়া।—এই দুটী আশার পরিতৃপ্তিবাসনায় দত্তকপুত্র গ্রহণের ব্যবহার হইয়াছে। হওয়াটা ভাল কি মন্দ, সে বিচারের ভার সাধারণের উপর। বড় বড় মহামহা প্রজ্ঞাবান ঋষিরা যাহা বৈধ বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, দত্তকমীমাংসা, দত্তক চন্দ্রিকা এবং দত্তক চিন্তামণি প্রভৃতি শাস্ত্রীয় গ্রন্থে যাহার আবশ্যকতা উক্ত হইয়াছে, তাহার অনাবশ্যকতা প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করাও কিছু বেশী সাহসের কার্য্য। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, কার্য্য বড় বিপরীত!—যেখানে যেখানে দত্তকপুত্র-সংশ্রব, সেই সেই স্থলেই অনর্থ! দত্তকপুত্রেরা প্রায়ই দুরন্ত হন!—তাঁহারা অকস্মাৎ যাহা পান, তাহা অপকর্ম্মে এককালে নিঃশেষ না করিয়া প্রায়ই মরিতে চাহেন না! বিষয় রক্ষা করিবার জন্য নির্ব্বংশ বিষয়কর্ত্তারা দত্তকপুত্র রাখিয়া যান, কিম্বা শীঘ্র মৃত্যু হইলে পত্নীকে মৌখিক অনুমতি দিয়া যান, তাহাতেই দত্তকপুত্রের উৎপত্তি হয়। অধিকাংশ স্থলে দুটী

আশাই বিলুপ্ত। কলমের চারায় সচরাচর মূলশিকড়টী ভাল শক্ত হইয়া বসে না। কাজেই গাছ শীঘ্র শুকায়,—বৃদ্ধি কমিয়া যায়,—ফল ছোট হয়,—ফলে পোকা ধরে!

শাস্ত্রে দ্বাদশ প্রকার পুত্রের বিধান আছে। বর্ত্তমান যুগে তাহার অনেকগুলিই অপ্রচলিত। দত্তকপুত্র অথবা পোষ্যপুত্র যাহাকে বলা হয়, তাহারও সকলগুলি এখন প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে না। নাবালকের জন্মদাতা পিতাকে অথবা গর্ভ-ধারিণী মাতাকে অর্থ দিয়া যে পুত্র কিনিয়া লওয়া হয়, শাস্ত্রে তাহার নাম ক্রীতপুত্র। একালে সে পুত্রের ব্যবহার নাই। কিন্তু শুনা যায়, ঐ প্রকারের অনেক ক্রীতপুত্রও দত্তকপুত্রের নামে বিক্রী হইয়া, দত্তকপুত্রের দলে গণনীয় হইতেছে।

কর্ম্মক্ষেত্রের খেলা অনেক প্রকার। ধনেশ্বরদিগের খেলাও অনেক প্রকার। বংশ থাকিবে না ভাবিয়া যাঁহারা দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন, তাঁহারা ধনীও হইতে পারেন, ধার্ম্মিক গৃহস্থও হইতে পারেন। বিধাতার নিয়মে যাঁহারা নির্ব্বংশ, দত্তক পুত্রেরা তাঁহাদের বংশ রাখেন, বংশের পূর্ব্বপুরুষগণের জল-পিণ্ড দান করেন, এটী বোধ হয় মনকে আঁখিঠার মাত্র। দত্তক পুত্রেরা কৃপণ ধনীর আত্মবঞ্চিত ধনের ভোগাধিকারী হন, এটী সত্যকথা। ডাকিয়া টাকা দিবার জন্ত পোষ্যপুত্র লওয়া সকলের মতে ভাল কি মন্দ, তাহার বিচার করিতে আরম্ভ করি-বার অগ্রে চক্ষের উপর যাহা দেখা যায়, তাহাই মনে করা প্রশস্ত। পোষ্যপুত্রেরা প্রায়ই অকস্মাৎ পরের ধন প্রাপ্ত হইয়া রাতারাতি হঠাৎবাবু হন। সে ধনে তাঁহাদের মায়া বসে না। মায়া বসাও অসম্ভব। শ্রমলব্ধ অর্থে যেমন মমত

জন্মে, অশ্রমলব্ধ অর্থে তেমন মমতা কখনই জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। ঔরসপুত্রেরাই সকলে যখন পিতৃধনে আশানুরূপ মমতা-বান হইতে পারেন না, পোষ্যপুত্রেরা তখন ত' বহু দূরের কথা; বহু সংশয়ের কথা।—এক পণ্ডিত বলিয়াছিলেন, "দেবালয়ে ও মন্দুরায় যত প্রভেদ, উত্তম ঔরসপুত্রে ও পৌষ্যপুত্রে তত প্রভেদ। রামরাবণের তুলনা করিবার সময় কবিপিতা বাল্মীকি হনূমানের মুখ দিয়া দশাননকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিয়া গিয়াছেন, "মহাবনে পশুরাজ কেশরীর সহিত ধূর্ত্ত শৃগালের যতদূর অন্তর, পক্ষীরাজ বিনতানন্দ গরুড়ের সহিত ধূর্ত্ত বায়সের যতদূর অন্তর, অনন্ত জলরাশি মহাসিন্ধুর সহিত সামান্য গোষ্পদের যতদূর অন্তর, রে ধূর্ত্ত লঙ্কেশ্বর! রে পাপিষ্ঠ ভণ্ড ব্রহ্মচারিণ্! রে সতীচোর! আমার অতুলবিক্রম রঘুনন্দনে আর এই রাক্ষসা-ধম তোতে অবশ্যই ততদূর অন্তর!"

পোষ্যপুত্র সম্বন্ধে অতবড় উপমার স্বার্থকতা আছে কি নাই, তাহার বিচার এস্থলে অনাবশ্যক। মূলকথা, ঔরসপুত্রে ও পোষ্যপুত্রে বহুদূর অন্তর।

ঔরসপুত্র পিতৃধনে মায়া কম দেখান, আমরা তাহার বেশ একটী দৃষ্টান্ত জানি।

কয়েক বৎসর হইল, কলিকাতার এক বাবু শীতকালে একটী মজলিসে নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন। গায়ে একজোড়া কাশ্মীরী শাল ছিল। শালের মূল্য অন্যূন ৭০০। ৮০০ টাকা। সন্ধ্যার পর নিমন্ত্রণ। সেদিন সন্ধ্যাকালে কলিকাতায় বৃষ্টি হইয়া ছিল। রাস্তায় কাদা হইয়াছিল। গাড়ী হইতে নামিয়া মজলিসে উঠিবার সময় বাবুর নূতন জুতায় আগাগোড়া কাদা লাগে।

জুতাজোড়াটী কাদায় ডুবিয়া যায়। মজ্‌লিসের দ্বারে উপস্থিত হইয়া বাবু আপন গাত্রের মূল্যবান শালের অঞ্চলে জুতা-জোড়াটী গুপ্তভাবে সাফ করিতে আরম্ভ করেন! তাঁহার গোপন ভাব প্রকাশ হইয়া পড়ে! দুটী ভদ্রলোকের চক্ষে সেই অবস্থায় তিনি ধরা পড়েন! ভদ্রলোকেরা ক্রোধে ও মহাবিস্ময়ে সেই জুতাসাফ্‌করা বাবুটীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাপুহে! তোমার শালজোড়াটীর দাম কত?"

যেন কতই বিরক্ত হইয়া বাবুটী উত্তর করিলেন, "সে খবরে আপনাদের দরকার কি?—সে খবর আমি রাখি না!—শাল আমি কিনি নাই! শাল আমার বাবার!"

একটী ভদ্রলোক তাঁহাকে দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বাবা বাঁচিয়া আছেন?"

বাবু আরও বিরক্ত হইয়া উত্তর করিলেন, "আমিই এখন কর্ত্তা! আজ এক বৎসর আমিই বাবার সমস্ত ধনের অধিকারী! বাবা মরিয়া গিয়াছেন!"

ভদ্রলোকটী নূতন প্রশ্ন করিয়া উত্তর পাইলেন, তাঁহার পিতার জমিদারী ছিল না, তিনি চাকুরী করিতেন। সে চাকুরীতে ছেলেটীকে বসাইবার সুবিধা হয় নাই। ছেলেটী সে কর্ম্মের উপযুক্ত নহেন। কর্ম্মটী শক্ত ছিল। মাসিক বেতন ৭০০ টাকা। ছেলেটী পিতৃহীন হইয়া চাকুরী অন্বেষণ করিলেন।—তিনি যে কার্য্যের উপযুক্ত, সে কার্য্যের বেতন কুড়ী টাকার বেশী হইতে পারে না। পিতা বড়লোক ছিলেন, সুতরাং পিতৃবান্ধবের সুপারিসের জোরে ছেলেটীর একটী কর্ম্ম হয়। বেতন ৫০৲ টাকা।

ভদ্রলোকটী একটু চিন্তা করিয়া বাবুটীকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার জুতাজোড়াটীর দাম কত?"

বাবু এইবার মহারাগত হইয়া উত্তর দিলেন, "কেন বিরক্ত করেন?—জুতা আমার নিজের!—জুতার টাকা আমার নিজের! রোক রোক তিন টাকা!"

এক্ষণে পাঠকমহাশয়েরা বিবেচনা করুন, নিজের টাকায় কত দরদ! নিজের উপার্জ্জনের তিন টাকার কাছে পিতার উপার্জ্জনের ৭০০। ৮০০ টাকা অত্যন্ত তুচ্ছ! এই কারণেই ঐ মুল্যবান বাবুটীর কাছে মুল্যবান পৈতৃক শাল অপেক্ষা স্বোপার্জ্জিত জুতা বড়!—মূল্যবান শাল অপেক্ষা অধিক যত্নের বস্তু হইল সামান্য একজোড়া তিনটাকা দামের জুতা!

সমস্ত ঔরসপুত্রই যে, পিতৃধনে বেশী মায়া রাখেন না, এমন কথা বলা আমাদের অভিপ্রেত নহে। পোষ্যপুত্রেরা যে অকস্মাৎ হঠাৎবাবু হইয়া সমস্ত সম্পত্তি দুদিনে উড়াইয়া দেন, এমন দৃষ্টান্ত বঙ্গদেশে অনেক। দত্তকপুত্রের মধ্যে ভাল নাই, এমন কথা মনে করাও একটু ভুল। ভালমন্দ সকল দলেই আছেন। কথা হইতেছে, দত্তকপুত্রের মধ্যে ভাল খুব কম। কলিকাতাসহরে রাজা গোপীমোহনদেব দত্তকপুত্র ছিলেন। তাঁহার সাধুতা সকলেই পরিজ্ঞাত আছেন। তাঁহার ঔরসে শোভাবাজারের রত্নস্বরূপ রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের জন্ম। চোরবাগানের রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক দত্তক-পুত্র ছিলেন। তাঁহার গুণগরিমাও অনেকে অবগত আছেন। কলিকাতা ও মফস্বলে এই প্রকার দুটী একটী দত্তকরত্নের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু আমাদের দেশে অধুনা

প্রায় দত্তকপুত্রের অধিকাংশই অপদার্থ! জ্ঞাতিগোত্রের মধ্যে দত্তকপুত্র পাইলে বরং বংশ রক্ষা হইতে পারে, কিন্তু কুলরক্ষা বড় কম।

দত্তকপুত্রের প্রতি অনেকেই অনুকূল নহেন। দত্তকপুত্র একেবারেই ভাল হয় না, ইহাও কেহ কেহ বলেন। তাঁহাদের মতের সহিত সাধারণ মতের ঐক্য নাই। সকল বিষয়েরই বৰ্জ্জিতবিধি এবং বৰ্জ্জিত উদাহরণ আছে! নিরপেক্ষভাবে কথা কহিতে হইলে, সকল দিকে চাহিয়া, আটঘাট বাঁধিয়া কথা কহিতে হয়। এক বৎসর হইল, "শ্রীমন্তসওদাগর" পত্রিকায় "দত্তকসন্তান বা পোষ্যপুত্র" সম্বন্ধে একটী উৎকৃষ্ট প্রস্তাব প্রচারিত হইয়াছে। দত্তকপুত্রের পিতামাতাকে উদ্দেশ করিয়া শ্রীমন্ত বলিয়াছেন, "তুমি দত্তকপুত্রের পিতা, তুমি নিজ মনে জান, সে তোমার পুত্র নহে, সুতরাং তাকে তুমি প্রাণের সহিত আপনার পুত্র বলিতে পার না। তুমি দত্তকপুত্রের মাতা, তুমি অন্তঃকরণের সহিত জান যে, তুমি তাহাকে গর্ভে ধারণ কর নাই। যেমন অন্যে জানে, তেমনি তুমিও জান যে, তাহার পিতামাতা অন্য দুই ব্যক্তি। দশমাস দশদিনের গর্ভযন্ত্রণা তোমাকে সহিতে হয় নাই। * * * সেইরূপ সে যখন বুঝিবে যে,তুমি তাহার গর্ভধারিণী মাতা নও, তখন সে তোমাকে পর বলিয়া ভাবিবে"; "এবং তোমার স্বামীকে পিতৃভক্তি দিতে সঙ্কুচিত হইবে। তোমরা তাহাকে পালন করিয়া স্নেহের অনুরোধে আপনার বল, কিন্তু সে কখনও তোমাদিগকে আপনার মনে করিবে না।

"সংসারে অধিকাংশ দত্তকসন্তান কিরূপ চরিত্রের হইয়া

থাকে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিলে অনেক পিতামাতা অনেক শিক্ষা লাভ করিতে পারেন। পোষ্যপুত্র বলিয়া যাহারা পরিচিত, তাহাদের অধিকাংশই অপব্যয়ী, দুশ্চরিত্র, এবং আত্মীয়স্বজনের ও সমাজের অশেষ ক্লেশের কারণ হইয়া থাকে। এরূপ হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। মনে কর না কেন, একজনের বহুকষ্টে উপার্জ্জিত বিষয় ও সঞ্চিত ধন যদি বিনাপরিশ্রমে আমার হস্তগত হয়, আর সেই লোকের প্রতি আমার যদি প্রাণের মায়া না থাকে, তাহার অর্থ ও সম্পত্তির প্রতি আমার মায়া হইবে কেন? যৌবনকালে যখন নানা প্রবৃত্তির তরঙ্গ প্রাণের মধ্যে খেলিতে থাকে, যখন আমোদপ্রিয় ইয়ারগণ গ্রীষ্মকালের মক্ষিকার ন্যায় পালে পালে চারিদিক ঘেরিয়া বসে, তখন অগাধ টাকা হাতে থাকিলেও তাহা উড়াইতে কতক্ষণ লাগে? আমাদের দেশে যে হঠাৎবাবুর দল দৃষ্ট হয়, এই পোষ্যপুত্রশ্রেণী হইতে কি তাহারা উৎপন্ন হয় না? যতপ্রকার যথেচ্ছাচার ও অর্থের অপব্যবহার ইহাদের দ্বারা হইয়া থাকে। ইহাদের প্রতি সর্ব্বসাধারণের স্নেহ ও সহানুভূতি দেখিতে পাওয়া যায় না; সুতরাং সাধারণের প্রতি ইহারা সহানুভূতি প্রকাশ করিবে কেন? সাধারণে ইহাদিগকে পরিহাস ও নিন্দা করে।

ইহারাও ধনগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া, সাধারণের মতসকল পাদ দলিত করে এবং তাঁহাদিগকে জব্দ করিতেও ক্রটী করেনা। *** দত্তকপুত্রগণের মধ্যে যে দুএকটী রত্ন না মিলে, এমত নহে, কিন্তু তাহা অতি বিরল এবং সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত। দস্যু-তস্কর প্রভৃতি সকলশ্রেণীর লোকের মধ্যেই যখন সৎপ্রকৃতির লোক পাওয়া যায়, তখন ইহাদের মধ্যেও না পাওয়া যাইবে

কেন? সম্পত্তিশালী হইলেই যে, পোষ্যপুত্র রাখিতে হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। এ সংসারে অর্থের দুইপ্রকার ব্যবহার হইতে পারে। এক ভোগের দ্বারা, দ্বিতীয় ত্যাগেরদ্বারা।***পোষ্য-পুত্রদ্বারা বংশরক্ষা ও ধনীর নামরক্ষা হইবে মনে করিতে পার, কিন্তু অধিকাংশ পোষ্যপুত্রই যখন দুরাচার হয়, তখন তোমার বংশের কলঙ্ক কোথায় যাইবে? আমাদের মতে বংশের কলঙ্ক হওয়া অপেক্ষা বংশের লোপ পাওয়া ভাল। আপনার পেটের সন্তান যদি দুশ্চরিত্র হয়, মাতা তাহারও মৃত্যুকামনা করিয়া নির্ব্বংশ হইতে ইচ্ছা করেন!"—শ্রীমন্ত এইস্থলে পোষ্যপুত্রের পালক পিতাকে লক্ষ্য করিয়া এই কৌতূকাবহ নূতন সত্যকথাটী স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছেন, "পোষ্যপুত্রদ্বারা তোমার বংশরক্ষা না করিলে ভগবানের সৃষ্টি লোপ হইবে না। তুমি ক্ষুদ্র মানব, পৃথিবীর মহৎলোকদিগের সহিত তুলনা করিলে তুমি একটী ক্ষুদ্র কীট, সুতরাং তোমার বংশরক্ষার জন্য এত ভাবনা কেন?"—বুদ্ধিমান্ শ্রীমন্ত সওদাগর ব্যবসায়ে অনুরক্ত। বাণিজ্যসংসারের বিনিময়-বাণিজ্যে শ্রীমন্ত সওদাগরের অনেকদূর ব্যুৎপত্তি লাভ হইয়াছে। অন্তরে অন্তরে অনুভব করিয়া সাধারণ প্রতিনিধিস্বরূপ তিনি যথার্থই বলিয়াছেন, কোন একটী মনুষ্যপুত্রকে দত্তকপুত্র গ্রহণ না করিয়া তাহার বিনিময়ে সংসারের সৎকীর্ত্তিগুলিকে দত্তকপুত্র-রূপে গ্রহণ করিলেই ভাল হয়। শ্রীমন্ত যাহাদিগকে দত্তকপুত্র লইতে বলেন, তাহাদের নাম "চিকিৎসালয়, অনাথনিবাস, পান্থশালা, বিদ্যালয়, অতিথিশালা, দেবালয় বা ধর্ম্মমন্দির, নিরন্ন ব্যক্তিদের জন্য অন্নছত্র, পুষ্করিণী, কূপ ও জলাশয় খনন, রাস্তা-ঘাট নির্ম্মাণ, যে সকল নিঃসহায় ভদ্রমহিলা সাধারণের নিকট

প্রার্থনা করিতে পারেন না, তাঁহাদের সাহায্য, যাঁহারা দেশের হিতসাধনের জন্ম নানাবিধ অনুষ্ঠানে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহাদের আনুকূল্য, দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত লোকের সাহায্য ইত্যাদি, দেশের যে কোন দুরবস্থা দূরীকরণে অর্থসাহায্য।” ইত্যাদি অনেক প্রকার সৎকীর্ত্তি।

ঐরূপ বিনিময় দত্তকে কি কি উপকার, বিনিময়ের প্রস্তাবকর্ত্তা তাহাও অতি সুন্দররূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। “পূর্ব্বকালে এদেশে বিভবশালিনী পুণ্যবতী মহিলাগণ অজস্র অর্থব্যয় করিয়া দীর্ঘিকা, দেবালয়, অতিথিশালা, প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিয়া কত সৎকীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। * * * এইরূপ সৎকার্য্যে এক সঙ্গে দুইটী ফল দৃষ্ট হয়। ইহার দ্বারা দাতার নাম চিরস্মরণীয় এবং সঙ্গে সঙ্গে শতসহস্র লোকের উপকার ও জনসমাজের কত কল্যাণ সাধিত হয়।”

দত্তক-বিনিময়ের এই প্রস্তাবটী অবশ্যই উত্তম। সাধারণ্যে প্রচলনের বাধা এই যে, প্রস্তাবটী সর্ব্ববাদীসম্মত হইবে না। দত্তকপুত্রের ধূমধামটী বঙ্গদেশের হিন্দুসমাজেই বেশী হয়। নির্ব্বংশ হিন্দু স্ত্রীপুরুষেরাই বেশীরভাগে দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন। হিন্দুর দত্তকগ্রহণের বিধানবিধায়ক অনেকগুলি শাস্ত্র আছে। নির্ব্বংশ হিন্দু যেমন দত্তকপুত্রের দ্বারা বংশরক্ষার আশা রাখেন, সেইরূপ বিষয়রক্ষার আশা রাখেন, সেইরূপ জলপিণ্ডেরও আশা রাখেন। শেষের আশাটীই অপর দুটী আশা অপেক্ষা অনেকস্থলে বেশী বলবতী দেখা যায়। কোন প্রকার সৎকীর্ত্তির দ্বারা সে আশার পরিপূরণ হইতে পারিবে না। সুতরাং যাঁহারা দত্তকপুত্রের হস্তে জলপিণ্ডের অভিলাষী, তাঁহারা

যদি জলপিণ্ডদাতা দত্তকপুত্র অপেক্ষা অন্য দত্তকপুত্রে বেশী অনুরাগী হইতে না পারেন, তাহা হইলে দত্তকবিপ্লব ঘুচিবে না। অর্থপিশাচ কৃপণ ধনেশ্বরেরাও জলপিণ্ডদাতা বংশধর দত্তকপুত্রের অতিরিক্ত অন্য কোন সংকীর্ত্তিকে দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করিতে পারিবেন না। যাঁহারা পারিবেন, তাঁহারা সমাজের বাসনা পূরণে অক্ষম হইবেন না।

দত্তকপুত্র সম্বন্ধে এবং হিন্দুর উত্তরাধিকার সম্বন্ধে ইংরেজ-আমলে আজকাল অনেকটা উলট্‌পালট হইয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে একস্থানে বলিয়াছি, ইংরেজের ধর্ম্মাধিকরণে হিন্দুর দায়ভাগ উল্টাইতেছে!

হিন্দুর উত্তরাধিকার সম্বন্ধে প্রকাণ্ড এক ইংরাজি আইন প্রস্তুত হইয়াছে! কয়েকবৎসরের মধ্যে কলিকাতার হাইকোর্টের জজেরা অনেকগুলি হিন্দুর উইল নামঞ্জুর করিয়া দিয়াছেন! দত্তকপুত্র সম্বন্ধেও ভারি গোল! ইংরেজ এখন হিন্দুর দত্তক-গ্রহণের ব্যবস্থা দিবার জন্য স্বইচ্ছায় মধ্যবর্ত্তী হইতেছেন! ছোটখাটো দত্তকে এখনও হস্তক্ষেপ করা হয় নাই, কিন্তু বড় বড় জমিদারীতে নজর পড়িতেছে! সম্প্রতি বর্দ্ধমানের রাজবংশের দত্তকগ্রহণপ্রসঙ্গে কি যে কাণ্ড হইতেছে, তাহা সাধারণে শুনিতেছেন। ইংরেজ হিন্দুশাস্ত্র মানিলেন না! বঙ্গের লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর শ্রীযুক্ত সার ষ্টুয়ার্ট বেলীসাহেব এই বৎসর জুলাইমাসে বর্দ্ধমান ইষ্টেটের পূর্ব্ব ম্যানেজার এবং মৃত মহা-রাজ আপ্‌তাপচাঁদ বাহাদুরের সহোদরা ভগ্নীপতি শ্রীযুক্ত লালা বনবিহারি কর্পূর বাহাদুরের একমাত্র জ্যেষ্ঠ পুত্রকে মহারাজ আপ্‌তাপ চাঁদের মহিষী শ্রীমতী মহারাণী বিনোদেয়ী দেবীর

কোলে সমর্পণ করিয়া আসিয়াছেন। সকলেই আশঙ্কা করিতেছেন, বৰ্দ্ধমান রাজসংসারে এই উপলক্ষে ঘোরতর বিবাদ বাধিয়া উঠিবে।—অগ্নিকুণ্ড হইতে ধূম উত্থিত হইতেছিল, বেলী-সাহেব একটু জল দিলেন, আগুন নিবিল না,—সকলেই আশঙ্কা করিতেছেন. এই আগুন ক্রমে ক্রমে বায়ু সহায়ে ভীষণ প্রতাপে জ্বলিয়া উঠিবে।

তিনশত বৎসরের অধিক হইল, বৰ্দ্ধমান রাজপরিবার বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করিয়াছেন। ইহাঁদের কুলাচার এতৎ-সম্বন্ধে মিতাক্ষরার ব্যবস্থানুগত। বঙ্গের রেবিনিউবোর্ড এবং বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট মহারাজ আপ্‌তাপচাঁদের মহিষীর দত্তক-পুত্রগ্রহণসম্বন্ধে সেই মিতাক্ষরাশাস্ত্র অমান্য করিলেন! ইহাকে মীমাংসা বলে না। এই সূত্র হইতে বোধ হয়, ঘরাও বিবাদে এবং মামলামোকদ্দমায় বঙ্গের এতবড় রাজসংসারটী উৎসন্ন যাইবার সম্ভাবনা!

কৰ্ম্মক্ষেত্রের খেলা অনেকপ্রকার।—কেহ হাসিতেছে, কেহ কাঁদিতেছে, কেহ মরিতেছে, কেহ জন্মিতেছে, কতই আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কাণ্ড, তাহা ভাবনা করা যায় না। লোকে দেখে, সংসার এই রকম। কেন এই রকম, তাহা অনুধাবন করিবার প্রয়োজন হয় না, কিম্বা অনুধাবন করিতে কাহারও প্রবৃত্তি নাই। সামান্য ভানুমতীর বাজীকে যাহারা মহাশ্চর্য্য জ্ঞান করে, এই বিশ্ববাজীকরের বাজীকে তাহারা নিত্যঘটনা ভাবিয়া উপেক্ষা করিয়া থাকে। ইহাও বড় সামান্য আশ্চর্য্য নয়!

কৰ্ম্মক্ষেত্রের খেলার মধ্যে বিলক্ষণ ভেল্কী আছে। এ আপনার, ও পর, এ দস্যু, ও সাধু, এ দুরাচার, ও সদা-

চার, এই সকল আন্দোলনে অনেক লোকেই সময় কাটায়। কেহ ঠকিতেছে, কেহ ঠকাইতেছে। কেহ কেহ কাটি-তেছে, কেহ কেহ কাটা পড়িতেছে। কেহ নাচিতেছে, কেহ ব্যাধিশয্যায় শয়ন করিয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। কেহ ঐশ্বর্য্য ভোগবিলাসে অহর্নিশি প্রমোদিত, অধিক অভাগারা দুটী দুটী উদরান্নের জন্য লালায়িত! এমন চমৎকার খেলা কেহ কখনও দেখে নাই, এমন কথা কেহই বলিতে পারিবে না। সকলেই নিত্য নিত্য দেখিতেছে, সকলেই নিত্য নিত্য ভুগিতেছে, কিন্তু চৈতন্য হয় না ; ইহাই আশ্চর্য্য!—আজ যিনি বহুরাজ্যের অধীশ্বর হইয়া, রত্নমুকুট মাথায় দিয়া, রত্নসিংহাসনে উপবেশন করিয়া, লক্ষ লক্ষ লোকের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হইতেছেন, কল্য হয় ত তিনি পথের ভিকারী! আজ যে ব্যক্তি কৌপানমাত্র সার করিয়া, নেত্রনীরে ভাসিয়া শুষ্ককণ্ঠে শুষ্কোদরে দ্বারে দ্বারে মুষ্টিভিক্ষা করিতেছে, কল্য হয় ত সেই ব্যক্তিই রাজা! এগুলিও কর্ম্মক্ষেত্রের ভেল্‌কী।—কর্ম্মক্ষেত্রের নিয়মই এই। কেহ উঠি-তেছে, কেহ পড়িতেছে! এই খেলার নাম সংসারমেলার নাগরদোলা!—সুখদুঃখ ইহার রজ্জু!

আমাদের এই আখ্যায়িকার নায়ক, উপনায়ক, নায়িকা, উপনায়িকা, এবং তদানুসঙ্গিক অপরাপর ক্রীড়কেরা এই কর্ম্ম-ক্ষেত্রের চক্রে চক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে কে কোথায় বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন, এইবার একত্র করিতে হইবে।

———

অষ্টাদশ কল্প।

তুমিই কি সেই ?

একবৎসর অতীত।—দ্বারকাদাস বাটীতে আসিয়া যেদিন বনবালার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, সেটী এক প্রকার নূতন দিন। সেদিন এক প্রকার পুরাতন হইয়া পড়িয়াছে। পাটলিপুত্রের সে সকল কথা পাঠকমহাশয়ের কর্ণে এখন আর নূতন বলিয়া প্রীতিপ্রদ হইবে না। দয়াবতী পিয়ারবাবু পাটনাতেই আছেন কি না, সেই ছদ্মবেশী বালকের সঙ্গে পাটনায় আর তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল কি না, দ্বারকাদাসের সহিত পিয়ারবাবুর দেখাসাক্ষাৎ পরিচয় আছে কি না, তাহারও ত কিছু তত্ত্ব লওয়া হইল না। পাটনার কথা এই একবৎসর যেন মনেই নাই!

এ আবার কোন্ দেশ?—বনবালা যেদিন হুগ্‌লী জেলার হরিণবাড়ী গ্রামে চৌকীদারের হাতে ধরা পড়ে, তাহার পূর্ব্বদিন রাত্রে বর্দ্ধমানে এক আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়াছিল। বর্দ্ধমানে আমাদের জটাধরের এক বন্ধু আছেন। সেই বন্ধুই সম্প্রতি জটাধরের কাছে সেই আশ্চর্য্য ঘটনার গল্প করিয়াছেন। গল্পেও আছে, এক বোবামেয়ের কথা।—তাহাতেই জটাধর অনুমান

করিয়া লইয়াছেন, বনবালাই তবে সেরাত্রে বর্দ্ধমানে ছিল। জটাধরের সেই বন্ধুটীর বাটীতেই ছিল। আশ্চর্য্য ঘটনা এই হয় যে, বনবালার যেমন স্বভাব হইয়াছে, মানুষ দেখিলেই পত্র দেখায়, জটাধরের বর্দ্ধমানস্থ বন্ধুকেও অভাগিনী সেই পত্রখানি দেখাইয়াছিল। জটাধরের বন্ধু সেই পত্রখানা দূর করিয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দেন!—ঘৃণাপূর্ব্বক অনাথিনী বনবালাকেও রাত্রিকালে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেন! বনবালা চক্ষের জলে ভাসিয়া রাত্রিকালে একজন ভদ্রলোকের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আইসে! কি প্রকারে কোথায় রাত কাটাইয়াছিল, বনবালার মুখে না শুনিলে তাহা ঠিক করিবার উপায় নাই। দুর্ভাগ্য! বনবালার কথা কহিবার শক্তি নাই!

জটাধরের বর্দ্ধমানস্থ ঐ বন্ধুর নাম নরোত্তম হালদার। আজ আমরা যেদিনের কথা বলিতেছি, সেদিন বর্দ্ধমানে নরোত্তম হালদারের বাটীতে জটাধর উপস্থিত ছিলেন। নরোত্তমের পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে সেদিন সমারোহে ব্রাহ্মণভোজন হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার পরেও অনেকলোক আগমন করিতেছেন। রাত্রি প্রায় দশটা পর্য্যন্ত ভোজের ব্যাপারের নাগাড় চলিল। দশটার পর ক্রিয়াবাড়ী একটু নিস্তব্ধ। কেবল দুইএকজন গলাভাঙ্গা লোকের অস্পষ্ট হুম্‌হাম্ শব্দ শ্রুতিগোচর হয়। জটাধর শয়ন করেন নাই,—পূজার দালানের একধারে একখানি সতরঞ্চির উপর পরিশ্রান্তভাবে শয়ন করিয়া আছেন। নিকটে আর কেহই নাই।—জটাধর পার্শ্ব ফিরিয়া হঠাৎ দেখিলেন, একটু দূরে থামের পাশে দুটী মানুষ বসিয়া রহিয়াছে। অত্যন্ত কদাকার,—অত্যন্ত রোগা,—অত্যন্ত জীর্ণবস্ত্র। একজনের

মাথায় রুক্ষ রুক্ষ ঝাঁকড়া চুল, আর একজন ন্যাড়া। এই নেড়া লোকটী অত্যন্ত দীর্ঘাকার। সাধারণ মানুষ অপেক্ষা প্রায় একহাত উঁচু মানুষ।—থামের পাশে বসিয়া রহিয়াছে' বসিবার ভঙ্গীতে থামের কতদূর পর্য্যন্ত মাথা উঠিয়াছে, সেইটী একবার দর্শন করিলেই ঠিক ঐরূপ অনুমান আইসে।—খাড়া হইয়া দাঁড়াইলে বোধ হয়, আরও বড় দেখায়!

জটাধর সেই নূতন লোকদুটীকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেগা তোমরা?"

দুজনেই একসঙ্গে সকাতরে চিঁচিঁ করিয়া উত্তর দিল, "কাঙাল বাবা!—মরি বাবা!—কাণা বাবা!—কেউ নেই বাবা!" জটাধর কাতর হইলেন। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা দুজনেই কি অন্ধ?"

এই প্রশ্নের উত্তরে জটাধর যাহা জানিলেন, তাহাতে প্রকাশ পাইল, ঐ দীর্ঘাকার হতভাগার নেড়ালোকটীর দুটী চক্ষু অন্ধ। ছোটটীর নহে।

নরোত্তম আগমন করিলেন। জটাধর তাঁহাকে ঐ দুটী ভিক্ষুকের কথা জানাইয়া বিস্তর দুঃখ প্রকাশ করিলেন। ভিক্ষুকদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক নরোত্তম জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোদের খাওয়া হয়েছে?"

ভিক্ষুকেরা কাঁদিয়া ফেলিল!—জটাধর বুঝিলেন, খাওয়া হয় নাই। তৎক্ষণাৎ খাদ্যসামগ্রী আনাইয়া উভয়কে পরিতোষরূপে ভোজন করান হইল। তাহারা আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিল, "বাবুর জয় হোক্!"

রাত্রিকালে ভিক্ষুকেরা যায় কোথায়?—জটাধর তাহাদিগকে

জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা থাকো কোথা?—কে তোমরা? তোমাদের বাড়ী কোথা?—থাকো কোথা?"

নেড়া উত্তর করিল, "মাঠে, ময়দানে, গাছতলায়, যেখানে পাই, সেই খানেই থাকি!"

দয়া করিয়া জটাধর তাহাদের দুজনকে সে রাত্রের মত ঐ দালানেই শুয়াইয়া রাখিলেন। আপনিও দালানে।

নিদ্রার অগ্রে ভিকারীদের সঙ্গে জটাধরের অনেক প্রকার কথোপকথন হইল। ভিকারীরা কাঁদিতে কাঁদিতে আপনাদের দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করিয়া জটাধরের মন ভিজাইল। দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করিল, কিন্তু সুখের কাহিনী কিছুই বলিল না। গোড়ার কথাগুলি চাপিয়া রাখিল।—দুঃখ আসিবার অগ্রে কি ছিল, সে অবস্থাটার প্রসঙ্গও তুলিল না।

জটাধর একজন প্রতিভাসম্পন্ন জ্ঞানী পুরুষ। তাঁহার হৃদয়ে দয়া আছে, মনেও বল আছে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া তিনি ঐ ভিকারীদের মুখ হইতে যেসকল গুহ্যকথা বাহির করিয়া লইলেন, তাহাতে তাঁহার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। দুঃখের কথা শুনিয়া জটাধরের চক্ষে সর্ব্বদাই জল আইসে, কিন্তু অতবড় দুঃখী ভিকারীদের দুঃখের কথা শুনিয়া জটাধরের চক্ষে একবিন্দুও জল আসিল না। বিস্ফারিত নয়নে তিনি অবাক্ হইয়া আকাশপানে চাহিয়া রহিলেন।

অকস্মাৎ এবিস্ময়ের কারণ কি?—কারণ বৃহৎ!—যে দুই জন ভিক্ষুক অস্থিচর্ম্মসার হইয়া শ্রাদ্ধের কাঙালী বিদায়ে উমেদার হইয়াছে, সে দুইজন ভিক্ষুক দুটী দুটী চিড়েমুড়কীর লোভে ক্ষুধায় কাতর হইয়া বর্দ্ধমানে নরোত্তম হালদারের পিতৃশ্রাদ্ধে

কাঙালী হইয়াছে,—যে দুইজন ভিক্ষুক ঐ নরোত্তমের দালানে জটাধরের নিকটে আপনাদের জীবনকাহিনী বর্ণন করিতেছে, তাঁহারা অপর আর কেহই নহে, সেই জীর্ণশীর্ণ দীর্ঘতনু মুণ্ডিত-মুণ্ড অন্ধ ভিক্ষুকটী সেই হরিণবাড়ীগ্রামের মহাবলপরাক্রান্ত কায়স্থ-দলপতি পাপাশয় বিশ্বদুর্ল্লভ চৌধুরী। তাহার অর্থ গিয়াছে, সামর্থ্য গিয়াছে, দর্প গিয়াছে, সব গিয়াছে! আছে কেবল অস্থি কখানি! কণ্ঠের নিশ্বাসটুকু! আছে সেই প্রকাণ্ড ভুঁড়ীটী!—অস্থির সঙ্গে ভুঁড়ীর মিলন কিপ্রকারে সম্ভবে? আগেকার ভুঁড়ী নয়,—এখনকার শক্ত ভুঁড়ীটী শুদ্ধ কেবল প্লীহাযকৃতে পরিপূর্ণ। এব্যক্তি আপনার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে। জটাধর ক্রোধে তাহার প্রতি বিশাল কটাক্ষপাত করিয়া নিশ্বাসের সঙ্গে মনে মনে হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমিই কি সেই?"

দ্বিতীয় ভিক্ষুকের নাম নবাব রামহরি।—ঐ বিশ্বদুর্ল্লভের কুচক্র-বাগুরায় পুনঃপুন বন্দী হইয়া রামহরি সর্ব্বস্বান্ত হয়! এব্যক্তি নিজের দোষে ভিকারী হয় নাই,—নিজের পাপে ভিকারী হইয়াছে।—সে পাপের কথা উপযুক্ত সময়ে প্রকাশ পাইবে। এখন কেবল এইমাত্র জানা দরকার যে, লোকটা কে?—ভিকারী-অবস্থার পরিচয়ে প্রকাশ পাইয়াছে, ব্রাহ্মণও নয়,—নবাবও নয়,—নামও রামহরি নয়,—তাঁহার কোন পুরুষেও নবাব-সরকারের চাকর নয়, কিছুই নয়! দৈবজ্ঞ আচার্য্যব্রাহ্মণ। গণনাবিদ্যায় তাহার অনেকদূর পারদর্শিতা ছিল।—গণনার জোরে এবং অপরাপর রকমারি কারবারে ঐ ব্যক্তি টাকার মানুষ হইয়া উঠে। যশোহর অঞ্চলে নিবাস ছিল, কলঙ্কের

দায়ে পলায়ন করিয়া নিজে আসিয়া হুগ্‌লীতে বাস করে। ইহার নাম গোবর্দ্ধন আচার্য্য।—ইহার জ্যাটামশাই নবাব-সরকারে চাকুরী করিয়াছিল বলিয়া নবাব উপাধি পাইয়াছে, ঐ ব্যক্তি অন্যলোকের কাছে সেই কথাই বলিত।—কথাটার একটু মূলও আছে। গোবর্দ্ধনের জ্যাটামশাই নবাই আচার্য্য একবার নবাবের এক মুহুরীর স্ত্রীর হাত দেখিয়া বলিয়া দিয়াছিল, "যুগল সন্তান হইবে।" সেই গণনাটাই তাহার পক্ষে হয় ত নবাবসরকারে চাকুরী করা!—তাহাতেই হয় ত নবাবী খেতাব পাওয়া! কিম্বা হয় ত নামের গুণে!—জ্যাটামহাশয়ের নাম নবাই আচার্য্য। নবাই "হইতে যদি দৈবাৎ "ই" লোপ পাইয়া "ব" বসিয়া থাকে, নবাই উচ্চারণ করিতে করিতে যদি "নবাব" উচ্চারণ অসম্ভববোধ না হয়, তাহা হইলে তাহাতেই হয় ত নবাব ঠাকুরের নবাব খেতাব হইয়া থাকিবে! নবাব রামহরি জাল নাম!—আসল নাম গোবর্দ্ধন আচার্য্য। গোবর্দ্ধন আচার্য্য একজন পাকা গণক।—সে যখন যশোহর হইতে পলাইয়া আসিবার গোপনীয় বন্দোবস্ত করে, সেই সময় পাড়ার এক ব্রাহ্মণের একটী একবৎসরের কন্যাকে চুরী করিবার মৎলব আঁটে!—পলায়নের দিন চুরী করিয়াই পলায়ন করে! গ্রামে রাষ্ট্র হয়, মেয়েটী দোলায় শুইয়া ঘুমাইতেছিল, শিয়ালে লইয়া গিয়াছে!—সে সময় এদেশে পুলিসের এত কড়াকড় ছিল না, কাজে কাজেই শিয়ালে খাওয়া ত শিয়ালে খাওয়া! তখনকার আমলের সমস্ত মামলা সেইখানেই নির্ব্বাণ!

গোবর্দ্ধন আচার্য্য সেই ব্রাহ্মণের মেয়েটীকে চুরী করিয়াছিল!—চুরী করিবার কারণ এই যে, মেয়েটীর মাতা একদিন

মেয়েটীকে কোলে করিয়া গোবর্দ্ধনের কাছে লক্ষণ দেখাইতে যান। গোবর্দ্ধন সেই মেয়েটীর হস্তরেখা দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হয়! মাতাকে বলিয়া দেয়, "মেয়ে যদি বাঁচে, তাহা হইলে সুখী হইবে।" মাতা খুসী হইয়া গোবর্দ্ধনকে একটী নূতন রজতমুদ্রা দর্শনী প্রদান করিয়া ঘরে যান।

গোবর্দ্ধন ঐ প্রকারে মেয়ে চুরী করিয়া, সপরিবারে হুগলী জেলায় আসিয়া উপনিবেশ করে। সেই মেয়েটীকে লালন-পালন করিয়া তাহারা স্ত্রীপুরুষে আপন কন্যার ন্যায় স্নেহমমতা দেখাইত। সকলের কাছেই বলিত, নিজের মেয়ে। এ মেয়েকে চুরী করিবার মৎলব এই যে, গোবর্দ্ধন তাহার হস্তরেখা পরীক্ষা করিয়া ছোটবেলাতেই জানিতে পারিয়াছিল, "মেয়েটী পরম ভাগ্যবতী!—এ মেয়ে রাজরাণী হইবে!" সেই জন্যই চুরী করা!—মেয়ে রাজরাণী হইলে গোবর্দ্ধন অবশ্যই রাজার শ্বশুর এবং রাজরাণীর পিতা হইয়া জনসমাজে মানসম্ভ্রম পাইবে, টাকার অভাব থাকিবে না, যাবজ্জীবন সুখে কাটাইতে পারিবে, এই মৎলবেই চুরী করা! পাঠকমহাশয় এখন বুঝিলেন, এই গোবর্দ্ধন আচার্য্য, ওরফে নবাব রামহরি মুখোপাধ্যায় একজন সুচতুর অর্থলোভী নীচাশয় সুশিক্ষিত মেয়েচোর!

এই মেয়েই সেই যোগমায়া!—মহাশয় দ্বারকাদাস এই যোগমায়াকে বিবাহ করিয়াছেন। যোগমায়া যথার্থই ব্রাহ্মণের কন্যা।—আচার্য্যের গৃহে প্রতিপালিতা হইয়াছেন, এই মাত্র দোষ। নতুবা মুসলমানও নয়, অন্য জাতিও নয়, কিছুই নয়। যোগমায়ার মাতাপিতা বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ। যোগমায়াদেবী বিশুদ্ধ

ব্রাহ্মণবংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। গোবর্দ্ধন আচার্য্য সেই মেয়েটীকে রাজার হস্তে সমর্পণ করিয়া যে আশালতাকে বুকের ভিতর রোপণ করিয়াছিল, বিশ্বদুর্ল্লভ তাহার গোড়া কাটিয়া দিয়াছে! লতাটী পুষ্পবতী হইবার পূর্ব্বেই শুকাইয়া গিয়াছে! অর্থলোভী দুষ্ট পিশাচদলপতি বিশ্বদুর্ল্লভ চৌধুরী বিবাহের পূর্ব্বে গোবর্দ্ধনের অনেক টাকা লইয়াছে, সমন্বয়ের সময় অনেক টাকা খরচ করাইয়াছে, তাহারই কুমন্ত্রণায় বিবাহেও যেন ক্রোরপতির ন্যায় ধূমধাম করা হইয়াছে। তাহাতেই প্রায় হাতাহাতি গোবর্দ্ধন একটু অবসন্ন। বিবাহের পর দুই মাস না যাইতেই বিশ্বদুর্ল্লভ আবার তাহার কাছে পাঁচ হাজার টাকা দাবী করেন! ভালঘরে কুটুম্বিতা হইয়াছে, গোবর্দ্ধন বড়মানুষ আছে, আরও বড়মানুষ হইয়া উঠিবে, বিশ্বদুর্ল্লভ তাহার গোড়া, এই ভাবিয়া গোবর্দ্ধন মনে মনে বিরক্ত হইয়াও বিশ্ব-দুর্ল্লভের দাবী শোধ করিয়া দেয়। দফা দফা এই রকম। শেষে গোবর্দ্ধন একটু সতর্ক হইয়া আইসে। সতর্ক হইলে কি হইবে?—জোঁক যতক্ষণ রক্ত খাইতে পারে, ততক্ষণ খায়, পেটে না ধরিলেই খসিয়া পড়িয়া যায়।—বিশ্বদুর্ল্লভের তখনও পর্য্যন্ত পেট খালি! গোবর্দ্ধন ক্রমশঃ হাত গুটাইতে আরম্ভ করে। সহজে না পাইয়া বিশ্বদুর্ল্লভ নূতন নূতন ফিকির, নূতন নূতন জবরদস্তি, এবং নূতন নূতন জাল মোকদ্দমা উপ-স্থিত করিয়া ক্রমে ক্রমে,—ক্রমে ক্রমে অথচ শীঘ্র শীঘ্রই গোবর্দ্ধনের দফা সারিয়া ফেলিল!—সম্পূর্ণরূপেই সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া তুলিল! পরের মন্দ করিতে গেলেই আপনার মন্দ আগে হয়, এই ধর্ম্মবাক্য অনুসারে বিশ্বদুর্ল্লভ চৌধুরীও

ঐ গোবর্দ্ধনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেও মজিল! পরিবারলোকেরা মামলা-মোকদ্দমা করিয়া কেহ কেহ বাটী হইতে বাহির হইয়া গেল, কেহ কেহ বিশ্বদুর্লভের পরমশত্রু হইয়া দাঁড়াইল! দুটী একটী পুত্রকন্যা যাহা ছিল, তাহারাও বাপের পাপে অকালে প্রাণ হারাইল! একটী অষ্টমবর্ষীয়া গৌরীকন্যা অযত্নে অকস্মাৎ ছাতের উপর হইতে পড়িয়া মরিল! দ্বাদশ ও ষোড়শবর্ষীয় দুটী পুত্র একদিনে এক সঙ্গে হুগলীর গঙ্গায় স্নান করিতে গিয়া সাঁতার খেলিতে খেলিতে পূর্ণ জোয়ারের মুখে অতল জলে তলাইয়া গেল! আরএকটী পঞ্চমবর্ষীয় শিশু বাটীর সম্মুখের রাস্তায় নাচিতে নাচিতে মুখে রক্ত উঠিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল!—পড়িল আর মরিল!—বাড়ীতে বজ্রাঘাত হইয়া "দ" পড়িয়া গেল! বাড়ীতে বাজ পড়িবার আগে একবার ডাকাত পড়িয়াছিল! ডাকাতেরা মশালের আগুনে বিশ্বদুর্লভের স্ত্রীকে দগ্ধ করিয়া মারিয়াছে! মশালের আগুনে বিশ্বদুর্লভের মুখখানা দগ্ধ করিয়া চক্ষুদুটী অন্ধ করিয়া দিয়াছে! দেখুন সকলে,কোন্ পাপের কেমন প্রায়শ্চিত্ত! এখনও ধর্ম্মের জয় কতদূর!

নবাব রামহরিকে দেখিয়া চিনিতে পারা যায়, এমন লক্ষণ তাহার শরীরে এখন কিছুই নাই!—পরিচয়ে চিনিতে পারিয়া জটাধর তাহাকে বহুকষ্টে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নবাব রামহরি! তুমিই কি সেই?"

রামহরি উত্তর দিতে পারিল না।—কথা কহিবার শক্তি হইল না। কেবল নিশ্বাস ফেলিয়া চক্ষের জলে ভাসিল! গুঁড়ি মারিয়া জটাধরের পায়ে ধরিতে আসিল!

পা সরাইয়া লইয়া জটাধর কাতরবচনে কহিলেন, "রামহরি!

তুমি এখন রামহরি নও!—হতভাগ্য! তুমি এখন নবাব নও!—গোবর্দ্ধন! তুমি আর এখন গোবর্দ্ধন নও!—তুমি এখন ভিকারী!—তোমাদের এই প্রবল প্রতাপান্বিত পাপ-মতি দলপতি এখন আর হরিণবাড়ীর বিশ্বদুর্ল্ভ চৌধুরী নয়!—সর্ব্বদুর্ল্ভ অনাহারী ভিকারী!—পরের জাত মারা, পরের অর্থ গ্রাস করা, পরের অনিষ্ট সাধনে সার্থক জীবন অন-র্থক উৎসর্গ করা, টাকার লোভে অন্ধ হইয়া গরিব অগরিব সমস্ত লোকের সর্ব্বনাশের আগুন জ্বালা,—এ সকল পাপের যে কি প্রায়শ্চিত্ত, তোমাদের দলপতি বিশ্বদুর্ল্ভ তাহা অহরহ ভোগ করিতেছে। রামহরি! এখনও আমি তোমাকে রামহরি বলি! তুমি মুখোপাধ্যায় নও, তুমি নবাব নও, তুমি সুলক্ষণা পুণ্যশীলা যোগমায়ার পিতা নও,—তুমি ভিকারী!—মহাপাপী তোমরা! তোমাদের কষ্টে কষ্ট হওয়া উচিত নয়, তথাপি আমার কষ্ট হই-তেছে। রামহরি! বল,—আমার কাছে আজ তোমরা এখন কি উপকার চাও?"

কি উপকার চায়, ভিকারীরা তাহা কিছুই বলিতে পারিল না! দুজনের একজনও না!—জটাধর তাহাদের ভাবভক্তি বুঝিতে পারিলেন। দৈবজ্ঞের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "গোবর্দ্ধন! তোমার গণনা ঠিক হইয়াছে। যোগমায়া রাজরাণী হইয়াছেন! গোবর্দ্ধন! এত জুয়াচুরী তুমি কোথায় শিখিয়াছিলে?—দৈবজ্ঞের ভিতরেও কি এত জুয়াচোর থাকে?—জুয়াচোরের গ্রামেই জুয়াচোরেরা বাস করিতে ভালবাসে। এই বিশ্বদুর্ল্ভ চৌধুরী একজন পাকা ধড়ীবাজ জুয়াচোর!—তুমিও যশোহরে অনেক জুয়াচুরী করিয়া,—অনেক সতীর সতীত্ব নাশ করিয়া,—অনেক

লোকের সর্ব্বনাশের আগুন জালিয়া, শেষকালে এক মেয়ে চুরী করিয়া হরিণবাড়ীতে পলাইয়া আসিয়াছিলে। পরামর্শটা করিয়াছিলে ভাল!—মৎলবটা ঠাওরাইয়াছিলে ভাল!—বিশ্বদুর্লভের সঙ্গে মিলনটাও হইয়াছিল ভাল!—হাতে হাতে পাপের প্রতিফল দেখ!—গেলেও অধঃপাতে দুজনে এক সঙ্গে!—আচ্ছা রামহরি, তুমি আমাদের যোগমায়াদেবীর পালকপিতা। ধর্ম্মের অনুরোধে আমি তোমার একটু ভাল করিতে চাই। আজ হইতে এক পক্ষ অবসানে তুমি পাটনাসহরে তোমার মহাশয় জামাতার কুঠীতে উপস্থিত হইও। আমিও সেইখানে উপস্থিত থাকিব। শেষের কটাদিন যাহাতে তোমাকে নিত্য ভিক্ষা করিয়া খাইতে না হয়,তাহার উপায় করা যাইবে।"—দ্বিতীয় ভিকারীকে সম্বোধন করিয়া জটাধর কহিলেন, "বিশ্বদুর্লভ! তুমিও যাইও। জন্মাবধি তুমি অত্যন্ত টাকা ভালবাসিতে, তোমাকেও কিছু টাকা দেওয়াইব। আজ আমার কাছে বেশী নাই,দুজনে তোমরা দুটী টাকা গ্রহণ কর। ভাত খাইও!"—এই বলিয়া সদাশয় জটাধর তাচ্ছিল্যভাবে দুজনের সম্মুখে দুটীটাকা ফেলিয়া দিলেন। কাঙালীবিদায়ের দস্তুরমতে গৃহস্বামী কর্ম্মকর্ত্তাও দুজনকে দুই আনা করিয়া চারি আনা দান করিলেন।

ঊনবিংশ কল্প।

আবার একবৎসর।

আবার একবৎসর অতীত।—পূর্ব্বের কয়েকটী কল্পে অনেক অন্ধকার কথা আছে। যোগমায়ার বিবাহের পর অবধি বনবালার যে যে ঘটনা প্রকাশ পাইল, তাহাতে বনবালার চরিত্রে বিলক্ষণ সংশয় উপস্থিত হয়। অযোধ্যার ক্ষেত্রপথের মুদীর দোকানে রাখাল বালক নহবৎলাল শেষকালে গর্ভবতী বনবালার কলঙ্ক সম্বন্ধে ভোগানন্দঠাকুরের কাছে যাহা বলিয়াছিল, তাহাই সর্ব্বদা মনে আইসে। পাঠক-পাঠিকারাও হয় ত নহবতের সেই সকল কথা মনে করিয়া সর্ব্বদাই সংশয়াকুল হইতেছেন। বাস্তবিক এ সংশয়ের কোন কারণ আছে কি না, বনবালা যদি কলঙ্কিনী না হয়, তাহা হইলে বনবালাই তাহা বলিবে।—কি করিয়াই বা বোবামেয়ের মুখ দিয়া কথা বাহির হইবে, তাহাও এক বিষম সমস্যা। বনবালা যদি আপনার নিষ্কলঙ্কের কোন নিদর্শন দেখাইতে না পারেন,—তাঁহার চরিত্রের উপর এই যে এক গুরুতর কলঙ্কের গুরুতর সংশয়,—বনবালা যদি তাহা খণ্ডন করিবার কোন প্রকার সন্তোষকর প্রমাণ দিতে না পারেন, তাহা হইলে সে সংশয় হয় ত আর কিছুতেই ভঞ্জন হইবে না।

পাঠকমহাশয়কে একবার চম্পানগরে গমন করিতে হইতেছে। সেই স্থানে উপর্য্যুপরি অনেকগুলি নূতন কাণ্ড সংঘটিত হইবে। সেই সকল কাণ্ডের সহিত এই আখ্যায়িকার নায়কনায়িকাগণের অনেকদূর সংশ্রব দেখিতে পাইবেন। এই অভিলাষে আমি আপনাদিগকে চম্পানগরে আমন্ত্রণ করিতেছি।

ইংরেজ আমলে এখন যেস্থানের প্রচলিত নাম ভাগলপুর, সেই স্থানের প্রাচীন নাম চম্পানগর। এই চম্পানগরে বহুতর কারবারী লোকের বাস। বেহার অঞ্চলে এই স্থানটী বিখ্যাত বাণিজ্য-স্থান। পূর্ব্বে এই স্থানের বিলক্ষণ শোভাসমৃদ্ধি ছিল। ইংরেজ আমলে এখনও ইহার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি। বর্দ্ধমানে নরোত্তমের বাটীতে জটাধরের সহিত ভিকারীদের সাক্ষাৎ হইবার এক বৎসর পরে চম্পানগরে ভোগানন্দঠাকুরের সহিত সদাশিব মিশ্রের সাক্ষাৎ। বহুদিনের পরে ভোগানন্দের দর্শন পাওয়া গেল। ভোগানন্দ যখন অযোধ্যায় ছিলেন, তৎকালে তাঁহার পিতা আত্মানন্দ ঠাকুর পুত্রকে বাটী আসিবার নিমিত্ত যে পত্র লেখেন, তাহাতেই প্রকাশ পায়, মগধরাজ্যে ভোগানন্দের নিবাস। মগধের একটী প্রধান নগর, চম্পানগর। এই চম্পানগরেই ভোগানন্দের পৈতৃক নিবাস। ভোগানন্দের পিতামহ আপনার পৈতৃক সম্পত্তি বহুগুণে পরিবর্দ্ধিত করিয়া নগরী মধ্যে প্রধান হইয়াছিলেন। তাহার পর ভোগানন্দের পিতা,এবং ভোগানন্দ স্বয়ং বহুবিধ ব্যবসায়ে আরও অনেক সৌভাগ্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। যখনকার কথা, তখন তাঁহারা চম্পানগরে বিলক্ষণ সুবিখ্যাত, জাতিতে ব্রাহ্মণ, তখনকার ব্রাহ্মণের যজন যাজন ভিন্ন অন্য ব্যবসা বড় বেশী ছিল না; কিন্তু

আত্মানন্দের পিতা মরিচের কারবার করিয়া সমধিক পরিমাণে লক্ষ্মীশ্রী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই উৎসাহে ও সেই উল্লাসে ইহাঁরা তিন পুরুষের মধ্যে মরিচের ব্যবসা ছাড়িলেন না। মরিচের সঙ্গে আরও অনেক প্রকার ব্রাহ্মণব্যবহার্য্য বাণিজ্য-দ্রব্য যোগ করিয়া লইয়াছেন। বাণিজ্য ভিন্ন অন্য প্রকার কোন কার্য্যই ইহাঁরা উপার্জ্জনের মূল বলিয়া অবলম্বন করেন না। ব্যবসায়ের অনুরোধে ইহাঁরা অনেক দূরদূরান্তর পর্য্যন্ত দেশ ভ্রমণ করিয়া থাকেন।—ধর্ম্মে ইহাঁদের অচলা ভক্তি।—কারবারের মধ্যে কিছুমাত্র প্রবঞ্চনা নাই। এই গুণেই কমলা প্রসন্না হইয়া সংসারে এই ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণপরিবারকে পরমসুখে রাখিয়াছেন। পিতা অপেক্ষা বরং ভোগানন্দের ধর্ম্মনিষ্ঠা ও বিশুদ্ধ বাণিজ্যবুদ্ধি আরও কিছু বেশী। ভোগানন্দের চরিত্র অতি নির্ম্মল। তাঁহার পিতৃভক্তি প্রায় অতুল্য। আহার করিতে বসিয়াছেন, তাহা জানিতে না পারিয়া পিতা যদি দূর হইতে আহ্বান করেন, ভোজন পরিত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ তিনি পিতৃআজ্ঞা পালন করিতে অগ্রসর হন। পিতৃবৎসলতার এই প্রকার অত্যাধিক্য নিবন্ধন সময়ে সময়ে ভোগানন্দের অনেক ক্ষতি হইয়াছে, অনেক গুরু-তর বিষয়ে বাধা পড়িয়াছে, ভোগানন্দ তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ন হন নাই। ভোগানন্দের পিতৃবাৎসল্যের দুটী আশ্চর্য্য উদাহরণ প্রচার আছে। একবার এক নবাবের কাছে ভোগানন্দের লক্ষ টাকা পাওনা হয়। বহুদিন বাকী পড়িয়া থাকে। নবাব একদিন একটী দিন স্থির করিয়া ভোগানন্দকে সমাচার দেন, "সেই দিন সমস্ত টাকা প্রদান করিবেন। সেই দিনের পরদিন নবাব তাঁহার সমস্ত ধনদৌলত মক্কার ফকিরগণকে দান করিবার অভিলাষে

মক্কায় যাইবেন। নির্দ্দিষ্ট দিবসে আসিতে না পারিলে সে টাকা আর পাওয়া যাইবে না।" এই সমাচার পাইয়া ভোগানন্দঠাকুর নির্দ্দিষ্ট দিবসে নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাত্রা করিতেছেন, এমন সময় পিতা ডাকিয়া পাঠাইলেন।

ভোগানন্দ অবশ্যই পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। পিতা কহিলেন, "আজ তোমার বাহিরে যাওয়া হইবে না। আমি অনেক দিন ভাবিতেছি, লবণ বিক্রয় করিয়াছি।—লবণ বিক্রয়টা ব্রাহ্মণের পক্ষে বড়ই নিষিদ্ধ।—ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া অবধি জ্ঞানকৃত পাপ আমি একটীও করি নাই। গোলেমালে হইয়া গেলেও, লবণবিক্রয়টা আমার জ্ঞানকৃত পাপ। আমি তজ্জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিব। আজ তুমি বাহিরে যাইতে পারিবে না। ফর্দ্দ কর।—এ ফর্দ্দ কেবল তুমি আর আমি ভিন্ন আর কেহই জানিবে না। বড় শক্ত প্রায়শ্চিত্ত! বড় শক্ত পাপ! অনেক দিন চিন্তা করিতেছি, হইয়াই উঠে না! তুমি ফর্দ্দ কর!"

ভোগানন্দ বলিতে পারিতেন, "অনেক দিনের চিন্তার ফল আর এক দিন পরে হইলে ক্ষতি কি?"—কিন্তু ভোগানন্দ তাহা বলিলেন না। পিতা বলিতেছেন অদ্য, তিনি কি প্রকারেই বা বলেন কল্য। তাহা বলিলে প্রকারান্তরে পিতৃআজ্ঞালঙ্ঘন-জন্য পাপ হয়। ভোগানন্দ ভাবিলেন, "সে পাপ আমি করিব না। পিতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘনের মূল্য অধোগতি;—পিতৃআজ্ঞা পালনের মূল্য ঊর্দ্ধগতি। নবাবের লক্ষটাকা অপেক্ষা,—অমন লক্ষ-লক্ষ টাকা অপেক্ষা সে মূল্য অনেক বেশী।"—ভোগানন্দের এই ভাবনাই অন্তরের মীমাংসার সহিত মিলিত হইল। নবাবের

লক্ষটাকাকে তিনি তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া পিতৃনিদেশানুসারে তৎক্ষণাৎ প্রায়শ্চিত্তের ফর্দ্দ করিতে বসিলেন। ফর্দ্দে গুটী-কতক জিনিসের নাম লেখা হইয়াছে, এরূপ স্থলে বাধা দিয়া আত্মানন্দঠাকুর ভোগানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি যাত্রা করিয়া বাহির হইতেছিলে কোথায় ?"

পিতার কাছে গোপন করাও পাপ।—ভোগানন্দ কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়াই কহিলেন, "নবাব সাদৎ আলীর সেই লক্ষটাকার জন্য।"

কর্ত্তাঠাকুর মহাবিস্মিত হইয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে আমাকে অগ্রে সে কথা বলিলে না কেন ?"

ভোগানন্দ নম্রভাবে উত্তর করিলেন, "লক্ষটাকার জন্য আপনার আজ্ঞার প্রতিবাদ করা, ভোগানন্দের পক্ষে দারুণ অভিসম্পাত !"

মহাপুলকবিস্ময়ে আত্মানন্দঠাকুর আত্মানন্দে পরিস্ফীত হইয়া প্রগাঢ় স্নেহে পুত্রকে প্রগাঢ় আলিঙ্গনপূর্ব্বক গদ্‌গদ বচনে বলিতে লাগিলেন, "ভোগানন্! আমার প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে!—শত শত,—সহস্র সহস্র,—লক্ষ লক্ষ,—কোটি কোটি প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে! এমন পুত্ররত্ন যাহার কোলে, তাহার আর প্রায়শ্চিত্তের বাকী কি ?—তাহার আবার পাপ-তাপের আশঙ্কাই বা কি ?—পাপীকে ভগবান কখনই এমন পুত্ররত্ন প্রদান করেন না। ভোগানন্! তুমি নবাববাড়ী যাও! আমার প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে।—আমি আজ্ঞা করিতেছি, তুমি এই পোষাকেই নবাববাড়ী যাও!"

পূজ্যপাদ পিতার নূতন আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া ভোগানন্দ

সেই পোষাকেই নবাববাড়ী চলিয়া গেলেন,—দ্বিতীয় দিবসেই নবাবের প্রতিশ্রুত লক্ষটাকা আনয়ন করিলেন। পিতাপুত্রের সাধুভাব কতদূর,—ধর্ম্মনিষ্ঠা কতদূর, পাঠকমহাশয় এই একটী দৃষ্টান্তেই বোধ হয় তাহা বুঝিতে পারিলেন।

আর একবার গয়াধামে এক রাজা আসিয়াছিলেন। তিনি একজন কার্‌বারী রাজা। তাঁহার সঙ্গে ভোগানন্দের কারবার সম্বন্ধীয় পত্রাপত্র চলে, পরস্পরের কখন দেখাসাক্ষাৎ নাই। রাজা গয়ায় আসিয়া ভোগানন্দকে আপন কারবারের অংশী করিবার অভিলাষ জানাইয়া চম্পানগরের ঠিকানায় এক পত্র লেখেন। সেই পত্রে গয়ায় আসিয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবারও নিমন্ত্রণ থাকে। ভোগানন্দ পূর্ব্বরাত্রে পিতার অনুমতি লইয়া পরদিন প্রত্যূষে গয়াযাত্রার নিমিত্ত অশ্বারোহণ করিতেছেন, এমন সময় কর্ত্তাঠাকুর আপন গৃহের গবাক্ষ হইতে ডাকিয়া কহিলেন, "ভোগানন্‌! প্রয়োজন আছে।"

অশ্বের বলগা ছাড়িয়া দিয়া ভোগানন্‌ ফিরিলেন।—পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। পিতা হয় ত পূর্ব্ব রাত্রের কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি কহিলেন, "ভোগানন্‌! আজ পূর্ণিমা। সপরিবারে ভাগীরথীস্নান করিতে হইবে। প্রথমপ্রহরেই যোগ।—শীঘ্র প্রস্তুত হও।"

ভোগানন্দ প্রস্তুত হইলেন। রাজার সহিত সাক্ষাৎ করা মনে মনেই রহিল। কিন্তু একটু যেন চিন্তাকুল। পুত্রকে একটুমাত্র বিষণ্ণ দেখিলেই পিতা তাঁহার সেই ভাবটী তৎক্ষণাৎ ধরিয়া ফেলিতেন। ধরিয়া ফেলিবার আরও বিশিষ্ট হেতু এই যে, কোন প্রকার গুরুতর চিন্তায় বিষণ্ণ উপস্থিত

না হইলে ভোগানন্দের প্রকৃতিসিদ্ধ প্রফুল্লবদন কদাচ অপ্রফুল্ল থাকিত না। বিষণ্ণ দর্শন করিয়া আত্মানন্দ ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভোগানন্দ! ভাগীরথীস্নানে সর্ব্বদা তোমার যেমন উল্লাস থাকে, আজ তোমার তেমন উল্লাসটী দেখিতেছি না কেন? বদন অপ্রসন্ন কেন?"

সূত্র পাইয়া পুত্র তখন মনের কথা প্রকাশ করিলেন। পূর্ব্বকথা স্মরণ করাইয়া দিলেন।

পিতা একটু বিচলিত হইয়া কহিলেন, "অহো! ও কথা আমার মনেই ছিল না! ভোগানন্দ! আচ্ছা! দু দিক্ রক্ষা কর। ডাকের অশ্বেরা সব দিক রক্ষা করিতে পটু। গঙ্গাস্নান করিয়া রাজদর্শনে যেও।"

গঙ্গাস্নান করিয়া গয়াধামে রাজদর্শনে যাইতে ভোগানন্দের অনেকটা বিলম্ব হইয়া যায়। রাজা সেদিন ভোগানন্দের জন্য অনেকক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া কাশীধামে যাত্রা করিয়াছিলেন। সাক্ষাৎ হয় নাই। যদিও ভবিষ্যতে পত্রের দ্বারা রাজার অভিলাষমত আসল কাজ হইয়াছিল, রাজকারবারে ভোগানন্দঠাকুর অর্দ্ধলাভের অংশী হইয়াছিলেন, কিন্তু সেদিন সাক্ষাৎ হইলে উভয় পক্ষেরই বেশী সুখের হইত। কেবল পিতৃ আজ্ঞার একান্ত বাধ্য হওয়াতেই ভোগানন্দ সেদিন ইচ্ছাপূর্ব্বক সে সুখে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। ৮০

অত্যন্ত পিতৃবাধ্য বলিয়া অনেক লোক ভোগানন্দকে অনেক ভৎর্সনা করিতেন। ভোগানন্দ তাঁহাতে হাস্য করিয়া উত্তর দিতেন, "ভক্তিপদার্থটী অত্যন্ত হওয়া দোষ নহে। যাহা দোষ নহে, তাহা পরিত্যাগ করিব না।"

পিতৃবৎসল ভোগানন্দ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া অবধি বাণিজ্যের অনুরোধে প্রায়ই বিদেশে বিদেশে থাকেন। এই কারণে তাঁহার নামটী দেশের মধ্যে বিখ্যাত হয় নাই। "ভোগানন্দের বাটী" বলিলে নিজ চম্পানগরের অনেক লোক তাহা ঠিক করিতে পারিত না। তাঁহার পিতার মহামহিম নামটীই সমস্ত মগধরাজ্য মধ্যে সুবিখ্যাত।

ভোগানন্দ এখন চম্পানগরের বাটীতে বাস করিতেছেন। একজন রাজার সহিত কারবারে সংযুক্ত হইয়া কারবারের উন্নতির গৌরবস্বরূপ ভোগানন্দ এখন রাজা উপাধি পাইয়াছেন। তাঁহার ধার্ম্মিক পিতা আত্মানন্দঠাকুর সানন্দ চিত্তে পুত্রের প্রতি সমস্ত বিষয়কর্ম্মের ভার সমর্পণ করিয়া, নিজে এখন কেবল জপতপ লইয়াই দিবারাত্রি যাপন করেন। আপন সৌভাগ্যের সহিত পুত্রের সৌভাগ্য সংযুক্ত হওয়াতে আত্মানন্দ এখন আনন্দিত হইয়া নিত্য নিত্য যোড়শোপচারে লক্ষ্মীপূজা করেন। ভোগানন্দের সন্তান হয় নাই। আত্মানন্দ-ঠাকুর একটী পৌত্রমুখ দেখিবার অভিলাষে নিত্য নিত্য সূর্য্য-দেবের উপাসনা করেন। ভোগানন্দের পুত্র হয় নাই। এই মাত্র অসুখ। এই অসুখটী ছাড়া সকল দিকেই সুখের সংসার। ভোগানন্দের মাতাপিতা বিদ্যমান।—ভোগানন্দের তিন বিবাহ। তিনটী পত্নীই এখন এই চম্পানগরের বাটীতে। বিবাদ নাই, কলহ নাই, রাগারাগি নাই, হিংসাদ্বেষ নাই, উচ্চ হাস্য নাই, সর্ব্বক্ষণ প্রফুল্ল!—সমস্ত সংসারটীই প্রফুল্লতা মাখা!—পবিত্র সুখের সংসার!—পরমসুখী পরিবার!—এমন সুখের ভিতরেও অন্তঃপুরের উদ্যানে একটী অসুখ। উদ্যানের

একটী কামিনী আর মাঝে মাঝে ভোগানন্দ নিজে, একটু একটু অসুখ মাখিয়া একটু একটু বিবর্ণ হন!

এই সময় সদাশিব মিশ্র চম্পানগরে আসিয়াছেন। ভোগানন্দের বাটীতেই অবস্থান, ইহা বুঝিবার অপেক্ষা নাই। ভোগানন্দ এতদিন কোথায় ছিলেন, প্রিয়বন্ধু সদাশিবের সহিত কথোপকথনে তাহা প্রকাশ পাইতেছে।

বিংশ কল্প।

আশ্চর্য্য রূপান্তর!

এই ভোগানন্দঠাকুর পাটনার সেই মহাশয় দ্বারকাদাস। পাটনাসহরে আত্মানন্দ ঠাকুরের প্রকাণ্ড কুঠী। ভোগানন্দ সেই কুঠীতে দ্বারকাদাস নামে বাস করিতেন। পূর্ব্বের একটা জনরব ছিল, পিতাপুত্রে বিচ্ছেদ। সে জনরবটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তাদৃশ পিতাপুত্রে বিচ্ছেদ হওয়া অনুভবশক্তিরও অগম্য। ভোগানন্দ ইচ্ছামত পাটনাসহরে বাস করিতেন, ইচ্ছা হইলে চম্পানগরে আসিতেন। পাটনাসহরে নামটীও যেমন ছদ্ম, নামমাত্র বিচ্ছেদবাক্যটীও তদ্রূপ ছদ্মবাক্য! ফলকথা, যিনি দ্বারকাদাস, তিনিই ভোগানন্দ ঠাকুর। এই ভোগানন্দের নবদ্বীপস্থ বন্ধু সদাশিব মিশ্রই পাটনাসহরে দ্বারকাদাসের বন্ধু

বঙ্গবাসী জটাধর। ভোগানন্দের তিন পত্নী। দ্বারকাদাস নামে ভোগানন্দ যে তিনটী পত্নীকে পাটনায় রাখিয়াছিলেন, সেই তিনটীই চম্পানগরের তিন পত্নী। এখন তিনটী মহিষী। প্রথমা ভবরঞ্জিকা, দ্বিতীয়া যোগমায়া, তৃতীয়া বনবালা।

বনবালা ইতিমধ্যে পত্নীরূপে পরিগৃহীতা হইল কিরূপে? পরিগৃহীতা হইল রাজমহিষীরূপে;—পরিগৃহীতা হইল সমাজের সংশয়ভঞ্জনে। ভোগানন্দঠাকুর বনবালার পূর্ব্বপুরুষের পরিচয় যতদূর জানিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহারা যে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ, সে বিষয়ে সংশয়ভঞ্জন হইয়াছে। বনমধ্যে হঠাৎ অভাবনীয়রূপে উভয়ের মনোমিলন, বিধাতার নির্ব্বন্ধ! বনবালাই হউক, অথবা সুরবালাই হউক, বিধাতার নির্ব্বন্ধ সূত্রে সকলেই বাঁধা। যাঁহাকে যেদিক হইতে আকর্ষণ করিবে, তাঁহাকে সেই দিকে সেই সঙ্গে মিলিত হইতে হইবেই হইবে। বিধাতার নির্ব্বন্ধেই বনবালা ইতিমধ্যে রাজমহিষী!

বনে থাকাই বনবালার কপালের ফল!—বনবালা জন্ম অবধি বনে থাকে।—গ্রামে আসিয়াও বনবাসিনী,—নগরে আসিয়াও বনবাসিনী!—শাস্ত্রানুসারে যিনি বনবালার পতি হন, তাঁহার ভবনেও বনবালা বনবাসিনী!—পাটনায় যখন যোগমায়াদেবী কাঙ্গালিনী বনবালাকে আশ্রয় দেন, তখনও বনবালা বনে ছিল।—উদ্যানরূপ নিকুঞ্জবনে একাকিনী মৌন-বতী বনবালা তপস্বিনী। এই চম্পানগরেও বনবালা তাই! এখানেও অন্তঃপুরের সংলগ্ন একটী প্রশস্ত উদ্যানমধ্যে বনবালা বাস করেন। পাটনায় যেমন ছিলেন, এখানে তাহা অপেক্ষা অনেক গৌরবে গৌরবিণী হইয়া বনবালা এখন রাজমহিষী

হইয়াছেন। রাজমহিষী হইয়াও বিষাদিনী বনবালা রাজপ্রাসাদে বাস করেন না। উদ্যানে বাস করেন। অন্তঃপুর হইতে বনবালার বিরাম-উদ্যানটী বড় বেশী দূর নয়,—নিতান্ত কমও নয়। যে ব্যক্তির কণ্ঠস্বর অতি উচ্চে অনেক দূর যায়, তেমন একজন বলবান্ পুরুষ সম্পূর্ণ উচ্চক্ষমতায় চীৎকার করিয়া ডাকিলে, বাগান হইতে বাড়ীর ভিতর আওয়াজ অইসে। অনেক লোক এক সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে গোলামাল করিলেও এখান হইতে সেখানে বেশ শুনা যায়। এতটা তফাৎ। বেশ সোজা রাস্তা।—খিড়্কীর পুষ্করিণীর দক্ষিণতীর দিয়া সরাসর পূর্ব্বমুখে সোজা রাস্তা। দুইধারে উচ্চউচ্চ প্রাচীর দিয়া ঘেরা। প্রাচীরের ধারে ধারে সারি সারি নানা জাতি সুন্দর সুন্দর বৃক্ষ।—উদ্যানটী দেখিতে সর্ব্বক্ষণ অতিরমণীয়। উদ্যানের যে বাটীতে বনবালা বাস করেন, সে বাটীখানি একতালা।—কিন্তু বেশ প্রশস্ত। সর্ব্বক্ষণ পরিশুষ্ক। একটী গৃহে বনবালা শয়ন করেন, একটী গৃহে দুটী দাসী থাকে, দুটী তিনটী গৃহ অন্যান্য কার্য্যে জোড়া থাকে। মধ্যস্থলের বড় ঘরটীতে কেহই থাকে না। চাবীও দেওয়া হয় না। সদর দরজায় চাবী পড়ে।

বনবালার এই রমণীয় ঘরকে এখনো কুটীর বলিলে ভাল শুনায়। বনবালা কুটীর হইতে যখন প্রাসাদে উঠিবে, তখন নাম হইবে, রাজরাণী বনবালার অট্টালিকা। এখন কুটীর নামটাই থাকা ভাল। বনবালার কুটীরের চারিধারে নানাজাতি তরু। তাহার অনেক শাখা অকালে কীটজীর্ণ হইয়া, আশ্রিত লতার সহিত শুষ্ক হইয়া রহিয়াছে। বনবালা তাহা দেখেন,—দেখিয়া দেখিয়া আপনাকে দেখেন। ঐ প্রকার শুষ্ক তৃণ, শুষ্ক লতা

নষ্ট করিতে দেন না। যদবধি বৃক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া না পড়ে, তদবধি স্থানভ্রষ্ট করিবার চেষ্টা করাও বনবালার ইচ্ছা ছিল না। মনোহর অট্টালিকার মনোহারিণী শোভা নষ্ট করিত, তথাপি বনবালা বলিতেন, থাক্।

বনবালার শয়নকক্ষটী নূতন প্রকারে সাজানো।—কম্বল মাত্র শয্যা।—কম্বলের উপাধান। একপাশে একটী স্ফটিক-নির্ম্মিত জলাধার।—সে জলে কি হয়, তাহা কেহ দেখে নাই। গৃহের দেয়ালে দুধারে দুখানি ছবি।—বনবালা শয়ন করিলে হঠাৎ যেদিকে চক্ষু পড়ে, ঠিক সেই দিকে চিহ্ন করিয়াই ছবি দুখানি বসানো হইয়াছে। ছবির একখানিতে মৃতপতি-ক্রোড়ে সাবিত্রী, দ্বিতীয়খানিতে অর্দ্ধবাসা একাকিনী বনমাঝে দময়ন্তী।—বনবালা এই ছবিদুখানি দেখেন।—কিছুই নূতন বুঝিতে পারেন না। বন দেখেন, স্ত্রীলোক দেখেন, মরণের প্রতিরূপ দেখেন, ইহা বনবালার চক্ষে নূতন বোধ হয় না। আরও দুইএক প্রকার নয়নরঞ্জন সামগ্রী গৃহমধ্যে রাখা হইয়াছে, বনবালার চক্ষু তাহাতেও আকৃষ্ট হয় না। বনবালার কুটীরের দ্বারে, গবাক্ষে, কাষ্ঠাসনে, কড়ীকাষ্ঠে, বরগায় এবং আর আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাষ্ঠপাত্রে একপ্রকার চমৎকার রং দেওয়া।—রঙের বাহার দেখিতেও যেমন চমৎকার, রঙের ভিতর হইতে তেম্নি একটী সুবাস আইসে চমৎকার!—কাষ্ঠের সৌরভে ঘরখানির চতুর্দ্দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত আমোদিত করিয়াছে। রংটী খুব ভাল! কিন্তু এক দোষ।—বিন্দুমাত্র অগ্নিস্পর্শ হইবামাত্রই দপ্ করিয়া প্রজ্জ্বলিত হয়! আগুনের বিষয়ে বনবালা ভারি সাবধান,—আগুনের কাছে বনবালার ভারি ভয়। সেই কারণে

তত প্রকার জ্বলনশীল পদার্থ থাকিতেও বনবালার ঘরে আগুনের উৎপাত হইতে পারে না। কেন এত জ্বলনশীল পদার্থ বনবালার ঘরে রাখা হইয়াছে, কাহারও নিকটে তাহারও কোন তত্ত্ব জানিতে পারা গেল না।

বনবালা সেই ঘরেই থাকেন।—সহচরী সঙ্গে করিয়া পাটনায় যেমন হপ্তায় হপ্তায়, পক্ষে পক্ষে, বনবালার হাওয়া বদলাইতে যাওয়া হইত, এখানে এখন তেমন শীঘ্র শীঘ্র হয় না। মাঝেমাঝে একটু বিলম্বেবিলম্বে হয়। হাওয়া বদল বন্ধ নাই। হাওয়া বদল বন্ধ হওয়া বনবালার পীড়ার কারণ হওয়া সম্ভব। হাওয়া বদল বন্ধ নাই।

পাটনা অপেক্ষা চম্পানগরে বনবালা বেশী গৌরবিণী কেন, তাহার বিবরণ আছে। ভোগানন্দঠাকুর অযোধ্যার বিজন কাননে শুধুমাত্র মালা বদল করিয়া বনবালাকে পত্নী বলিয়া জানিয়াছিলেন। সাধারণকে সেইটী জানাইয়া বনবালার সবিশেষ পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক ভোগানন্দঠাকুর পিতার অনুমতি ক্রমে, মাতার অনুমতিক্রমে, মহিষাহুটীর অনুমতিক্রমে, কুলাচারসম্মত যথারীতি পদ্ধতি অনুসারে বনবালাকে প্রকাশ্য-রূপে মন্ত্রপাঠ করিয়া পুনর্ব্বার বিবাহ করিয়াছেন। এখন আর বনবালা অজ্ঞাতকুলশীলা নহেন। কাজেই পাটনা অপেক্ষা বনবালাকে এখানে বেশী গৌরবিণী বলিতে হয়।

গৌরবে গৌরবেই গৌরবিণীর রাতদিন কাটিয়া যাইতেছে। যোগমায়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছেন, "রাজরাণী হইয়াছ, কতই ঐশ্বর্য্যের ঈশ্বরী হইয়াছ,—কতই সৎকার্য্য করিতে পারিবে,—কতই পুণ্যলাভ করিবে।"—যোগমায়া অনেকবার

এই সকল ভাল ভাল জ্ঞানকথা বুঝাইলেন বটে, কিন্তু বনবালা কতদূর বুঝিলেন, তাহা আমরা বুঝিলাম না।

দিন যাইতেছে।—ক্রমাগতই যাইতেছে। যায়, আবার আসে। যে দিনটী যায়, সে দিনটী আর আসে না। নূতন আসে। কিন্তু দেখায় যেন ঠিক সেই রকম। দিনের ফল সমান হয় না। একদিন ভাল,একদিন মন্দ। বেশী দিন ভাল, কম দিন মন্দ। কম দিন ভাল, বেশী দিন মন্দ। এই রকম কাণ্ডকেই দিনের ফল বলে। দিবারাত্রের মধ্যে অকস্মাৎ নিতান্ত মন্দঘটনা হইলে সাধারণে তাহাকে দিনের গ্রহ বলিয়া অনুতাপ করে। বনবালার দিনের গ্রহ উপস্থিত!

বিবাহ হইয়াছে, সুখ হইয়াছে, নিত্য নিত্য সকলের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয়, কোন প্রকার লুকাচুরী নাই। বনবালার কুলবালা ভাব। সর্ব্বদাই যেন আনন্দ,অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত বনবালার জাগ্রতানন্দ,অর্দ্ধরাত্রি নিদ্রা।—নিদ্রার সময় বনবালা একাকিনী। পার্শ্বগৃহে দুটী নিদ্রিতা দাসীমাত্র প্রহরিতা করে। কেহই আর বাগানবাটীতে শয়ন করে না। ফটকে দ্বারপাল।

পূর্ণিমারজনী।—অর্দ্ধরাত্রি অতীত করিয়া বনবালা শয়ন করিয়াছেন। দিবানিদ্রা নাই, সন্ধ্যানিদ্রা নাই, সুতরাং বেশী রাত্রে সকলের নিদ্রার একটু পরেই নিদ্রাদেবীর অনুগ্রহ হয়। বনবালা ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। দাসীরা শয়ন করিবার অনেক পরে বনবালার শয়ন হয়। সর্ব্বশেষে শয়ন করা বনবালার অভ্যাস। যখন বনে ছিলেন, তখনও তাহাই। মাসীমার কুটীরে অগ্রে ভেড়ারা শয়ন করিত, ছাগীরা শয়ন করিত, মাসীমা শয়ন করিতেন, তাহার পর বনবালার শয়ন হইত।

হরিণবাড়ীতেও ঐ রকম।—পাটনাতেও ঐ রকম!—এখানেও রকম। সর্ব্বত্রই সমান।

দাসীরা ঘুমাইয়াছে। বনবালা ঘুমাইয়াছেন। গাছে গাছে পাখীরাও ঘুমাইয়াছে। অন্দরমহলে রাজপরিবার নিদ্রাগত। রজনী প্রায় তৃতীয় প্রহরে উপনীত। জ্যোৎস্না ফিন্ ফুটিতেছে।—এই কৌমুদীময়ী নিশাকালে বনবালার দিনের গ্রহ ফলিল! বনবালার আগুনের ভয় বড়।—প্রতিদিন শয়ন করিবার সময় গৃহের দীপ নির্ব্বাণ করা বনবালার অভ্যাস। সে রাত্রে কোন চিন্তায় বোধ হয় অন্যমনস্ক ছিলেন, সেই জন্য অবশ্যকর্ত্তব্য নিত্যকর্ম্মটী ভুল হইয়াছিল। দীপনির্ব্বাণ করা হয় নাই। গৃহে একটী বিড়ালী থাকিত। নিশাকালে কোন প্রকার শিকার লক্ষ্য করিয়া বিড়ালী একবার সেই আলোর কাছে লম্ফ দেয়। আলোটী উল্টাইয়া পড়ে। নিকটে কতকগুলি আসন ও বসন সুসজ্জিত ছিল, দীপাধারসহ জ্বলন্ত দীপ তাহার উপরেই পতিত হয়।—এককালে নির্ব্বাণ হয় নাই, পড়িয়া পড়িয়া জ্বলিতে থাকে!

অগ্রেই কাপড়গুলি হুহু করিয়া ধরিয়া উঠে! তাহার পরেই উর্ণাসন, কাষ্ঠাসন, তৈজসাধার, ইত্যাদি আস্‌বাবপত্র প্রজ্বলিত হইতে আরম্ভ হয়! পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, বনবালার ঘরের সমস্ত দারুময় পদার্থই আশুদাহ্যপদার্থে আশ্চর্য্য প্রকারে রং করা। দেখিতে দেখিতে যেন ভেল্কী লাগিয়া গেল! হুহুশব্দে ছাতের কড়ীকাট পর্য্যন্ত জ্বলিয়া উঠিল! সমস্ত উদ্যান আলোময়!—জ্যোৎস্নার উপরেও রক্তবর্ণ আলো! শূন্যমার্গে স্তূপীকৃত ধূমরাশি।—মধ্যে মধ্যে গৃহমধ্যে

দগ্ধ পদার্থের চটাপট শব্দ!—সুগন্ধ দুর্গন্ধ একত্র মিশাইয়া আগুনের উত্তাপে গলাইয়া পবনদেব বহুদূর পর্য্যন্ত সেই মিশ্র-গন্ধ বহন করিতেছেন। এ ঘর, ও ঘর, সবঘর ধরিয়া গেল! চীৎকার করিবার লোক নাই! বনবালার বিছানা জ্বলিতেছে! আগুনের জ্বালায় বনবালার কাঁচাঘুম ছুটিয়া পলাইয়াছে! বনবালা তথাপি যেন নিশ্চেষ্ট হইয়া শুইয়া আছেন! বন-বালাকে আগুনভেল্কী লাগিয়াছে!—আর থাকিতে পারিলেন না!—দেহ যেন ঝল্‌সিয়া যাইতে লাগিল!—অগ্নি যেন মূর্ত্তিমান হইয়া গ্রাস করিতে আসিতে লাগিলেন! বনবালার চক্ষে জল পড়িল!—ভেল্কীর ঘোরেই শয্যা হইতে নীচে ঘুরিয়া পড়ি-লেন! আগুনভেল্কী ভয়ঙ্কর ভেল্কী!—কোন্ দিক দিয়া বাহির হইবার পথ, অত আলোর ভিতরেও বনবালা তাহা ঠিক করিতে পারিতেছেন না। ইতস্ততঃ চাহিয়া দেখিতেছেন, আগুনের ভিতর কোন্ দিকে যান!

প্রথমে আগুন ধরিয়াছিল ঘরের উত্তর ধারে।—ঘরের প্রবেশদ্বার দক্ষিণদিকে। বনবালা যখন নামিয়াছেন, তখন দ্বারদেশ পর্য্যন্ত প্রচণ্ড বহ্নির প্রচণ্ড জ্বালা বাড়ে নাই! ঝলসিত অঙ্গে অর্দ্ধউলঙ্গ বনবালা বুকে হাত দিয়া, গুঁড়ি মারিয়া, প্রজ্বলিত অনলকুণ্ড হইতে উদ্যানপ্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কয়েকবার খুব বড় বড় গোটাকতক নিশ্বাস পড়িল। বনবালা যেন আগুনের উত্তাপে জ্বলিতাঙ্গ হইয়া শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণে হাঁই ফাঁই করিতেছেন! তাঁহা নহে!—মহাশ্চর্য্য! বনবালা চীৎকার করিয়া উঠিলেন! সূক্ষ্ম মুখ দিয়া আগ্নেয়াস্ত্রের যেমন গম্ভীর শব্দ বিনির্গত হয়, বনবালাকণ্ঠে সেইরূপ গম্ভীর চীৎকার!

সেই চীৎকারে স্পষ্ট স্পষ্ট ধ্বনিত হইল, "যিনি বনবাসিনীর অসময়ের কাণ্ডারী, জীবনে যখন প্রয়োজন ছিল না, তখন যিনি জীবনরক্ষা করিয়াছিলেন, সেই জীবনের জীবন ভগবান আজ অভাগিনীর জীবনের আশা শেষ করিয়া দিলেন!"

চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গেই বনবালার অকস্মাৎ ভূতলে পতন! পতনমাত্রেই মূর্চ্ছা!

দাসীরাও এই সময় ঊর্দ্ধশ্বাসে চীৎকার করিতে করিতে প্রায় অর্দ্ধদগ্ধ অবস্থায় অন্য পথ দিয়া ছুটিয়া বাহির হইল। বলা হইয়াছে, বনবালার ঘরের বাহিরে চতুর্দ্দিকে প্রচুর পরিমিত শুষ্কশাখা ও শুষ্ক লতা সঞ্চিত আছে। সেগুলিও সর্ব্বভুকের ক্ষুদ্র ভক্ষ্যের মধ্যে পরিগৃহীত হইল! দেখিতে দেখিতে বাগানের তাদৃশ রমণীয় নিকেতনটী এককালেই প্রায় ভস্মরাশি! এককালেই প্রায় সমভূম!

মহলের লোকেরা এতক্ষণে জানিতে পারিলেন, বাগানে আগুন লাগিয়াছে!—বনবালা পুড়িয়া মরিল! স্বয়ং আত্মানন্দ ঠাকুর মহাব্যস্তসমস্ত হইয়া বাটীর লোকজন সঙ্গে করিয়া উদ্যানাভিমুখে দ্রুত ধাবিত হইলেন। হৈ হাই হা হুতাশ করিতে করিতে বাড়ীর অপরাপর পরিবারেরাও বিচঞ্চলপদে বাগানের দিকে ছুটিলেন। নারীকণ্ঠবিনির্গত সকরুণ চীৎকার শ্রবণে যোগমায়া দেবী ইতিপূর্ব্বে সর্ব্বাগ্রেই পতিকে জাগরিত করিয়া উদ্যানবাটিকায় ছুটিয়া গিয়াছেন। ভোগানন্দ এবং যোগমায়া সর্ব্বাগ্রেই উপস্থিত হইয়া দেখেন, বনবালা মূর্চ্ছিতা! নাসিকায় নিশ্বাস আছে দেখিয়াই অবধারণ করিলেন মূর্চ্ছিতা! নতুবা শরীরের দশা দেখিলে সহসাই অনুমান করিতে হইত, বনবালা মরা!

গৃহ ভস্মরাশি!—ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে যোগমায়াদেবী অন্য ধারে দেখিলেন, বনবালার কিঙ্করীরা মৃতবৎ পড়িয়া রহিয়াছে!—শুশ্রূষা করা আশু প্রয়োজন।—দেখিতে দেখিতে কর্ত্তার সঙ্গে সকলেই আসিয়া উদ্যানমধ্যে উপস্থিত। সকলের মুখেই হায় হায় শব্দ! যে যে উপায়ে অগ্নিদগ্ধ মানবদেহের জ্বালাযন্ত্রণা নিবারিত হয়, ভিন্ন ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে তাহার ব্যবস্থা দিতে লাগিলেন। বনবালাকে পাল্কী করিয়া অন্দরে লইয়া যাওয়া হইল। যোগমায়াদেবী কিঙ্করী দুটীকেও যত্নপূর্ব্বক লইয়া গেলেন। নানাপ্রকার সেবাশুশ্রূষা হইল। প্রভাতে একজন চিকিৎসক আহূত হইলেন। কিঙ্করীরা শীঘ্র শীঘ্র চৈতন্য পাইল। বনবালা তৃতীয় রজনীতে চৈতন্যপ্রাপ্ত হন। পূর্ণরূপে আরাম হইতে একপক্ষ অতীত হইয়া যায়!

বোবামেয়ে কথা কহিয়াছে!—কালামেয়ে শুনিতে পাইতেছে!—বড়ই আশ্চর্য্য!—শয্যাগত অবস্থায় বনবালা দেবী কাতরকণ্ঠে অনেক কথা কহিয়াছেন!—ভোগানন্দের কতই আনন্দ!—যোগমায়াও সেই আনন্দের অংশভাগিনী!

বনবালা আরাম হইলেন। বাক্‌শক্তি ফিরিয়া আসিয়াছে, শ্রবণশক্তি ফিরিয়া আসিয়াছে, বনবালা এখন যেন নূতন জগতের নূতন মেয়ে!—এক বিপদে দুটী ইন্দ্রিয় অবশ হইয়াছিল, ষোড়শবর্ষ পরে আর এক মহাবিপদে বিকলেন্দ্রিয়ের পুনর্জ্জীবন হইল!—বজ্রাঘাতে কালা,—বজ্রাঘাতে বোবা!—নিশাকালে গৃহদাহে দুই শক্তির পুনরাবির্ভাব!

একবিংশ কল্প।

কি করিয়া আসিলাম ?

মূকবালার মুখ ফুটিয়াছে!—বধিরা বালার কাণ ফুটিয়াছে! আর বড় ভাবনা নাই। অনেক কথা চাপা যাইতেছিল অনেক কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

বনবালার মুখ ফুটিল দেখিয়া সকল লোকের আনন্দ হইল, বনবালার আনন্দ হইল না। বনবালার মনে মনে জাগিতে- ছিল, তিন বৎসরের ভাইটী!—বজ্রাঘাতে মরা, ধূলামাখা, কাদামাখা, সেই তিন বৎসরের শিশুটী! সে দশা চক্ষে দেখিয়া বনবালা তখন ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে পারেন নাই, এখন ভ্রাতৃশোকে নিশ্বাস ফেলিয়া মর্ম্মভেদীস্বরে উচ্চারণ করিলেন, "ভাইরে! আঃ!—ষোল বৎসর দেখি নাই!—মা!"

সুবর্ণপিঞ্জরে বাস, সুবাসিত জলে স্নান, ক্ষীরখণ্ড ভোজন, বহুহস্তে সেবা; বনবিহঙ্গিনী এত সুখে থাকিলেও বনে তাহার মন টানে! ঐশ্চর্য্যপূর্ণ রাজভবন বনবিহঙ্গিনীর ভাল লাগে না! বনবালারও বনে মন টানিল! বনবাসিনী বনবালারও বনবাস মনে পড়িল।

বনবালার বনবাস মনে পড়িল। মাতাপিতা মনে পড়িল। মাসীমার মৃত্যুকথা মনে পড়িল। যাহারা যাহারা ভালবাসিত, সকলকেই যেন দেখিবার সাধ হইল। বনে মন টানিল!

বনবালার বনে মন টানিল! বনবালা কাঁদিলেন।—কাছে কেবল যোগমায়া। যোগমায়াটী দয়ামায়ার আধার!—রমণীকে যাঁহারা শান্তিদায়িনী বলেন, তাঁহারা রমণীর প্রকৃতি ভালরূপে আলোচনা করিয়াছেন। নারীজাতিকে যাঁহারা ভুজঙ্গিনী বলেন, যাঁহাদের অভিজ্ঞতায় স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী, তাঁহারা সোজাসুজি কথা কহিয়াছেন।—মোটামুটি কথায় নারীজাতির প্রকৃতির বিচার করা বড় একটা সহজ হয় না। পৃথিবীতে নারীজাতির বিদ্যমানতা আবশ্যক। জাতির মধ্যে রত্ন এবং কাচ উভয়ই পাওয়া যায়। সংসারসাগরে যাঁহারা রমণীরত্ন নামে অভিহিত, তাঁহারাই স্নেহময়ী,—তাঁহারাই দয়াময়ী। বঙ্গীয় একজন সজীব কবি গৌরব করিয়া বলিয়াছেন,:—

“পেমের প্রতিমা, স্নেহের আধার,
করুণাসাগর, দয়ার নদী
হতো মরুময় সব চরাচর,
না থাকিতে তুমি, জগতে যদি ॥’

যোগমায়াদেবী এই বাক্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ভবরঞ্জিকা এবং বনবালাও করুণাসাগর দয়ার নদী। বনবালার রোদনে যোগমায়ার অক্ষিযুগল অশ্রুপূর্ণ হইল। বসনাঞ্চলে বনবালার নয়নজল মুছাইয়া দিয়া যোগমায়া আপনিও সজললোচনে বলিতে লাগিলেন, “বনবালা! তুমি কথা কহিতে পারিতে না, তাহা দেখিয়া আমার বড়ই কষ্ট হইত। এখন তুমি কথা কহিতে পারিয়াছ, সকলেই আনন্দিত,—সকলেই মহা আমোদিত।

সকলেই সুখী। এমন মঙ্গলের সময় চক্ষের জল ফেলিয়া কেন ভাই অমঙ্গল কর? যাহা হইবার, তাহা ত হইয়াছে! সংসারে বিপদসম্পদ, দুটীমাত্র বাক্য; কিন্তু সংসারী লোকেরা সকলেই জানেন, সংসারে সম্পদ অপেক্ষা বিপদের সংখ্যাই বেশী। কপালে ছিল, বিপদ ঘটিয়া গিয়াছে! বিপদ হয়, বিপদ থাকে না! তোমার বিপদ ঘটিয়াছিল,—কপালক্রমেই ঘটিয়াছিল। এখন ত অনুতাপে কোন ফল নাই?—তবে কেন পদ্মনেত্রে অশ্রুবিসর্জ্জন? আচ্ছা বনবালা! তুমি কপাল মানো?"

লোকে একদিন এক সময়ে কখনো কখনো রৌদ্রবৃষ্টি, উভয়ই দর্শন করে। ঘোর জলদজালাচ্ছন্ন অন্ধকার গগনে বিদ্যুৎ চমকে, ইহাও সকলে দেখেন। ক্ষণে ক্ষণে বেশ আলো হয়! কিন্তু কান্নার সঙ্গে হাসি, এটী অতি অল্পই দেখা যায়। বনবালা কাঁদিতেছিলেন, যোগমায়া দেবী যেমন জিজ্ঞাসিলেন, তুমি কপাল মানো?—অমনি বনবালার ওষ্ঠপ্রান্তে ঈষৎ হাস্যরেখা দেখা দিল। ওদিকে ঝর্ঝর করিয়া দুই চক্ষে জল!

ভাগ্যে তখন সেখানে আর কেহ ছিল না,—একামাত্র যোগমায়া, তাহাতেই লজ্জারক্ষা; নতুবা আর কেহ সেখানে থাকিলে, আর কিছুই হইত না,—শক্ত ঘটনা কিছুই দাঁড়াইত না,—বনবালা বড় লজ্জা পাইতেন।

কেন?—দুঃখের কথা মনে পড়িলে সকল লোকেই কাঁদে। স্ত্রীলোকের ক্রন্দন আরো বরং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়। বনবালার দুঃখের কথা মনে পড়িয়াছে, বনবালা কাঁদিয়াছেন, অপরে দেখিলে লজ্জা পাইতে হইত কেন?

দুটী কারণ।—প্রথম কারণ, ঐ মৃদু হাসি।—রোদনের

সহিত হাসি মিশিলে অপরিচিত চতুর লোকেরা সেই রোদনকে কৃত্রিম রোদন মনে করিতে পারে। হাসিটুকুকে কৃত্রিম মনে করে না। বনবালা অন্তরের দুঃখে কাঁদিয়াছেন,—এই অন্তরের দুঃখের সহিত এই বাড়ীর নবীন রাজাটীর বিলক্ষণ সংস্রব। নবীন রাজার পরিচয় যদি আবার নূতন করিয়া দেওয়া আবশ্যক হইয়া উঠে, তাহা হইলে যাঁহাদের কাছে আবশ্যক, তাঁহারা বুঝিবেন, এই আখ্যায়িকার নবীন রাজাই এই আখ্যায়িকার প্রধান নায়ক শ্রীমান্ ভোগানন্দঠাকুর।

যোগমায়া কাঁদিলেন।—কাঁদিতে কাঁদিতে অশ্রুমুখী বনবালার প্রবল অশ্রু পুনঃ পুন মার্জ্জন করিয়া দিলেন। যিনি কাঁদেন, তিনি ত কাঁদেন।—যিনি প্রবোধ দেন, তিনিও কাঁদেন! সংসারের স্নেহের নয়নে,—দয়ার নয়নে, এই এক অপূর্ব্ব রঙ্গ! কাঁদিতে কাঁদিতে উভয়েই প্রবোধ পাইলেন,—উভয়েই শান্ত হইলেন। শীঘ্র আর প্রমোদিত হাস্য আসিল না, কিন্তু উভয়ে অনেকপ্রকার নূতন নূতন গল্প হইল।

গল্পের পর অনেকক্ষণ উভয়েই প্রায় নিস্তব্ধ। অনেকক্ষণ বনবালার নয়নপানে চাহিয়া চাহিয়া যোগমায়া কহিলেন, সতি! পৃথিবীতে তোমার অনন্ত খ্যাতি থাকিবে! কি আশ্চর্য্য! স্ত্রীলোক!—অবলা!—হিন্দুকুলস্ত্রীলোক!—অন্তঃপুরবাসিনী! কুলবালা!—তাহার উপর আবার বোবা!—তাহার উপর আবার কালা!—কাঙ্গালিনী!—উঃ! বনবালা! তুমিই একালে সংসারে সাধ্বী সতীর আদর্শ!—বনবালা! নিরুদ্দিষ্ট পতির অন্বেষণে তুমি এত স্বষ্টি করিয়াছ!—এত দেশ ভ্রমণ করিয়াছ!—একাকিনী কাঙ্গালিনী হইয়া তোমার হারানিধিকে তুমি অত করিয়া

খুঁজিয়া বেড়াইয়াছ!—ধন্য বনবালা!—ধন্য তুমি!—আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!!—আশ্চর্য্য!!! -ধন্য বোবামেয়ে!—ধন্য সতী! উঃ! বনবালা!—ধন্য তোমার সাহস!—ধন্য তোমার ক্ষমতা! ধন্য তোমার পতিভক্তি! বনবালা! এখন এই পাপের সংসারে· তুমিই যথার্থ আদর্শ সতী!”

বনবালা লজ্জা পাইলেন। ক্রমে ক্রমে পদ্মমুখখানি নত করিতে করিতে যোগমায়ার মুখে প্রশংসাকাহিনী শ্রবণ করিতে-ছিলেন, “আদর্শ সতী” উচ্চারিত হইবামাত্রই মুখখানি প্রায় বক্ষ পর্য্যন্ত অবনত হইয়া এক অপূর্ব্ব ভাব ধারণ করিল। সমুজ্জ্বল নয়নদুটী বিমুদ্রিত হইল।—ঠিক যেন সন্ধ্যাকালে কমলিনী মুদিল। আশ্চর্য্য!

আরও আশ্চর্য্য!—এতবড় লজ্জার সময় ভোগানন্দ আসিয়া উপস্থিত!—পশ্চাতে হাস্যমুখী ভবরঞ্জিকা!—তাঁহার পশ্চাতে প্রিয়বন্ধু সদাশিব। ওরফে জটাধর।

এ দৃশ্য যে কি অপরূপ দৃশ্য, তাহা ভাবুক লোকেরা চক্ষু বুজিয়া বুঝিবেন। যাঁহারা একত্রে এক চিত্রপটে পাঁচসাতটী সুন্দর সুন্দর যুবকযুবতীর ছবি দেখিয়াছেন, তাঁহারা মনে করুন, চম্পানগরে শ্রীমতী রাণী যোগমায়াদেবীর শয়নকক্ষে ঠিক যেন এই পঞ্চচিত্রমিলিত সেই রকম একখানি সজীব ছবি! যোগমায়ার শয়নকক্ষে কেন বলা হইল, তাহার কারণ, যোগমায়ার শয়নকক্ষেই বনবালা এতক্ষণ কাঁদিতেছিলেন!

অভাবনীয় সম্মিলনে কৌতুকবতী হইয়া যোগমায়াদেবী সহাস্যবদনে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অভ্যাগতগণের যথারীতি অভ্য-র্থনা করিলেন। বনবালাও উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু পূর্ব্ববৎ

নতমুখেই!—পরিতাপিনী বনবালার নতমুখে এখন আধখানিও বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

সদাশিব হাস্য করিয়া কহিলেন, "এই বোবা রাণীটা আজিও না কি বোবা আছেন?"

নতমুখেই বনবালা একটু হাস্য করিলেন। সে হাসিটুকু বদনে বদনে,—ওষ্ঠে ওষ্ঠেই মিলাইয়া গেল; কেহই দেখিতে পাইলেন না! দেখিলেও বনবালার লজ্জা হইত না।—বনবালার মনস্থির নাই। সকলেই উপবেশন করিলেন।

ভবরঞ্জিকাকে সম্বোধনপূর্ব্বক যোগমায়া দেবী কহিলেন, "ভেল্‌কী দিদি!"

মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাস্য করিয়া ভবরঞ্জিকা কহিলেন, "ভেল্‌কী দেখিতেই ত আসিয়াছি!"

গম্ভীরবদনে যোগমায়া কহিলেন, "বেশ করিয়াছ!—এই সময় আসাই ত ভাল হইয়াছে! বনবালা একাই আমাদের এক সহস্র!—বনবালা এখানে একাকিনীই যেন সভা করিয়া বসিয়াছেন!"—পতির পানে কটাক্ষপাত করিয়া বুদ্ধিমতী পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, "সভাপতি না থাকিলে সভা মানায় না! সভাপতির আগমন হইয়াছে, আপনারাও সকলে পদার্পণ করিয়াছেন, এখন মানাইল বনবালার সভা!—বনবালা বড় ভয়ানক কথা বলিতেছেন!—উঃ!—আদর্শ সতী!"

বিস্ময়ান্বিত হইয়া ভোগানন্দ সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ভয়ানক যোগেশ্বরী?"

যোগমায়া উত্তর দিলেন, "পতি অন্বেষণ।"

ভোগানন্দ আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করিলেন না।—উন্নত বদন

একটু যেন অবনত হইল।—ভবরঞ্জিকা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন, "ভয়ানক পতি অন্বেষণ কিপ্রকার?"

পূর্ব্ববৎ গম্ভীরভাবে যোগমায়া উত্তর দিলেন, "পতি অন্বেষণ ভয়ানক নয়, শুধু অন্বেষণ ভয়ানক!—হারাপতির অন্বেষণে সতীর প্রাণে যত প্রকার উৎকট উৎকট আঘাত লাগিয়াছে, যতই আগুন জ্বলিয়াছে, তাহাই ভয়ানক!"

ভবরঞ্জিকা পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিলেন, "কিপ্রকার?"

"প্রকার?"—বিস্মিতবদনে যোগমায়াদেবী পুনরুক্তি করিলেন, "প্রকার?—শোন তবে। প্রকারটাই ভয়ানক! আমি বনবালাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, অযোধ্যাবাসিনী তুমি,—মগধ-বাসিনী আমরা, তুমি এখানে কি করিয়া আসিলে?—আমার প্রশ্নে প্রথমে ঠিক উত্তর না দিয়া বনবালা যেন আপনা আপনিই প্রশ্ন তুলিলেন, "কি করিয়া আসিলাম?"

সদাশিব ভাবিয়া কহিলেন, "তোমার প্রশ্নটী ঠিক বটে।" ভবরঞ্জিকা কহিলেন, "ও ঠিক আমি বুঝি না।—বনবালা বলিয়াছেন, "কি করিয়া আসিলাম?"—সেই প্রশ্নের উত্তর চাই।"

প্রসন্নবদনে মৃদু হাস্য আনয়ন করিয়া যোগমায়া কহিলেন, "চাই ত তাই! আমিও ত সেই উত্তর চাহিয়াছিলাম!—আমার প্রশ্নের উত্তর পাইয়াছি।—বনবালার নিজের প্রশ্নেরও উত্তর পাইয়াছি।—বনবালার প্রশ্নের উত্তর বনবালাই দিয়াছেন।"

দ্বাবিংশ কল্প।

—০—

পতি অন্বেষণ।

যোগমায়াদেবী বনবালাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কি করিয়া আসিলে?"—বনবালাদেবী আপনা আপনি উচ্চারণ করিয়াছিলেন, "কি করিয়া আসিলাম?"—এই প্রশ্নের উত্তর শ্রবণের নিমিত্ত সকলেই কৌতূহলী হইলেন। যোগমায়ার মুখ দিয়া বনবালার মুখের উত্তর প্রকাশ হইতে লাগিল।

যোগমায়া আরম্ভ করিলেন, "সভাপতিকেই বেশী মনোযোগ দিতে হইবে। আপনারা আমারে ক্ষমা করিবেন, বনবালার ভয়ঙ্কর ভ্রমণবিবরণে আমাদের এই অর্চ্চনীয় সভাপতির প্রতি অগত্যা আমারে একটু একটু তীক্ষ্ণ হইতে হইবে। বনবালা বলিলেন, আমাদের—"

এইস্থলে সচকিতে আপনা আপনি থামিয়া যোগমায়াদেবী সদাশিবকে সম্বোধনপূর্ব্বক বিনম্রস্বরে কহিলেন, "পিতা! দায় পড়িলে বিধি খাটে না।—আপনিও আমারে ক্ষমা করিবেন। বনবালার ভ্রমণবিবরণে যাহা যাহা শুনিলাম, তাহাতে,—(বলিতে বলিতে পতির প্রতি কুটাক্ষপাত হইতেছে!)—সতী আমরা, পতিনিন্দা করিতে নাই,—পতিনিন্দা মহাপাপ,—সব জানি, কিন্তু বনবালার ভ্রমণ-বিবরণে যাহা যাহা শুনিলাম, তাহাতে কিন্তু আমি

সব জায়গায়,—বনবালার সেই সব দারুণ কথা বলিবার সময়, আমি হয় ত পতিনিন্দাকে মহাপাপ বলিয়া স্মরণ রাখিতে পারিব না।—স্মরণ রাখিবার চেষ্টা করিলেও স্মরণ রাখিতে সমর্থ হইব বোধ হয় না! ক্ষমা করিবেন!”

সদাশিবের কাছে এইরূপ ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া যোগমায়াদেবী পুনর্ব্বার আরম্ভ করিলেন, “শ্রবণ করুন। বনবালা বলিলেন, আমাদের এই প্রেমাস্পদ পতি দৈবাৎ একদিন অযোধ্যার এক বনমধ্যে এক সরসীকূলে উপস্থিত হন।—বনবালা সেই বনে ছাগল চরাইতেন। ইনি যখন যান, বনবালা তখন সেইখানেই ছিলেন। দুজনে দেখা হয়।—সেই দিন থেকে দিন দিন দেখা হয়,—দুটীতে বেশ ভাব হয়।—একমাসের পর মালাবদল করিয়া বিবাহটাও হয়! (মাঝে মাঝে পতির প্রতি কটাক্ষপাত চলিতেছে!) বিবাহের পর একমাস থাকাও হয়! তাহার পরেই চম্পট!—একেবারেই যেন চিরদিনের মত চম্পট!

“এইবার অবধি আমি আমার পরমারাধ্য পতিদেবতাকে নিষ্ঠুর বিশেষণে ব্যাখ্যা করিয়া যাইব। বনবালার ভ্রমণকাহিনীর পর আর কখনো ঐ নামে ঐ বিশেষণ বসাইয়া ও চরণে অপরাধিনী হইব না!—কপালের দোষে যদি হইতে হয়, সে হওয়াও এইরূপ ঘটনায় হইবে, নচেৎ নহে।”—আবার এইটুকু ভূমিকা করিয়া যোগমায়াদেবী বনবালার দুঃখের কাহিনী এই ভাবে বলিতে লাগিলেন, “বনবালার গর্ভ হইল!—বনবালার কলঙ্ক রটিল! নিকটবর্ত্তী গ্রামের লোকেরা বনবালাকে ভালবাসিত, কলঙ্ক তুলিয়া দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিল! বনের মাঝে যখন আমাদের এই নিষ্ঠুর এই বনবালাকে চুপি চুপি বিবাহ

করেন, তখন বনবালার বয়স প্রায় সপ্তদশ বর্ষ। নবমবর্ষাবধি সপ্তদশ বর্ষ পর্য্যন্ত বনবালা ইহাঁর একটী মাসীমার কুটীরেই প্রতিপালিত হন। সেই মাসীমাটী মরিলেন!—কতই বিপদ গেল!—আমাদের এই নিষ্ঠুর আর একটীবারও তত্ত্ব লইলেন না! কাকমুখেও বার্ত্তা আনাইলেন না!—(মাঝে মাঝে পতির প্রতি কটাক্ষপাত হইতেছে!) বনবালা অনাথা হইয়া পতির অন্বেষণে দেশদেশান্তরে বাহির হইলেন!"

ভোগানন্দ এতক্ষণ স্থির হইয়া যোগমায়ার সমস্ত কথাগুলি আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিতেছিলেন। কেন না, বনের ওসব কথা তাঁহার জানা কথা। যখন শুনিলেন, "বনবালা অনাথা হইয়া পতি অন্বেষণে দেশদেশান্তরে বাহির হইলেন" তখন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। মুখখানি ইত্যগ্রে অবনত হইতেছিল, পূর্ণমাত্রায় মুখ তুলিয়া, বিস্ফারিত নয়নে অত্যন্ত ব্যস্তভাবে যোগমায়ার মুখের দিকে চাহিলেন। যোগমায়া ঈষৎ হাসিয়া অন্যদিকে চক্ষু ফিরাইলেন। গোঁড়া ধরিয়া বলিতে লাগিলেন, "বনবালা অনাথা হইয়া পতি অন্বেষণে দেশদেশান্তরে বাহির হইলেন!—পতি আমাদের এই নিষ্ঠুর! অযোধ্যা হইতে বঙ্গদেশ, ইহার মধ্যে কতস্থানে কতপ্রকার ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর বিপদ ঘটিয়াছে, তাহা শুনিলে ঘরে বসিয়াও ভয় হয়! শুনিবার সময় আমি ত পলকে পলকে শিহরিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছি! পদে পদেই প্রায় সর্ব্বশরীরে কাঁটা দিয়াছে! আমাদের এই নিষ্ঠুর,—আজ আর নয়,—আমাদের এই নিষ্ঠুরকে আর একদিন আমি সেই সব ভয়ঙ্কর কাহিনী সবিস্তারে শুনাইব! (এইবার আবার পতির প্রতি নবীন কটাক্ষ!)

অযোধ্যা হইতে বঙ্গদেশ। কত স্থান, কত নগর, কত গ্রাম, কত বন, অতিক্রম করিয়া অযোধ্যা হইতে বঙ্গদেশে আসিতে হয়, মহাজন রাজার বাটীতে যোগমায়া তাহার আর কি পরিচয় দিবেন ?— বনবালা যাহা বলিয়াছেন, তাহাও বলিবার দরকার নাই। কত স্থানে দস্যুতে ধরিয়াছে, জুয়াচোরে ঠকাইয়াছে, গরিব দেখিয়া গৃহস্থেরাও তাড়াইয়াছে, এক এক স্থানে দুরন্ত লম্পটেরাও পাছু লইয়াছে, আমাদের এই লম্প—না না, আমাদের এই নিষ্ঠুর ইহার কিছুই সন্ধান রাখেন না! এক এক স্থলে পাগল বলিয়া, পালে পালে ছেলে জুটিয়া, গায়ে ধূলা দিয়াছে, করতালি দিয়াছে, কতপ্রকার অপমান করিয়াছে! আমাদের এই নিষ্ঠুর তাহার কিছুই সংবাদ রাখেন না! বনবালার যৎকিঞ্চিৎ সঙ্কিত অর্থ ছিল। একবার এক সহরে বাসা দিবে বলিয়া এক জুয়াচোর এই বনবালাকে পাল্কী করিয়া একখানা খালিবাড়ীতে লইয়া যায়। বনবালার কক্ষে একটী কাপড়ের পুঁটুলী ছিল। পাল্কী হইতে নামিবার সময় "দাও মা! কষ্ট হবে, আমাকে দাও, আমিই লইয়া যাই!" বলিয়া সেই জুয়াচোরটা সেই পুঁটুলীটী হস্তগত করে। খালিবাড়ীর একটা খালিঘরে বনবালাকে বসাইয়া, "জলখাবার আনি" এই ছল করিয়া, জুয়াচোরটা তথা হইতে সরিয়া পড়িল! বনবালার সর্ব্বস্ব গেল! বোবামেয়ে! চাহিতেও পারিলেন না, লোকটা তাহা দিয়াও গেল না! বনবালা তখন কি করেন, ঘরের ভিতর চুপ্ টী করিয়া বসিয়া রহিলেন।

পুঁটুলীটী গেল।—সেই সর্ব্বনেশে বাড়ীতে বনবালা যখন পৌঁছিয়াছিলেন, আকাশে তখন বেলা প্রায় দুইপ্রহর।

একপ্রহর গেল, দুইপ্রহর গেল, তিনপ্রহর গেল, জুয়াচোর আর ফিরিল না! রাত্রি হইয়া পড়িল। বনবালা তখন আর যান কোথা? ক্ষুধাতৃষ্ণা আছে, ফুটিবার শক্তি নাই!—ফুটিলেই বা হয় কি? উপায় কি? বিদেশ! নিঃসম্বল!—শূন্যগৃহ!—উপায় কি? ক্ষুধাতৃষ্ণা দিবারাত্রি গায়ের উপর দিয়া গেল!—পুঁটুলীটীও গেল! জুয়াচোরটা আর ফিরিল না!—ফিরিবে কেন?—যাহা মৎলব, তাহা সিদ্ধ হইল! আর কি? মৎলব সিদ্ধির জন্যই ঐরকম জুয়াচোরেরা অগ্রে কিছু কিছু টোপ ফেলে,—লোভ দেখায়, বিশ্বাস জন্মায়!—বনবালার পাল্কীভাড়া পাঁচ আনা সেই জুয়াচোরটা নিজে হইতেই দিয়াছিল! আর ফিরিবে কেন? আমাদের এই নিষ্ঠুর এই বনবালাকে বিবাহ করিয়া যেমন এই বনবালার কাছে আর ফিরিলেন না, সেই পাষণ্ড জুয়াচোরটাও তেমনি বনবালার পুঁটুলী চুরী করিয়া লইয়া প্রস্থান করিল, আর ফিরিল না!

ভোগানন্দঠাকুর ক্রমশই ম্রিয়মাণ হইতেছেন। তিনি আর কোন দিকেই ভাল করিয়া চাহিতেছেন না।—বনবালার দিকে ত একটীবারও চাহিতেই পারিতেছেন না। তাঁহার শরীর অবসন্ন হইতেছে। মাথাটী হেঁট করিয়া বসিয়া আছেন। শেষ পর্য্যন্ত শুনিতে হইবে, সে কৌতূহল জন্মিয়াছে। বনবালাকে পাইয়াছেন, বনবালা নিকটেই আছেন, সেই জন্যই কৌতূহল জন্মিয়াছে। বনবালা নিকটে না থাকিলে সে কৌতূহল জন্মিত না। সম্পদের সময় সকলে মুখামুখী বসিয়া অতীত বিপদের গল্প করিলে নূতন শ্রোতার পক্ষে যেপ্রকার কষ্টকর হয়, বনবালাকে পাওয়া না গেলে ভোগানন্দ যদি বনবালার

ঐপ্রকার অতীত বিপদের গল্প শুনিতেন, তাহা হইলে তাঁহার তদপেক্ষা সহস্রগুণ বেশী কষ্ট হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু যোগমায়া তাঁহাকে একটু ভাল রকম শ্লেষ করিয়া আবার বলিতে লাগিলেনঃ—

"রজনীপ্রভাতে বনবালা সেই খালিবাড়ী হইতে রাস্তায় বাহির হইলেন! বনবালা সেদিন একবসনা!—বিদেশে নিঃসম্বল ভিকারিণী! পথের ভিকারিণী!—দোকানদারেরা ভিক্ষা দিল না, গৃহস্থেরা আশ্রয় দিল না, মুষ্টিভিক্ষায় বনবালার ক্ষুন্নিবৃত্তি হইল! ভিক্ষার চাউল, ছোলা, যব, ইত্যাদি শুষ্ক চর্ব্বণ করিয়া বনবালা খাইয়াছিলেন! এই নিষ্ঠুর একথাগুলি এখন উপকথার ন্যায় শ্রবণ করিতেছেন! (এবারেও পতির প্রতি কুটিল কটাক্ষ!) সে সহরে সকল লোকে ভিক্ষা দেয় না। হিন্দুরাই বেশী ভিক্ষা দেয়। সে সহরে হিন্দুর বাস কম। বনবালা ভিক্ষা পাইলেন না!—উপবাস করিলেন!—সাতদিন উপবাস করিয়াছিলেন! আমাদের এই নিষ্ঠুরের একটী বিবাহিতা পত্নী অনাথিনী অবস্থায় সাতদিনের উপবাসিনী!"

সদাশিব মধ্যবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, "কেন আর লজ্জা দাও?—বিধাতার ইচ্ছাতেই সংসারে সমস্ত ঘটনা ঘটে। বনবালার অদৃষ্টে যখন যাহা ঘটিবার, তাহা অবশ্যই ঘটিবে, অবশ্যই ঘটিয়াছে! বনবালা এখন যেমন রাজরাণী হইয়াছেন, তখন যদি ইহাই থাকিতেন, তবুও বনবালার ভাগ্যে ঐ সকল কষ্ট ঘটিত! সুখের সময় আর সে সকল গতকথার আন্দোলন কেন?—বৃথা কেন আপনার লোককে অসুখী কর?"

যোগমায়া কহিলেন, "আমি আপনার অবাধ্য হইব।

বনবালার দুঃখের কথা বলিতে আপনি আমারে নিষেধ করিবেন না। পতিকে মনের কষ্টের কথা নিবেদন করাই ইহসংসারে সতীনারীর ধর্ম্ম।—দুঃখিনী বনবালার দুঃখের কাহিনী অবশ্যই আমি বনবালার প্রিয়পতিকে শুনাইব। (পতির প্রতি কটাক্ষ-পাত!) বেশী কথা বলিব না,—যেখানে যেখানে মহাসঙ্কট, সেই সেই কথাই আমি বলিতাম; কিন্তু আজ আর সময় হইবে না। আর একদিন বলিব। আজ কেবল বনবালার আর একটী মহাবিপদ আপনারা স্থির হইয়া শ্রবণ করুন।"

যোগমায়া বলিতে লাগিলেন, "সহরেই ভারি গোল! বনবালা বলিলেন, আর একবার আর এক সহরে আর এক প্রকার মহাবিপদ উপস্থিত হইয়াছিল! সহরেই যত হুজুগ,—সহরেই যত বিপদ,—সহরেই যত গোল! বনবালা বলিলেন, এ বিপদটা পূর্ব্ব বিপদ অপেক্ষা অনেক বড়!—সত্যই তাই! বনবালা একদিন সেই সহরে উপস্থিত হন। এ ঘটনাটা জুয়াচোরে টাকা লইবার অনেক দিন পরে হয়। বনবালা তখন একবস্ত্রা. ভিকারিণী!—সহরে যখন উপস্থিত হন, তখন চাকৃচিকৃনী বেলা আছে। পৌছিলেন ত সহরে, কিন্তু যান কোথা?—খান কি? থাকেন কোথা? ঘোর রাত্রিকাল সম্মুখে।—হয় কি? বোবামেয়ে!—কাহাকেও কিছু বলিতে পারেন না! এখন এ বিপদে ব্যবস্থা করে কে?"

"ব্যবস্থাটী বনবালা আপনা হইতেই করিয়া লইলেন। সহরের যেদিকে বাঙ্গালীবাবুদের বাস, ঘটনাক্রমে বনবালা সেই দিকেই প্রবেশ করিয়াছিলেন। একঘর বড়মানুষের বাড়ীর বাহিরের খোলা বারাণ্ডায় তখন একটীও লোক ছিল না।

সময় গোধূলি,—বনবালা সেই গোধূলিসময়ে সেই বড়রাস্তার উপরের খোলা বারাণ্ডায় ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িলেন। অত্যন্ত পিপাসা! গ্রাম্যপথে বরং মাঝে মাঝে নিকট নিকট কূপ, সরোবর, নদী প্রভৃতি জলাশয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সহরে প্রবেশ করিয়া অবধি বনবালা একটীও সরোবর দেখিতে পান নাই!'

"অত্যন্ত পিপাসা, কিন্তু জল নাই!—প্রায় সমস্ত দিন বনবালার জলপান করা হয় নাই! ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অত্যন্ত অবসন্ন! বনবালা সেই রাস্তার ধারের অপরিষ্কার বারাণ্ডায় শুইয়া পড়িলেন! কেহই নিকটে আসিল না, কেহই কিছু জিজ্ঞাসা করিল না। রাত্রি প্রায় একপ্রহর হয় হয়, এমন সময় দুটী ইয়ারগোছের যুবাপুরুষ সেই স্থান দিয়া যায়। সম্মুখ দিয়াই রাস্তা, রাস্তার ধারেই বনবালা। আকাশে চন্দ্র ছিলেন, বনবালাকে দেখিবার ব্যাঘাত হইল না। পথিকেরা বনবালার রূপ দেখিয়া মোহিত হয়। ছিন্নভিন্ন মলিন বসন হইলেও মুখ দেখিয়া পাগল হয়! দুরাচারেরা সেখানে সে রাত্রে বনবালার বিস্তর অপমান করিয়াছিল। শেষকালে কোতোয়ালীর লোক আসিয়া দুরাত্মাদের হস্ত হইতে বনবালাকে রক্ষা করে।

"রক্ষা করে বটে, কিন্তু কোতোয়ালীর লোক বড় চমৎকার জিনিস! সম্বন্ধ করিতে গিয়া বিবাহ করা ঐ দলের অনেক লোকের অভ্যাস! বনবালাকে যাহারা লম্পটের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিল, তাহারাই তখন আবার শত্রু হইয়া দাঁড়াইল! বনবালা বোবা!—কোতোয়ালীর লোকেরা ত এ তত্ত্ব জানে না। তাহারা ঝড়াঝড় ধমক ঝাড়িয়াছে,—ঠাঁইঠিকানার দাবী করিয়াছে, কোথাকার মানুষ, কোথায় যাবি, ইত্যাকার হুঁসিয়ারি

অনুসন্ধানে কতই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছে, উত্তর পায় নাই। চটিয়া গিয়াছে!—"বদ্‌মাস্ মেয়েমানুষ" বলিয়া ধরিয়া ফেলিয়াছে! বনবালার চীৎকার নাই।—বনবালা চীৎকার করিতে জানেন না। গ্রেপ্তারকর্ত্তারা তাহা জানে না। তাহারা ভাবিল, যখন চুপ্‌টী করিয়া বে-পরোয়া কোতোয়ালীতে যাইতে প্রস্তুত, তখন নিশ্চয়ই বদ্‌মাস্! সত্যই তাহারা বনবালাকে কোতোয়ালীতে লইয়া গিয়াছিল! সেখানে পলাতকা গণিকা অভিযোগে বনবালাকে দুদিন দুরাত্রি আটক্ থাকিতে হয়!—(অবশ্যই অনাহারে আটক্!) বিপদকালে সকল কথা স্মরণ থাকে না। দুদিন দুরাত্রের মধ্যে আসল পত্রিকার কথাটা বনবালার মনেই ছিল না। তৃতীয় দিবসে পত্রিকা দেখাইয়া মুক্তি পান! এ সকল মর্ম্মভেদী বাক্য শ্রবণ করিয়া কোন্ স্নেহের প্রাণ সুস্থির থাকিতে পারে?—আমাদের এই নিষ্ঠুর এই প্রশ্নের উত্তর দিবেন! (পতির প্রতি কটাক্ষপাত!) কোতোয়ালীতে হাজতে থাকা, আর পত্রিকা দেখাইয়া মুক্তি পাওয়া, এই দুই ঘটনায় বনবালা যেন মরণাধিক যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছেন!—বনবালা বলিলেন, সে যাতনার কথা মুখে প্রকাশ করিয়া বলা যায় না।"

বনবালা ঠিক বলিয়াছেন।—কোতোয়ালীর প্রচণ্ড প্রতাপ, কোতয়ালী এমনি বস্তুই বটে!—বস্তু না হইয়াও প্রকাণ্ড বস্তু! ওটা কেমন নামের গুণ!—তখনও যে রঙ্গ, এখনও সেই রঙ্গ! এখনও ইংরাজী পুলিসের কোন কোন স্থলে উহা অপেক্ষাও বড় চমৎকার রঙ্গ হয়! একবার,—বড় বেশী দিনের কথা নহে,—একবার একটী মহকুমার এক ফৌজদারী আদালতে এক বলাৎকারের

মোকদ্দমার অনুসন্ধান হয়। স্ত্রীলোকটা হাকিমের কাছে স্পষ্ট আসিয়া বলিল, "অমুক আমার ধর্ম্মনষ্ট করিয়াছে!" এই অমূল্য এজেহারটী সর্ব্বপ্রথমে থানাতেই লওয়া হয়! থানাওয়ালারাই গোড়ার কার্য্য সমাধা করিয়া,—খুব উত্তমরূপে পাকাইয়া "ধর্ম্মনষ্ট করা" মোকদ্দমাটী হুজুর আদালতে চালান দিয়াছিল। ইহার নাম পুলিস-চালানী মোকদ্দমা। পুলিসের বাহাদুরী দেখুন!—"ধর্ম্মনষ্ট করা" মোকদ্দমাটা মহকুমা হইতেই মিটিবে না! দায়রায় যাইবে! সেখানে রাঙামুখ,—অবশ্যই আসামীটার যৎকিঞ্চিৎ প্রবাসগমন ঘটিবে! পুলিস ইহা জানিত।—জানিয়া শুনিয়াই পুলিসের লোকেরা আগাগোড়া মিথ্যাকাণ্ডটা উত্তমরূপে সাজাইয়া আস্‌খাস্‌ চালান দিয়াছিলেন! ডেপুটীবাবু "ধর্ম্মনষ্টের" দায়েই মহাবিব্রত! দায়রায় সোপরদ্দ হয় হয়, ঠিক এমন সময় আসামীর উকীল সরেজমিন্‌ তদন্তের প্রার্থনা করেন। প্রার্থনা মঞ্জুর হয়। হুজুর স্বয়ং সরেজমিনে গমন করেন। তদন্তে প্রকাশ পায় যে, যাহার "ধর্ম্মনষ্ট করা" হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ, সেই স্ত্রীলোকটা তিন বৎসরের অধিককাল প্রকাশ্যরূপে বেশ্যাবৃত্তি করিতেছে! যে লোকটা এ মোকদ্দমায় আসামী, সে লোকটা নির্দ্দোষ। বেশ্যাসম্বন্ধে নির্দ্দোষ,—অর্থাৎ এ বেশ্যার সহিত তাহার কস্মিন্‌কালেও দেখাশুনা নাই। এই কারণেই নির্দ্দোষ। এমন ব্যক্তি "ধর্ম্মনষ্ট করার" দাবীতে আসামী কেন, তাহা অনেকেই জানেন। লোকটার উপর দুই একজন পুলিসের লোকের আড়ি! পুলিসের লোকেরা কেমন করিয়া আড়ি তোলে,—জবরদস্তেরা সর্ব্বদাই তাহা দেখাইবার চেষ্টা করে। দৃষ্টান্তস্থলে এই যে

মোকদ্দমার কথা উত্থাপিত হইল, সেই মোকদ্দমার চক্রান্তটী অনুপম পালিস্ করা! পুলিস-পণ্ডিতেরা সে মোকদ্দমার নাম দিয়াছিলেন. "ফুস্‌লাইয়া স্ত্রীবাহির করিয়া ধর্ম্মনষ্ট করা!" বারাঙ্গনার "ধর্ম্মনষ্ট" করার মোকদ্দমা হিন্দুস্থানে টেঁকে না! সরেজমিন তদারকের সময় অনেকে ডেপুটীর কাছে শপথ করিয়া বলিয়াছিল, "তিনবৎসর ধরিয়া ঐ বেশ্যার গৃহে যত লোক জটলা করে, পুলিস নিজেও তাহাদের মধ্যে আছে। সকলেই জানে, সেই স্ত্রীলোক দস্তুরমত বাজারের বেশ্যা!" সকলেই জানিতেন, কেবল পুলিস জানিতেন না! বোধ হয়, বেশ্যার কথা ধর্ত্তব্য নয় বলিয়াই ধরিতেন না। এখন দেখি-লেন, একটা লোককে জব্দ করা চাই, তৎক্ষণাৎ অমনি সেই অধর্ত্তব্য বেশ্যাকে উত্তমরূপে ধর্ত্তব্য করিয়া, উত্তমরূপে সতী সাজাইয়া পুলিস-পণ্ডিতেরা তাহার "ধর্ম্মনষ্ট করার" মোকদ্দমা তুলিয়াছিলেন!!! মোকদ্দমা অবশ্য ডিস্‌মিস্ হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বের ঐ কোতোয়ালীর কথার সহিত এখনকার পুলিসের কথার তুলনা করিবার জন্যই এস্থলে ইহা উল্লেখ করা হইল। অনেকেই বলেন,—প্রায় সকলেই বলেন, "দুরন্ত পুলিসের অসাধ্যকর্ম্ম সংসারে নাই!"——

"পুলিসের অসাধ্যকর্ম্ম সংসারে নাই!"—একথাটা শুনিতে বড়ই পরিষ্কার। পুলিস যদি ভালকর্ম্মে অসাধ্যসাধন করিতে পারেন, তাহা হইলেই ত সুখের বিষয় হয়, কিন্তু পুলিস সেদিকে হেলিতে চাহেন না! মন্দের দিকেই বেশী ঝোঁক!—ঐপ্রকারের পুলিস-চালানী অথবা থানা-চালানী "ধর্ম্মনষ্ট করা" মোকদ্দমায় কত প্রকার ভয়ানক ভয়ানক বিষ-ফল সমুৎপন্ন হইয়াছে, তাহা

বর্ণনা করা অসাধ্য। আজকাল সেই অনর্থটা কিছু বেশী হই-তেছে। অন্য সহর অথবা অন্য গ্রাম দূরে থাকুক, ভারতের প্রধান রাজধানী কলিকাতাসহরের মধ্যে রকম রকম পুলিস-চালানী মোকদ্দমার যেপ্রকার দুর্দ্দশা হয়, তাহা যাঁহারা দর্শন করেন,—তাহা যাঁহারা স্মরণ করিয়া রাখেন, তাঁতারাই সে বিষয় পুনঃস্মরণ করিয়া ভয় পাইবেন! অল্পদিন পূর্ব্বে কলিকাতাসহরে বেশ্যাদলের ১৪ আইনের যখন ভারি ধূমধাম, সেই সময় কলিকাতাপুলিস মধ্যে মধ্যে এক একটা ভয়ঙ্কর অভিনয় দেখাইয়াছেন। ভারতবর্ষের একজন সর্ব্বপ্রধান লাটসাহেবের মাথায় আসিল, সকলেই ভিন্ন ভিন্ন আইনের দ্বারা বাঁধা, কলিকাতার বাজারের বেশ্যারা কেন তবে একটা "অতি প্রয়ো-জনীয় শুভকর" ইংরাজী আইনের প্রশস্ত গ্রাস হইতে ফাঁক যায়?—সেই প্রধান লাটের প্রধান মস্তক হইতেই সেই মহা-মহা ঘৃণাকর বেশ্যাসংশোধক অনুচ্চার্য্য আশুবিলুপ্ত কদাকার ১৪ আইনের জন্ম!—সেই ঘৃণাকর আইনের ঘৃণাকর উৎপাতে গুটীকতক ধর্ম্মশীলা বিধবা গৃহস্থকুলবালা মহানগরীর পুলিস-পালোয়ানদের হাতে কতই অপমান সহ্য করিয়াছেন, স্মরণ হইলে এখনও সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে! কলিকাতাপুলিস সে সময়ে (বোধ হয় কিছু কিছু পয়সার লোভে) অত্যন্ত দৌরাত্ম্য করিয়াছিলেন। গঙ্গাস্নানের গৃহস্থ কুলবধূকে বেশ্যা বলিয়া ধরা হয়!—থানায় আটক্ রাখা হয়! লালবাজারে মোকদ্দমা হয়! অশ্রোতব্য ব্যাপার! কলিকাতার সৌভাগ্যক্রমে সে সময় কলিকাতা পুলিসের বিচারাসনে বাঙ্গালী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। ১৪ আইনের ঐপ্রকার মোকদ্দমায় তাঁহার নিকটে পুলিসের

দুরন্ত লোকগুলির বিলক্ষণ সুশিক্ষা লাভ হইয়াছিল। দুরন্ত পালোয়ানেরা পদেপদেই সাজা পাইয়াছে,—পদেপদেই বদ্‌লী হইয়াছে!—মাঝারিদলের এক একজন বড় অপেক্ষাও বড় প্রতাপ দেখাইয়া জন্মের মত সরকারি রুটী হারাইয়াছেন! তবে সেই ১৪ আইনের আগুনটা কতক ঠাণ্ডা হয়। যাহাদের জন্য আইন, সেই বেশ্যাদের উপরেও অকারণ অসঙ্গত দৌরাত্ম্য হইয়াছিল। সকল দিকেই ঘৃণাকর!—একজন মহাত্মা শাসনকর্ত্তার কল্যাণে সেই ঘৃণাকর আইনটা রদ্ হইয়া যায়। মহাত্মা লর্ড রিপণ বাহাদুর ঐ কার্য্যে অভাগিনীদের কাছে বিস্তর আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

পুলিসের সব গুণ!—যে অভিপ্রায়ে পুলিসের সৃষ্টি, তাহার অণুমাত্রও মন্দ নহে। পুলিস সাধুলোকের ভরসাস্থল,—দুষ্ট লোকের ভয়স্থল;—ইহাই ত ঠিক।—আজকাল তাহার উল্টা হইয়া গিয়াছে! পুলিস এখন সাধুলোকের পক্ষেই ভয়স্থান হইয়া দাঁড়াইয়াছে!—পুলিসের নামে ভদ্রলোকের গা কাঁপে! অনেকেই বলেন, পুলিসে যেন বাঘ-রাক্ষস বাস করে! কথাটা নিতান্ত মিথ্যাও নহে। পুলিস যেন ভালমানুষের যম! স্থানে স্থানে শুনিতে পাওয়া যায়, দেশের পুলিসের অনেক চাপ্‌রাসের সহিত দেশের বিখ্যাত দস্যুতস্করাদি বদ্‌মাস্ লোকেদের বিলক্ষণ সদ্ভাব আছে!

যোগমায়া যথার্থই বলিয়াছেন, সহরেই যত গোল! পুলিসে কিন্তু সদরমফস্বল চেনা যায় না। যোগমায়া বলিলেন, "এমন পুলিসের ভিতরেও পতি অন্বেষণ!—এমন পুলিসের ভিতরেও বনবালা পতি অন্বেষণ করিতেছেন! বনবালাকে কুলটা ভাবিয়া

পুলিসের লোকেরা ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল! আমাদের এই নিষ্ঠুর সেই সময় কুলরক্ষার শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছিলেন! (পতির প্রতি কটাক্ষপাত!) দুইবার দস্যুহস্তে বনবালার প্রাণ যাইবার উপক্রম হইয়াছিল! বনবালার সর্ব্বস্ব জুয়াচোরে লইয়াছে! বনবালা একবস্ত্রা হইয়া,—দিন দিন উপবাস করিয়া, দেশে দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পর্য্যটন করিয়াছেন! বনবালা পতি অন্বেষণ করিয়াছেন! (পতির প্রতি কটাক্ষপাত!) ধন্য পতি!—ধন্য সতী!—ধন্য জগৎ!"

সহরেই যত গোল!—জুয়াচুরীটাও সহরে বেশী!—বনবালা যে সময়ের পরিচয় দিয়াছিলেন, সে সময়ের অপেক্ষা জুয়াচুরীটা এখন আরও ক্রমে ক্রমে বেশী জাঁকিয়া উঠিতেছে! পণ্ডিতেরা বলেন, "যেখানে অধিক লোক অল্প অল্প লেখাপড়া শিক্ষা করে, সেই শিক্ষা যেখানে কেবল অর্থোপার্জ্জনের দিকেই ধাবিত হয়, সেই অর্থকরী বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে জুয়াচুরীবুদ্ধিটাও বাড়িয়া উঠে!"—আজকাল দেখিয়া শুনিয়া বিশ্বাস হইতেছে, কথাটা খুব সত্য। লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে রিফাইন্ রকমের জুয়াচুরী প্রবেশ করিতেছে! পূর্ব্বে পূর্ব্বে জুয়াচোরলোকের যেপ্রকার উপস্থিতবুদ্ধি যোগাইত,—কিম্বা জুয়াচুরীবুদ্ধি না থাকিলেও জুয়াচুরী করাটায় যেপ্রকার অভ্যাস হইয়া যাইত, এখন ইংরেজ আমলে ভালমন্দ সমস্তই যেন নূতন নূতন! জুয়াচোরেরা এখন রকম রকম ভেক বদল করিতেছে!—পুরাতন ফন্দীর বদলে নূতন ফন্দী সৃজন করিতেছে! ধূর্ত্ত ইতরশ্রেণীর ইংরেজেরাও এদেশের লোককে অনেক জুয়াচুরী শিখাইতেছে! জুয়াচুরীর প্রকারও অনেকপ্রকার বাড়িয়াছে! কেবল জুয়াচুরী

বলিয়াই নহে, ইংরেজের কোন কোন পাঠ্য পুস্তকে, ইংরেজের সংবাদপত্রে, ইংরেজের বিজ্ঞাপনে, ইংরেজের আদালতের রিপোর্টে, ইংরেজের মোকদ্দমার ফয়সালায়,ইংরেজের সভাবিশেষের কার্য্যবিবরণে, অনেকানেক ভয়ানক পাপের কথা এদেশের লোকে অবগত হইতেছে। যাহারা অসাধুবুদ্ধির পরিচালনে তৎপর, তাহারা সেই সকল পাপের পরীক্ষা করিতে শিখিতেছে! এ শিক্ষাও তাহাদের পক্ষে ইংরেজ আমলের অনুকরণ!

যোগমায়ার কথায় বাধা পড়িতেছে। অসহায়া- বাক্যহীনা যুবতী গৃহস্থবালার পক্ষে বিদেশভ্রমণ করায় যত বিপদ, বনবালার ভ্রমণে তাহার যতগুলির সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছিল, যোগমায়া তাহার বড় বড় বাছিয়া একে একে উল্লেখ করিলেন। ভোগানন্দের লজ্জার উপর কষ্ট!—কষ্টের উপর অনুতাপ! নত বদনে, নত নয়নে অনবরত অশ্রুধারা! যোগমায়ার সে দিকে বিলক্ষণ লক্ষ্য ছিল। যোগমায়াই তাহা দেখিলেন! আর কেহ তত্দূর নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন না। যোগমায়া মাঝে মাঝে পতির বদনে কটাক্ষপাত করিতেছিলেন, তাহার মানে ঐ। দুরন্ত ঘটনাবলী শ্রবণ করিয়া তাঁহার মুখখানির কখন্ কেমন ভাব হয়, সেইটী দর্শন করাই যোগমায়ার মনোগত ইচ্ছা।

পতিকে সম্বোধন করিয়া যোগমায়া কহিলেন,"আপনি কাতর হইবেন না।—আপনি জানেন, আপনার নেত্রেজল যোগমায়ার অসহ্য! কাঁদেন কেন?—বনবালা নিরাপদে ঘরে আসিয়াছেন, অশ্রুপাত কেন? শুনুন বনবালার কথা!"

ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিয়া, পতির নিকটে গমনপূর্ব্বক, অঞ্চলে তাঁহার অশ্রু মুছাইয়া দিয়া, যোগমায়াদেবী পুনর্ব্বার

কহিলেন, "মেয়েলী কথায় যাহা বলে, আপনি তাহাই করুন! মঙ্গলকার্য্যে অমঙ্গল করিতে নাই! চক্ষের জল আর ফেলিবেন না। শুনুন বনবালার কথা।—বনবালা অযোধ্যা হইতে—"

বলিতে বলিতে যোগমায়াদেবী আপনার আসনে আসিয়া উপবেশনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার আরম্ভ করিলেন, "বনবালা অযোধ্যা হইতে পতি অন্বেষণে বাহির হইয়া কত স্থানে পতি অন্বেষণ করিলেন, পতিকে পাইলেন না! বনবালা প্রথমে খুঁজিয়া খুঁজিয়া মগধে আসিয়াছিলেন। মগধে—"

আরব্ধ বাক্যটী অসমাপ্ত রাখিয়া যোগমায়াদেবী মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "আর একটু গোড়ার কথা বলি। অযোধ্যার বনের মাঝখানে আমাদের এই নিষ্ঠুরঠাকুরটী বনবালার হস্তে একখানি ক্ষুদ্র পত্রিকা সমর্পণ করিয়া আইসেন। সেখানিতে কেবল নিজের নামধাম লেখা ছিল মাত্র। তাহার পর আমাদের এই নিষ্ঠুররত্নটী আর একদিন (দেখাসাক্ষাৎ না করিয়া) এক রাখাল-বালকের হস্তে বনবালাকে আর একখানি দীর্ঘ পত্রিকা পাঠাইয়া দেন। পতি চিনিবার, আর পতির ঠিকানা চিনিবার ঐ দুইমাত্র নিদর্শন! উহা ছাড়া বনবালার কাছে আর কেহই কিছু পতির তত্ত্ব জানিতে পারিত না। বনবালা দেশে দেশে যাহাকে তাহাকে পত্র দেখাইতেন। মাঝে মাঝে আবার ভুল হইত। কাহাকেও বা দুখানি দেখাইতেন, কাহাকেও বা একখানি দেখাইতেন। যে ব্যক্তি দুখানি দেখিত, সে ব্যক্তি নামধাম বুঝিতে পারিয়া সঙ্কেতে কতকটা পথ দেখাইয়া দিতে পারিত। যে ব্যক্তি কেবল বড়খানি দেখিত, সে কিছুই বলিতে পারিত না। কেন না, বড়খানিতে নামধাম কিছুই লেখা ছিল না।

ছোট্ট পত্রের জোরেই অভাগিনী বনবালা এদেশে পৌঁছিতে পারিয়াছেন। বনবালা প্রথমে মগধে আসিয়াছিলেন। মগধে দুটী স্থানে পতি অন্বেষণ করেন। এখানে আসিয়া শুনিলেন, শুনিলেন অর্থাৎ ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে জানিলেন, ঠিকানা দিয়া একখানি পত্রও একজন দয়া করিয়া লিখিয়া দিল, তাহাতেই প্রকাশ পাইল, পাটনা।—বনবালা পাটনায় গেলেন। সেখানে জানিলেন, হুগ্‌লী।—আপনারা বুঝিতে পারিতেছেন, সেটী কোন্ সময়?—বনবালা পতি অন্বেষণ করিতেছেন। বঙ্গেই পতি অন্বেষণ।—পতি তখন—"

থামিয়া, মুখ ফিরাইয়া, যোগমায়াসুন্দরী একটু হাসিয়া কহিলেন, "পতি তখন যোগমায়াকে দাসী করিবার জন্য মনের আনন্দে হুগ্‌লীতে গিয়াছিলেন।"

ভোগানন্দঠাকুর ইত্যগ্রে ক্ষণকাল মুখ তুলিয়া সোজা হইয়া বসিয়া ছিলেন, শেষকথা শুনিয়া আবার তাঁহার বেশী লজ্জা আসিল।—আবার তিনি হেঁট হইয়া বসিলেন। যোগমায়া কহিলেন, "লজ্জা করিলে হইবে না!—আমি বক্‌সিস পাইব! বনবালা হরিণবাড়ীতে গিয়াছিলেন।—পতির বিবাহের মঙ্গল-যাত্রা দেখিয়াছিলেন,—দেখিয়া দেখিয়া দুঃখিনী একাকিনী সেই সঙ্গে সঙ্গে আবার পাটনায় আসিয়াছিলেন।—দেখা হয় নাই! পতির অন্বেষণে আসিয়া পতি দেখিলেন, পতি পাইলেন না! ভাল কথা!—বনবালাকে দুইবার পুলিসে ধরিয়াছিল! একবারের কথা বলিয়াছি, আর একবার আমাদের হরিণবাড়ীতে ধরে!—সেখানেও ঐ পত্রিকা!—সেখানেও সামান্য একটা ফাঁড়ীঘরে একরাত্রি অনাহারে আটক থাকিতে হইয়াছিল!

বনবালা একদিন বালক সাজিয়া পাটনার একটী স্ত্রীলোকের ভবনে ছদ্মবেশে একরাত্রি যাপন করিয়াছিলেন। সেখানেও সেই স্ত্রীলোককে আপনার দীর্ঘ পত্রখানি দেখান। ছোটখানি দেখান নাই। তাহাতেই সেই স্ত্রীলোকটী আমাদের ঠিকানা জানিতে পারেন নাই। দীর্ঘ পত্রিকায় কিছুমাত্র পরিচয়ের প্রসঙ্গই নাই। ছোটখানি যদি তিনি দেখিতেন, সেই রাত্রেই, নিশ্চয়ই, সেই রাত্রেই আমি বনবালা পাইতাম!"—এই স্থলে স্নেহবতী যোগমায়াদেবী সস্নেহে পার্শ্ববর্ত্তিনী বনবালাদেবীর চিবুকস্পর্শ করিয়া সাদরে পুনঃপুন আপন হস্তাঙ্গুলী চুম্বন করিলেন।—আদর করিয়া বনবালাকে বলিতে লাগিলেন, "বনবালা! আজ অবধি আমি তোমারে বনদেবী বলিয়া ডাকিব! তুমি যেন ভাই যথার্থই দেবকন্যা!—পতি অন্বেষণে তুমি যখন জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলে,—বোবা হইয়াও যখন তুমি পথে পথে তত বিপদ সহ্য করিয়াও বঙ্গদেশে আসিয়াছ, তখন তুমি সামান্য মেয়ে নও!—কখনই নও!—বনদেবি! তুমি ভাই আমার! আমিই তোমারে বাগানের ভিতর কুড়াইয়া পাইয়াছি! তুমি ভাই আমার!"

প্রসন্নবদনে বনবালা বলিলেন, "তোমার দয়াতেই আমার জীবন!—আমিই তোমার!"

মৃদু মৃদু হাস্য করিয়া ভবরঞ্জিকা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার হইবে না?"

মৃদু হাস্য করিয়া বনবালা বলিলেন, "আমি কাঙ্গালিনী!"

ব্যঙ্গ করিয়া যোগমায়া কহিলেন, "তবে ভাই প্রাণে প্রাণ মিলে নাই!—এখনো ঐকথা তোমার মুখে?—যে কথায় আমরা

প্রাণে ব্যথা পাই, আজিও তুমি সেই কথা উচ্চারণ কর?
প্রাণে প্রাণ মিলে নাই!—ছিঃ!—আর উহা বলিতে নাই।
বনবালা রাজরাণী।—বনদেবী রাজমহিষী।—আমি যোগমায়া,
এই রাজমহিষীর প্রিয়সখী;—প্রিয় ভগিনী। এই কথাই আমি
বলিব। পতিও অবশ্য প্রত্যেক বর্ণে বর্ণে উচ্চারণ করিবেন,
বনবালা আমার মহিষী।—বনদেবি! ধন্য তুমি!—ধন্য তোমার
পতি অন্বেষণ! এখন পতিরত্ন লাভ হইয়াছে, সুখী হও।
তোমাদের সুখী দেখিয়া আমরাও যেন সুখে থাকি। পতিকে
তিরস্কার করিলাম না,—ভৎ'সনা করিলাম না, ইঁহার একটী
দর্পচূর্ণ করিলাম। ইনি সর্ব্বদা অহঙ্কার করিয়া বলেন, "প্রেমের
পন্থা পুরুষ যেমন জানেন, নারী তেমন জানে না। ভালবাসা
সামগ্রীর দর্শনলাভের আকাঙ্ক্ষায় পুরুষ যেমন কষ্ট স্বীকার
করিতে পারেন, নারী তেমন পারে না।"—এই অহঙ্কারটী
চূর্ণ করিবার ইচ্ছাতেই আজ আমার অর্চ্চনীয় পতিকে নিষ্ঠুর
বলা। বুঝিয়াছ বনদেবী?—পতির অনুচিত দর্প চূর্ণ করিবার
ইচ্ছাতেই তোমার পতি অন্বেষণের অতুল্য অতুল্য প্রমাণ
দেওয়া।"—এই পর্য্যন্ত বলিয়া ভবরঞ্জিকাকে সম্বোধনপূর্ব্বক
যোগমায়া কহিলেন, "কেমন দিদি! হয় নাই?"

ভবরঞ্জিকা একটু ভারী হইয়া বলিলেন, "ছিঃ!—পতি
গুরুলোক!—তুমি চুপ্ কর!"

কথাগুলিতে সভাস্থলে অলঙ্কারশাস্ত্রের অন্য কোন রসের
আবির্ভাব হইল না। সকলেই প্রফুল্লবদনে আমোদিত হইয়া
একসঙ্গে হাস্য করিলেন। সভা ভঙ্গ হইল।

সভাভঙ্গের পর যোগমায়াদেবীকে একটু অন্তরে ডাকিয়া

লইয়া রাজা ভোগানন্দঠাকুর একটু চিন্তাকুল বদনে চুপিচুপি কি গুটীকতক গুহ্যকথা জিজ্ঞাসা করিলেন। যোগমায়াদেবী ঈষৎ হাসিয়া একটু ঘাড় বাঁকাইলেন। সানন্দভঙ্গীতে কিঞ্চিৎ বামদিকে বক্রগ্রীবা।

দ্বাবিংশ কল্প।

আদর্শসতী।

বনবালার বিবাহ হইবে, ইহাই ত মনে ছিল না!—যে প্রকারে বিবাহ হইয়াছে, তাহাও ত অভাবনীয়। বনবালা এখন রাজমহিষী। যত কষ্টে পতি পাইয়াছেন, বনবালাই তাহা জানেন। বৃত্তান্ত শুনিয়া যাঁহারা কষ্ট বুঝিলেন, বলিতে গেলে তাঁহাদের ত কিছুই বুঝা হইল না। বর্ণনা করিয়া তাদৃশ ভয়ঙ্কর কষ্ট কখনই বুঝাইতে পারা যায় না। কল্পনা করিয়া বুঝিতে পারাও অসম্ভব। পতিই সেই কষ্টের মূলীভূত। পতি যাহাই হউন, বনবালা যথার্থই আদর্শ সতী। পতিও কোন প্রকার পাপপন্থার পথিক নহেন, প্রকৃতিও উদার,—সকল বিষয়েই সদাশয়,—কোন দিকেই প্রায় দোষ পাওয়া যায় না। রোষের মধ্যে বনবালার সঙ্গে দীর্ঘ বিচ্ছেদ। ভ্রান্তিক্রমে অথবা

ইচ্ছাক্রমে এই বিচ্ছেদ সংঘটন, তাহা কেবল ভোগানন্দই জানিতে পারিবেন। অপরের তাহাতে সন্দেহ আনিবার কোন বিশেষ বলবান হেতু নাই।

মহিষী বনবালাসুন্দরী অষ্ট প্রহর পতিসেবায় যত্নবতী। ততঃ কষ্টে লব্ধপতি, সেই জন্যই বনবালার পতিসেবায় ভক্তি বেশী, যত্ন বেশী, আগ্রহ বেশী।—সঙ্গে সঙ্গে বিশুদ্ধ হৃদয়ের বিশুদ্ধ প্রণয়টুকুও বেশী। ভোগানন্দঠাকুর এই ভক্তিমতী পতিপরায়ণা বনবালার প্রতি পরমপ্রীত হইলেন। উভয়ে যেন অনুপম স্নেহপূর্ণ প্রেমভাব হৃদয়ে ধারণ করিয়া দিবানিশি বিশুদ্ধ প্রেমানন্দ উপভোগ করিতেছেন। যে পতির জন্য ততখানি কষ্ট, সে পতির প্রতি ততখানি ভক্তিভাব দেখাইতে পারেন, এখনকার দিনে সেপ্রকার শুদ্ধভক্তিমতী পতিব্রতা মধুমতী সাধ্বীর সংখ্যা নিতান্তই অল্প।

এখনকার কালে স্ত্রীপুরুষে যে একটু ভালবাসা হয়, অনেক স্থলে সে ভালবাসার নাম অদ্ভুত ভালবাসা!—যে কয়েকটীর হৃদয়ে পবিত্র ভালবাসা বাস করে, সে হৃদয়গুলি দেবতার আসন। সেখানে স্বার্থপর নিকৃষ্ট নরের প্রবেশাধিকার কম। যেখানে প্রবেশ ঘটে, সেই খানেই ডাকাতী! এখনকার পতি-পত্নীর ধর্ম্মভাবের পবিত্রতাটুকু অনেকদূর সরিয়া গিয়াছে। অধিকাংশ স্ত্রীপুরুষের ভালবাসা কোন না কোন প্রকার দুর্জ্জয় স্বার্থের সঙ্গে হাড়ে হাড়ে বাঁধা। বিবেচনা করুন, আজকাল যাহা নিত্যক্রিয়ার মধ্যেই হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা আর কতদূর অগ্রসর হইবে, কে বলিতে পারে?—পতি যদি মনের মত টাকা দিতে, গহনা দিতে, ভাল ভাল বস্ত্র দিতে বিলক্ষণ

অসমর্থ হন, স্ত্রী তাহা হইলে দিনকতক অনুগত থাকিতে পারেন। অনুগত কিম্বা বশীভূত যাহাই বলুন, মূলেই ধরুন টাকা! আজকাল আবার কেবল তাহাও নয়। অংশে অংশে আরও উঁচু। বঙ্গদেশের মধ্যে কলিকাতাসহর আজকাল প্রধান সহর।—এ সহরে যাহা হয়, অন্যস্থানের অজ্ঞান মকলনবিসেরা তাহাই শিক্ষা করিতে আগ্রহবান হয়।—তাহাই অনুকরণ করিতে লাফ্ দিয়া লাগিয়া যায়! স্ত্রীপুরুষের স্বত্বসম্পর্ক লইয়া অধুনা এদেশে ভারি ধূম লাগিয়া গিয়াছে! যাঁহারা ইংরেজের স্কুলে ইংরাজী পড়িয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই নারীস্বাধীনতার জন্য উন্মত্ত। যাঁহাদের টাকা আছে, তাঁহারা ইচ্ছা করিলেই বিবাহিতা পত্নীকে কয়েদ করিতে পারেন, খালাস করিতে পারেন, অধীন করিতে পারেন, স্বাধীন করিতে পারেন, সব পারেন। কেহ কেহ করিতেছেনও তাহা। এই নারীস্বাধীনতার সঙ্গে একটা ফ্যাসাত আরম্ভ হইয়াছে। মাসিক দ্বাদশ মুদ্রা বেতনে যাহারা অপরের দাসত্ব করে, তাহারাও সৌখীন স্ত্রীর অনুরোধে বাড়ীতে বাবুর্চ্চি রাখিতে আগ্রহপূর্ব্বক অনুরাগী! বাবুর্চ্চি বলিলেই পেঁয়াজের গন্ধশুদ্ধ চাপ্‌দাড়ী বুঝিতে হইবে না, সোজা কথায় বাবুর্চ্চি মানে রাঁধুনী। মাসে যাহার বারোটী টাকা আয়, সংসারে যাহার অন্ততঃ তিনটী প্রাণী,—স্ত্রী, একটী পুত্র, আর নিজে,—কাহারও কাহারও হয় ত জীবিতা বৃদ্ধামাতা গলগ্রহ! এ অবস্থায় সে সংসারে রাঁধুনী রাখা আপনাদের একপ্রকার নির্জ্জলা উপবাসের বন্দোবস্ত! কিন্তু উপায় কি? রাঁধুনী না রাখিলে পরিবার চটিয়া যান! পরিবারগুলি সর্ব্বদা ফিট্ ফাট্ বিবি সাজিয়া কারপেট্ ও পাঁচালী ইত্যাদিতে

কাল হরণ করিতে সাধ করেন! সে সাধ পূর্ণ হয় কিসে? আহা- রটী না করিলে চলে না,—পরিবার ত রন্ধন করিবেন না। সে রন্ধনে উভয়ের প্রাণেই সমান কষ্ট! যিনি পরিবার, তিনি রন্ধন করিতে গেলে হাত পুড়িয়া যায়, বর্ণ ময়লা হয়, দেহখানি শুষ্ক হইয়া যায়, দুবেলা মাথা ধরে!—আগুনতাত লাগিলেই সঙ্গে সঙ্গে দুটী রোগ! পেটে ব্যথা আর বাতশ্লেষ্ম জ্বরবিকার! যাঁহার পরিবার, তিনি যদি দেখেন, কিম্বা শুনেন, পরিবার রন্ধন-গৃহে,—রন্ধন করুন আর নাইই করুন, থাকেন যদি রন্ধনগৃহে, তাহা হইলেই তৎক্ষণাৎ পরিবারওয়ালারা এককালে রাগিয়া টং হন!—প্রেমের নয়নে,—বিলাসের নয়নে,—স্বাধীনতার নয়নে, তৎক্ষণাৎ তিনি দর্শন করেন, পরিবারের চক্ষে ধোঁয়া লাগিয়াছে, পরিবারের চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়াছে, পরিবারের কাপড়ে কালী লাগিয়াছে, হাঁড়ী নামাইতে সর্ব্বশরীরে বাত ধরিয়াছে! কল্পনাপথে এই সকল দর্শন করিতে করিতে তৎক্ষণাৎ অনুভব হয়, রন্ধনের ধোঁয়া লাগিয়া পরিবারের মাথা ধরিয়াছে! কাজেই পরিবারের রন্ধনগৃহে প্রবেশ করা বিষম বিভ্রাট! বৃদ্ধা জননীর উপর পরিবারওয়ালার মহা কোপ!!! তাহাতেও ত কিছু হয় না।—রন্ধন করে কে?—বৃদ্ধা জননীর রন্ধন করিবার ক্ষমতা নাই। পরিবারওয়ালা নিজে যদি রন্ধন করিয়া বৌমা পোষণ করেন, তাহা হইলে সুখের দাসত্বটীতে জলাঞ্জলি হয়! পরিবার যদি রন্ধন করিতে যান, তাহা হইলেও মাথা ধরা ও জ্বরটা তৎক্ষণাৎ পাছু পাছু ছুটিয়া যায়! কোন দিকেই উপায় নাই। বাবুর্চ্চি রাখিলেও টাকার অভাবে উপবাস, বাবুর্চ্চি না রাখিলেও রন্ধনের অভাবে উপবাস! দুই দিকেই হরিমটর!

আমরা ইহাকে ব্যাধি বলি। ইতরশ্রেণীর ইংরেজেরাই এদেশে এই ব্যাধি আনয়ন করিয়াছে।

পরিবারকে ফিট্ ফাট্ সাজাইয়া রাখিয়া রন্ধনাদি গৃহকর্ম্ম করিতে না দেওয়া এক প্রকার ব্যাধি,—পরিবার ঘাড়ে করিয়া সভায় সভায়, বাগানে বাগানে, দরবারে দরবারে, বাহাদুরী লইবার ইচ্ছাটাও অচিকিৎসনীয় মহাব্যাধি! নারীস্বাধীনতার হুজুগে বঙ্গদেশে আজকাল এই ব্যাধিটা ক্রমশই প্রবল হইয়া উঠিতেছে! ইংরাজীপড়া খোস্‌পোশাকী বালকগুলি এইরূপ মহাব্যাধিতে মহাক্রান্ত।

বনবালা আদর্শ সতী।—জন্মাবধি কষ্ট পাইয়াছেন,—জন্মাবধি বনবাসিনী,—পতির জন্য কাঙ্গালিনী,—পতি অন্বেষণে বিদেশিনী,—পতির জন্য অসহ্য অসহ্য কষ্টভোগিনী, সনাথিনী হইয়াও অনাথিনী! পতি অন্বেষণে সতীর যে কষ্ট, সতীই তাহা বুঝিলেন।—সে কষ্ট এখন আর তাঁহার মনে নাই। পতি প্রাপ্ত হইয়া সতী তাহা অক্লেশেই ভুলিয়া গিয়াছেন। বনবালা অদর্শ সতী। পৌরাণিক ইতিহাসে সাবিত্রী, দময়ন্তী, জানকী, বেহুলা, প্রভৃতি আদর্শসতীর যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহা একপ্রকার দেবতার কাহিনীর অন্তর্গত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সামান্য গৃহস্থ নরলোকের সংসারে এপ্রকার সতীর আদর্শ বড় অধিক অন্বেষণ করিয়া পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ এখনকার বাজারে!

এখনকার বাজারে পতির যদি টাকা না থাকে, তাহা হইলে পত্নীর হস্তে তাহার যে কি দুর্গতি, যে সকল হতভাগ্য দরিদ্র পরিবারওয়ালারা পরিবারগুলিকে বিবি সাজাইয়া স্বাধীনতা দিতে উন্মত্ত, তাহারাই তাহা,—তাহারাই সে সুখটী হাড়ে হাড়ে

উপভোগ করিতেছে! এখনকার বাজারে টাকার পত্নীই পতিব্রতা! বিবি সাজাইয়া বিবিদের মতন প্রভুত্ব দেওয়ায় বড় সুখ! ঐ রকমের স্বাধীনা পতিব্রতারা এখন স্বাধীন বন্ধুর সহিত গাড়ীতে বসিয়া পতিকে কোচ্ বাক্সে লইয়া যায়! রাগের মুখে পড়িলে উত্তম উত্তম ছড়াগাঁথা স্বাধীনতার মজ্লিসী পাঁচালী শুনাইয়া দেয়!—ঘরের কোণে অন্ধকারে একা পাইলে শতমুখীর মুখেও পতিভক্তির পারাকাষ্ঠা ঝাড়িয়া ফেলে! স্বাধীনতাপ্রিয় বাবুর ছেলেরা পরিবারগণকে ঐরকম পতিব্রতা করিয়া এক প্রকারে পার পাইতেছেন! যাঁহারা পাকেপ্রকারে হিন্দুসমাজ ত্যাগ করিয়া, পরিবারসহ বেশী টাকা উপার্জ্জন করিতেছেন, তাঁহাদের পরিবারেরা ত খাস বিবি!—কেন না, পরিবারেরাও সমাজের ধার ধারেন না! যাঁহাদের পরিবার, তাঁহারা ত মুখে মুখে সমাজের মাথায় বিলক্ষণ পদাঘাত করেন!—বিলক্ষণ আমোদ হয়! সকল দিকেই সুবিধা!—সব পথ খোলসা!

বনবালা আদর্শ সতী —বনবালার শরীরে বিন্দুমাত্র অধর্ম্ম নাই!—বনবালার হৃদয়ে বিন্দুমাত্র ক্রূরতা নাই!—বনবালার মানসে বিন্দুমাত্র সন্দেহরেখা নাই!—পবিত্র!—বনবালা সরলা! বনবালা পতিব্রতা! বনবালা আদর্শ সতী!

এখনকার পরিবারেরা পতির কাছে টাকা পাইলেই সতীত্ব জানায়,—ভালবাসা জানায়,—ভালকথা জানায়,—প্রেম জানায়! পবিত্র প্রেম জানায়! পবিত্রপ্রেম নামে কলঙ্ককালী মাখাইতে আজকাল যাঁহারা অত্যন্ত ভালবাসেন, তাঁহারাই বলেন, এখনকার বিবিসাজা স্বাধীনা পরিবারেরা নিরাপদে যথায় তথায় ছুটিয়া সকলের কাছেই প্রেম দেখায়! প্রেমেরও নিপাত নাই!

পবিত্র প্রেমের এমন দুর্গতি জীবনকালের মধ্যে সত্যই আমরা অতি অল্পই শুনিয়াছি।

বঙ্গের হিন্দুর সংসার লক্ষ্মীর সংসার। আমাদের বনবালা-দেবী বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কি না, কোথাও তাহা প্রকাশ নাই। কিন্তু বঙ্গবালারা বনবালার তুল্য পবিত্রভাব দেখাইতে না পারেন, এমন ইচ্ছা কাহারও নহে। ভারতীয় সতীসংসার বনবালার নামে গৌরবান্বিত। বনবালা মহা বিপদে কুতদেশ পরিভ্রমণ করিয়াছেন, তথাপি স্বাধীন হইবার বাসনাটী তাঁহার পবিত্র হৃদয়ে মুহূর্ত্তের জন্যও স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। এখনকার পরিবারেরা স্বাধীন হইবার নামেই নাচিয়া উঠেন! পরিবারওয়ালারও তালে তালে বাদ্য করেন!

পরিবারের প্রতিপোষকেরা বলেন, "স্ত্রীলোক লেখাপড়া শিখিলে স্বাধীন হয়। লোকের জালায় হইতে পারে না! স্বাধীন করিলেই স্বাধীন হয়। লেখাপড়াজানা স্বাধীনা হিন্দুজানানা খুব ভাল রকম পতিব্রতা হয়! স্বাধীনা বঙ্গবালারা সতীত্ব রাখিতে বেশ জানেন! স্বাধীনতায় বুদ্ধিবৃত্তি দীপ্তি পায়, মানসের তেজস্বিতা বাড়ে, পতিভক্তি প্রবলা হয়, দশজন ভদ্র-লোকের সঙ্গে চেনাশুনা হয়,—আলাপপরিচয় হয়, বিলক্ষণ সদ্ভাব সঞ্চারিত হয়! স্বাধীনতার অনেক গুণ!—নারীস্বাধীনতার সহস্রপ্রকার গুণ!"

অবশ্যই সহস্রপ্রকার গুণ!—ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে কবিবর ঈশ্বরগুপ্ত ঠিক যেন দৈববাণী করিয়া এই সহস্রপ্রকার গুণের মহিমা গাইয়া গিয়াছেন। তখন তবু অবলা-মহলে স্বাধীন-বাজারের গণ্ডগোল উত্থিত হয় নাই। তখন কেবল শ্লেট কেতাব

হস্তে কলিকাতার গুটীকতক হিন্দু বালিকা হেদুয়ার বেথুনস্কুলে দুটী পাঁচটী ইংরাজী বুলী কপ্‌চাইতে শিখিতেছিল। তাহাই দর্শন করিয়া কবি যাহা বলিয়া গিয়াছেন, নূতন নূতন পাঠক ও পাঠিকারা তাহার একটুখানি দর্শন করুন :—

"বিবির বিরাজ, বিবির মেজাজ,
বিবির বাজার হবেই হবে!
(এরা) এ বি পোড়ে, বিবি সেজে,
বিলিতী বোল্ কবেই কবে!

* * * *

আর কি এরা এম্নি কোরে,
সাঁজসেঁজুতির ব্রত নেবে?
আর কি এরা আদর কোরে,
পিঁড়ি পেতে অন্ন দেবে?

* * * *

আর কিছু দিন থাক্‌লে বেঁচে,
সবাই দেখ্‌তে পাবেই পাবে।
(এরা) আপন হাতে, হাঁকিয়ে বগী,
গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে!"

কবিবরের এই দৈববাণী কলিকাতাসহরে সার্থক হইয়াছে। কলিকাতায় যাহা হয়, চমৎকার রংদার হইয়া সেই প্রথাটাই মফস্বলের চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। মফস্বলের কোন কোন সহরে,—দুই একখানা গোছালোরকম পল্লীগ্রামেও কতক কতক ফল ফলিতেছে!—পুরুষমানুষেরাই আহ্লাদপূর্ব্বক লক্ষ দিয়া

সেই ফল পাড়িয়া লইবার জন্য ছুটাছুটি করিতেছেন! এ রোগটাও ইংরেজেরা আনিয়াছেন!

বনবালা আদর্শ সতী।—বনবালাতে এখনকার এপ্রকার রোগ তিলমাত্রও স্পর্শ করিতে পারে নাই। বনবালা আপনি যে কি, তাহা এখনও পর্য্যন্ত ভাল করিয়া বুঝিয়াছেন কি না, সে মীমাংসায় সন্দেহ আছে। বনবালা ধর্ম্মের পথ হইতে একটী পদও বিচলিত হন না।—পতিসেবায় বিন্দুমাত্রও আলস্য করেন না। দাসদাসীগণের উপরেও গৃহকর্ম্মের তত্ত্বাবধান করেন। মুখে বেশী বাক্য নাই। বিলাস কাহাকে বলে, পঞ্চবিংশতিবর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত বনবালা তাহার কিছুই জানিতেন না। বনবাসেই তাঁহার শৈশবশিক্ষা,—যৌবনশিক্ষা।—তৃণাসন ও সিদ্ধপক্ক ভিন্ন বনবাসে আর অন্য কোন প্রকার শয়নবিলাস অথবা ভোজন-বিলাসের সম্পর্কই ছিল না। বনবালা বিলাস জানিতেন না। এখনও পর্য্যন্ত ভাল করিয়া জানেন না। রাজরাণী হইয়াছেন, ভাল বস্ত্র পরিধান করেন, ভাল অলঙ্কার অঙ্গে দেন, ভাল দ্রব্য ভোজন করেন, এই পর্য্যন্ত জ্ঞান। বিলাস নামে সংসারে যদি কিছু অন্য জিনিস থাকে, বনবালা তাহার ঐটুকু পর্য্যন্তই জানেন। ইহার অধিক বিলাসের কাণ্ডটা তাঁহার আর কিছুমাত্র জানা নাই। বনবালা সর্ব্বদাই প্রসন্নবদনে কথাবার্ত্তা কহেন। বেশীকথা কহেন না,—কিন্তু বদন সর্ব্বদাই সুপ্রসন্ন। এক একবার অত্যন্ত বিরলে বসিলেই সেই প্রসন্নবদনখানি যেন একটু একটু অপ্রসন্ন হয়।

বনবালার বাগানবাড়ী পুড়িয়া গিয়াছে।—বনবালা এখন নিজবাড়ীতেই বাস করিতেছেন। এক একদিন একাকিনী

আপনার শয়নকক্ষের গবাক্ষে বসিয়া বনবালা যেন কি ভাবেন। সেই সময়ে বদনখানি অপ্রসন্ন হয়!—মুখখানি অবনত হইয়া বাম করতলে বিন্যস্ত হইয়া পড়ে!—নয়নদুটী ঈষৎ ঈষৎ নিমীলিত হয়!—সেই নিমীলিত নেত্রে একটু একটু জল দেখা যায়! বনবালা যেন কোন অতীত দুঃখের ভাবনা ভাবেন! নির্জ্জন হইলেই ঐ রকম ভাবনা।—যোগমায়াদেবী দুদিন সেই ভাবনার মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন। কাহাকেও কিছু বলেন নাই। ভাবিয়াছিলেন, মাতাপিতার সন্ধানের জন্যই হয় ত ভাবনা। বনবালা বোবা-কালা ছিলেন, কিছুই ত জানেন না, ভাবেন হয় ত মাতাপিতা পৃথিবীতে রহিয়াছেন, সাক্ষাৎ হইবে। সেই জন্য সেই ভাবনাই হয় ত ভাবেন। প্রকাশ করিলেই গোল হইবে। এই ভাবিয়াই বনবালা আপনার মনের অনুমানটী আর কাহারও কাছে প্রকাশ করেন নাই। বনবালা নির্জ্জন পাইলেই নানাখানা ভাবেন।

একদিন আপনার শয়নকক্ষের গবাক্ষে বসিয়া বনবালা ঐ রকমে আপনার দুঃখের ভাবনা ভাবিতেছেন, চক্ষু দিয়া অল্পঅল্প জল পড়িতেছে, মুখখানি বিমর্ষ হইয়াছে, গবাক্ষপথে উদাস-নয়নে চাহিয়া রহিয়াছেন, অন্যদিকে দৃষ্টি নাই।

ভোগানন্দ প্রবেশ করিলেন। শীঘ্র শীঘ্র আসিতেছিলেন, দ্বারে উপস্থিত হইয়াই দেখিলেন, বনবালা ঐরকম।—চুপিচুপি পাশ কাটাইয়া ভোগানন্দঠাকুর গৃহের অন্য ধারে উপনীত হইলেন। বনবালা কিছুই জানিলেন না। বনবালার মুখে কেহ কখনও গান শুনেন নাই, বনবালা আপনার মনে করুণস্বরে একটী গান ধরিলেন ;—

ললিত।—আড়াঠেকা।

"ফেলিয়ে বিজন বনে, ভুলেছ কি মা আমারে।
কারে দিয়ে গেছ মাগো! তোমার এ বনবালারে!
কারে দিয়ে —"

"আমি লইয়াছি!"—পশ্চাৎ হইতে হাসিতে হাসিতে এই কথা বলিয়া সুরসিক রাজাবাহাদুর করযোড়ে রাজরাণীর সমীপবর্ত্তী হইলেন। মুখ ফিরাইয়া চাহিয়া দেখিয়া বনবালা অপ্রস্তত। ব্যস্তভাবে অশ্রুমার্জ্জন করিয়া বনবালা গবাক্ষ হইতে নামিলেন। তৎক্ষণাৎ বিমর্ষবদনে বেশ হাসি আসিল! বনবালা হাসিতে হাসিতে হস্তবিস্তার করিয়া পতিকে কহিলেন, "বসুন! আপনি যে আজ অসময়ে এখানে?"

না বসিয়াই ভোগানন্দ হাস্য করিয়া ব্যগ্রভাবে কহিলেন, "তোমার প্রশ্ন বুঝিতে পারিলাম না। আমার প্রশ্নের উত্তর কর।—তুমি অমন করিয়া একাকিনী বসিয়া কি ভাবো?"

বনবালা কহিলেন, "আপনি বসুন!—যাহা ভাবি, তাহা বলিব। আপনি জিজ্ঞাসা করেন নাই, এতদিন বলি নাই; এখন জিজ্ঞাসা করিলেন, অবশ্যই নিবেদন করিব। আপনি বসুন!"

ভোগানন্দ পুনর্ব্বার ব্যগ্রভাবে কহিলেন, "না,—না,—না, বসিব না। আমি তোমারে ডাকিতে আসিয়াছি। ও ঘরে একটা বিচার হইতেছে। সদাশিব আছেন, রঞ্জিকা আছেন, যোগী আছেন, আমি আছি, তুমি নাই। তুমি চল। চমৎকার বিচার হইতেছে। আমি তোমারে ডাকিতে আসিয়াছি।"

উৎকলিকাকুল লোচনে উৎফুল্লবদনে বনবালা একটু মধুর হাসিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "চলুন তবে!"

অগ্রে অগ্রে ভোগানন্দঠাকুর, পশ্চাতে বনদেবী বনবালা। অগ্রে অগ্রে সদাশয় সাধু, পশ্চাতে পতিব্রতা-আদর্শ সতী।

ত্রয়োবিংশ কল্প।

বনবালার পুত্র আনয়ন।

সদাশিব মিশ্র ভোগানন্দের অপেক্ষা বয়সে বড়।—ভোগানন্দ তথাপি এক এক সময়ে সদাশিবকে সদাশিব বলিয়া ডাকেন। আপাততঃ সেটা একটু একটু শিষ্টাচারবিরুদ্ধ বোধ হয়। কিন্তু কারণ আছে। সদাশিব মিশ্র এ সংশ্রবে অনেক দিন। ভোগানন্দ যখন শিশু, সেই সময় আত্মানন্দঠাকুর সদাশিবকে আপনার কারবারে একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করেন। অনেক দিন পর্য্যন্ত বিশ্বাসের সহিত কার্য্য করিয়া সদাশিবের সুযশ হয়। বিশ্বাস এবং ঘনিষ্ঠতা, উভয়ই বদ্ধমূল হইয়া উঠে। ভোগানন্দ তখন শিশু। কর্ত্তা সদাশিবকে সদাশিব বলিয়া ডাকেন, শুনিয়া শুনিয়া শিশুও সেই বুলি অভ্যাস করে; সেই অবধি অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, ভোগানন্দ আর সে অভ্যাস ছাড়িতে পারেন নাই। বড় হইয়া অবধি প্রায়ই বন্ধু বন্ধু বলিয়া সম্ভাষণ করেন, [illegible] বালককালের অভ্যাস যায়

কোথায়? মাঝে মাঝে শৈশবের কথা বাহির হইয়া পড়ে। সদাশিবও তাহাতে আমোদ করেন। স্নেহের মুখে,—শিশুর মুখে আর বন্ধুর মুখে নাম ধরিয়া ডাকা বড়ই মিষ্ট লাগে।—আমরা এখানে সে নজীর চালাইতে চাহিতেছি না, ভোগানন্দ মাঝে মাঝে সদাশিবের নাম ধরিয়া ডাকেন, এই পর্য্যন্ত কথা। বেশী আনন্দে, বেশী বিষাদে, বেশী চিন্তায়, বেশী বিস্ময়ে, আর বেশী অন্যমনস্কে, এই পাঁচপ্রকারে সদাশিবের নাম ধরিয়া ডাকাটা আজিও যেন ভোগানন্দের মুখস্থ। এই অভ্যাসটী অত্যন্ত দোষের হইতেছে কি না, যোগমায়ার সভাগৃহে তাহারই বিচার হইতেছে। অন্য একটা বড় বিচারও আছে।

ভোগানন্দের সহিত বনবালা সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন। সকলেই বনবালাকে আদর করিয়া বসাইছেন। আজ আর তিনি সভাপতি নহেন। আজ এক পক্ষে তিনি ন্যায়ান্যায় মীমাংসায় সালিসী-মজলিসে আসামী! সভাপতির আসনে আজ শ্রীমতী মহিষী যোগমায়া সুন্দরী।

বিচার কেবল হাসির কথা মাত্র। সে কথার উত্থাপন হইয়াই কেবল হাস্যের সঙ্গে উপসংহার হইয়া গেল। মূল কথা হইতেছে, তাঁহাদের প্রয়োজন ছিল বনবালাকে [illegible] নূতন প্রকারে কৌতূহল জন্মাইয়া উদ্দেশ্য ছিল, বনবালাকে সেই [illegible]রে আনা।—নির্জ্জন পাইলেই বনবালা ভাবেন, ইহা সকলেই জানিতে পারিয়াছেন। ভাবনার কারণ অবগত হওয়া এবং ভাবনাকারিণীকে অন্য আমোদে অন্যমনস্ক রাখিবার চেষ্টা পাওয়া, উভয়ই প্রথম প্রয়োজন।

যে রাত্রে [illegible] [illegible]র ভয়াবহ ভ্রমণবৃত্তান্ত

বর্ণনা করেন, সেই রাত্রে ম্‌জলিস ভঙ্গের পর রাজা ভোগানন্দ ঠাকুর রাণী যোগমায়ার কাণে কাণে চুপি চুপি যে কথাটী বলিয়াছিলেন, সেইটীই আজ এই নূতন সভার আসল বিচার। সে রাত্রে ভোগানন্দ চুপিচুপি বলিয়াছিলেন, "বনবালার গর্ভ শুনিয়াছিলাম, সন্তান কোথায়?"—বনবালা চুপি চুপি ঘাড় নাড়িয়া বলিয়াছিলেন, "আছে।"—বস্‌,—এই পর্য্যন্ত।

এই কথাটী আজ সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করা হইল। সন্দেহ রাখিয়া জিজ্ঞাসা করা হইল না। কেন না, সে সন্দেহ যোগমায়া দেবী পূর্ব্বেই পতির কর্ণে ভাঙ্গিয়া দিয়া রাখিয়াছেন। পুত্র জন্মিয়াছে, ইহাও স্থির।—পুত্রটী কোথায় আছে, গৃহে আনা হইতেছে না কিজন্য, কাহার কাছে রহিয়াছে, সেইটীই কেবল ভোগানন্দের জানিবার কথা।

বনবালাদেবী হরিণবাড়ীর ফাঁড়ীঘর হইতে হরিণবাড়ীর রাঘবচক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই স্থান হইতেই বরযাত্রের সঙ্গ লইয়া একবার পাটনায় যান। আবার ফিরিয়া আসিয়া রাঘবের বাটীতেই অবস্থান করেন। রাঘবের বাটীতেই বনবালার একটী পুত্রসন্তান হয়। রাঘবচক্রবর্ত্তী নিঃসন্তান ছিলেন। বনবালাকে পাইয়া কন্যাভাবে পালন করিতেন। বনবালার পুত্র হইল, বৃদ্ধ রাঘব সেই আনন্দে কতই অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। তাঁহারা স্ত্রীপুরুষে সেই ছেলেটীকে সূতিকাগার হইতেই পরম স্নেহযত্নে মানুষ করিয়াছেন। বনবালা কেবল স্তনদুগ্ধ দান করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন মাত্র। রাঘবচক্রবর্ত্তীর জীবনে বৈরাগ্য ছিল। বনবালা তাহা দূর করিয়া দিলেন। বনবালা যখন প্রথমদিন রাঘবের বাটীতে

প্রবেশ করেন, তখন বনবালার জীবনেও বৈরাগ্য ছিল। বনবালার পুত্র হইল, উভয়েরই বৈরাগ্য অল্পে অল্পে শিথিল হইয়া আসিল। হরিণবাড়ীর তুল্য কদর্য্য গ্রাম রাঘবচক্রবর্ত্তীর আর ভাল লাগিল না। পাটনায় তাঁহার এক শিষ্য ছিলেন, শিষ্য সপরিবারে কাশীবাস আশ্রয় করিয়া তাঁহায় পাটনার ভদ্রাসনখানি গুরুকে দান করিয়া যান। গুরুদেব রাঘবচক্রবর্ত্তী হরিণবাড়ীর বাড়ী ও জমীজেরাত বিক্রয় করিয়া পাটনায় গিয়া বাস করেন। বনবালা পাটনায় যখন দ্বারকাদাসের উদ্যানভবনে বাস করেন, তখন মধ্যে মধ্যে এক একদিন হাওয়া বদল করিতে যাইতেন। সেই হাওয়া বদলের অর্থ রাঘবচক্রবর্ত্তীর পাটনার আবাসে প্রাণাধিক পুত্রের চন্দ্রমুখ দর্শন। পুত্রকে ফেলিয়া কাঙ্গালিনীবেশে দ্বারকাদাসের উদ্যানের বৃক্ষতলে বনবালার রোদন করা কি প্রকারে সঙ্গত হইয়াছিল?

সঙ্গত হইয়াছিল দুই কারণে।—পাটনায় আসিয়াই পাঁচ মাস পরে রাঘবচক্রবর্ত্তীর মৃত্যু হয়। সংসার অভিভাবকশূন্য। শিষ্যের একজন গোমস্তা সেই বাড়ীতে থাকিত, পুরীর ভিতর পুরুষ বলিতে কেবল সেই ব্যক্তি। ওদিকে বিধবা স্ত্রীলোকের গলগ্রহ হইয়া থাকা, ভাল দেখায় না, একটী নয়, দুটী। পুত্রটীকে কোথাও লইয়া যাইবার স্থান নাই,—ছোট ছেলে, কোথায় থাকে, সুতরাং ছেলেটীকে রাঘবের পত্নীর কাছে রাখিয়া বনবালা নিজে অন্য আশ্রয়ের অন্বেষণে বাহির হন। এইটী হইল প্রথম কারণ।—বনবালা শুনিতে পাইতেন না,—কথা কহিতে পারিতেন না, কিন্তু বুঝিতেন সব। বিধবার গলগ্রহ হইয়া থাকা উচিত নয়, বনবালা এইটী বুঝিলেন। ইহা দুই-

তেই প্রথম কারণের উৎপত্তি।—দ্বিতীয় কারণটী কিঞ্চিৎ নিগূঢ়। বনবালা চিনিয়াছিলেন, দ্বারকাদাসের চেহারা।—বনবালা চিনিয়াছিলেন, দ্বারকাদাসের নিকেতন। কোনপ্রকার চেষ্টায় সেই নিকেতনে আশ্রয় লইতে পারিলে, ভবিষ্যতে সুখের দিনটী ফিরিলেও ফিরিতে পারে, এইটী কল্পনা করিয়াই বনবালাসুন্দরী কাঙ্গালিনীবেশে দ্বারকাদাসের অন্দরের উদ্যানের বকুলতলায় দর্শন দিয়াছিলেন। ছেলেটী রাঘবচক্রবর্ত্তীর পত্নীর নিকটেই প্রতিপালিত হইতেছে।

সভায় মীমাংসা হইল, পুত্রটীকে নিজনিকেতনে আনয়ন করা।—রজনীপ্রভাতেই রাণী বননলিনী, রাণী যোগমায়া, রাণী ভবরঞ্জিকা, সখী শিশিরকুমারী, চারিজনে একসঙ্গে উপযুক্ত লোকজন সমভিব্যাহারে ভিন্ন ভিন্ন শিবিকারোহণে শুভক্ষণে পাটনাযাত্রা করিলেন। শিশিরকুমারী এখন সহচরী। বাস্তবিক সাধারণ পরিচারিকার ন্যায় সহচরী নহে, দ্বারকাদাসের শ্বশুরবংশের সহিত ইহার অতি নিকটসম্পর্ক। অতএব ইহাকেও দ্বারকাদাস সবিশেষ আদরযত্ন করিতেন।

যথাসময়ে বনবালার পুত্রটী পাটলিপুত্র হইতে চম্পানগরের রাজনিকেতনে আনীত হইল। বনবাসিনী বনবালার কুমার এখন রাজকুমার! ধন্য গণকঠাকুর!—ধন্য তোমার গণনা! ধন্য তুমি যোগমায়ার হস্তরেখাদর্শনে রামহরিকে বলিয়াছিলে, "এ মেয়ে সামান্য মেয়ে নয়!—এ মেয়ে রাজরাণী হবে।" ধন্য গণনা!—শুধুমাত্র রাজরাণী হওয়া নয়, যোগমায়াদেবী অপরকেও রাজরাণী করিবার ক্ষমতা রাখেন। রাজরাণী যোগমায়াই প্রকাশ্যরূপে বনবালাসুন্দরীকে নূতন রাজরাণী করিয়া দিলেন।

বনবাসিনী পতিব্রতা বনবালাদেবী নূতন রাজমহিষী হইলেন। বনবালার কুমার এখন রাজকুমার!

পুত্র প্রাপ্ত হইয়া রাজা ভোগানন্দঠাকুর একমাস ব্যাপিয়া মহানন্দে কল্পতরু হইলেন। দীনদুঃখী অনাথ ব্যক্তিরা প্রচুর অপেক্ষাও প্রচুর দানপ্রাপ্ত হইল। রাজপুরী পূর্ণানন্দে পরিপূর্ণ। রাজকুমারের নাম হইল পুষ্পবন্ত। বয়স অষ্টম বর্ষ।

উপসংহার।

সকলদিকে সকলেই সুখী হইলেন।—ভোগানন্দঠাকুর রাজা হইলেন, সহধর্ম্মিণীরা রাজমহিষী হইলেন, অষ্টমবর্ষীয় বালকটী রাজপুত্র হইল। রাজকুমার পুষ্পবন্ত দিনদিন ভাগ্যবন্ত পিতার পুত্রানন্দ পরিবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। কাহারও মনে অসুখ নাই? যাহা কিছু আছে বনবালার!—সে অসুখ শীঘ্র নিবারণের সম্ভাবনা অল্প। কথা উঠিয়া গিয়াছে, বনবালার জননী বজ্রাঘাতে মরিয়াছেন, বনবালার পিতা কাণপুরের গঙ্গায় ডুবিয়া গিয়াছেন! সে কথা এখনও বনবালার কর্ণগোচর হয় নাই। তাঁহাদের মৃতদেহের কোন সন্ধান হইয়াছিল কি না, তাহাও প্রকাশ নাই। বনবালা হয় ত মনে মনে জানিতেছেন, তাঁহারা আছেন। কোথায় আছেন, ঠিক নাই। এজন্মে আর সাক্ষাৎ হইবে না। মৃত্যু শুনিয়া শোক পাওয়া অপেক্ষা এপ্রকার অন্ধকারে থাকাও বড় একটা মন্দ নয়।

বনবালার গর্ভ হইয়াছিল, পুত্র কোথায় গেল, ভোগানন্দের

মনে এ তর্ক অনেকদিন ছিল। এক একবার তিনি ভাবিয়াছিলেন, কলঙ্কের ভয়ে অপরা চঞ্চলা কুলবালারা শীঘ্র যেমন অপক্কগর্ভ গুপ্তভাবে নষ্ট করিয়া ফেলে, বনবালার গর্ভেরও হয় ত কলঙ্কভয়ে সেই দশা হইয়া থাকিবে! ভোগানন্দ যখন ইহা ভাবিতেন, তখনি তাঁহার সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিত!

মহাভারত!—অমন অপবিত্র সন্দেহও ভোগানন্দের তুল্য পবিত্রহৃদয়ে স্থান পাইয়াছিল! জগদীশ্বর ক্ষমা করিবেন, সরলা ধর্ম্মশীলা বনবালার মনে তেমন কল্পনা কখনই স্থান পাইতে পারে না। স্বভাবসরলা বনবালার সেপ্রকার পাপমতি যাহারা কল্পনা করে, তাহারাও ভোগানন্দের ন্যায় কণ্টকিত কলেবরে শিহরিয়া শিহরিয়া উঠে! বনবালার অষ্টমবর্ষীয় কুমার এখন রাজকুমার!—বনবালা আদর্শ সতী!

পতি অন্বেষণের সময় অনেক দুষ্ট পিশাচেরা বনবালার উপর অনেক দৌরাত্ম্য করিয়াছিল। পাপীলোক যদি শীঘ্র না মরে, তবে তাহারা এখনও পৃথিবীর পাপের পথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরিতেছে। তাহারা এখন বনবালার ছায়া পর্য্যন্ত দর্শন করিবারও সুবিধা পায় না। মুসলমান মিস্ত্রীরা হিন্দুর দেবালয় নির্ম্মাণ করিয়া দেয়, কিন্তু দেবস্থাপনের পর সে মন্দিরে আর তাহারা প্রবেশ করিতে পারে না। বনবালার অধিষ্ঠানে ভোগানন্দের অন্তঃপুর এখন এক প্রকার দেবালয়।—যোগমায়ার অধিষ্ঠানেও দেবালয়।—জ্যেষ্ঠামহিষী ভবরঞ্জিকাদেবীও সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী দেবীপ্রতিমা!

যোগমায়াদেবী সকলের নিকট সকল বিষয়ে যশস্বিনী হইয়াছেন। সকলের মুখেই যোগমায়ার যশোগান।—মানুষের

উপকারে, গরিবের কষ্টমোচনে, শোকার্ত্তের সান্ত্বনায়, অর্থীকে অর্থবিতরণে. যোগমায়াদেবীর অনুপম আনন্দ!—সে আনন্দ উপভোগে আনন্দময়ী যোগমায়া সর্ব্বদাই অধিকারিণী হইলেন। যোগমায়া যখন রাণী হন নাই, তখনও অবধি পরোপকার ইঁহার নিত্যব্রত।—যোগমায়ার যখন বিবাহ হয় নাই, বয়স যখন সপ্তম বর্ষ, সেই সময় নবাব রামহরির বাটীতে একজন ভিকারী আইসে। শীতকাল।—ভিকারীর অঙ্গে শীতবস্ত্র ছিল না। বালিকা যোগমায়া আপন হস্তের দুগাছি স্বর্ণবালা খুলিয়া ভিকারীকে শীতবস্ত্র কিনিতে দিয়াছিলেন! যোগমায়ার গুণের উপমা বিরল। ভোগানন্দের সংসারটীও তেমনি সুখের! জ্যেষ্ঠাকনিষ্ঠা মহিষী দুটীও সংসারের লক্ষ্মীস্বরূপিণী!

সদাশিব মিশ্র মধ্যে মধ্যে নবদ্বীপে আসেন, মধ্যে মধ্যে চম্পানগরে যান। তিনিও বন্ধুর সুখে সর্ব্বপ্রকারে সুখী হইলেন। পূর্ব্বে তিনি ভোগানন্দের পিতার কর্ম্মচারী ছিলেন, এখন আর কর্ম্ম করেন না, কিন্তু পূর্ব্বমত মাসে মাসে খরচপত্র প্রাপ্ত হন। যখন যাহা অপ্রতুল হয়, ভোগানন্দ মানসানন্দে তৎক্ষণাৎ তাহা প্রদান করেন।

এইখানে আর একটী কথা।—যোগমায়াদেবী প্রথমদিন ভোগানন্দকে বলিয়াছিলেন, "বনবালা রাজার মেয়ে!—যোগমায়া একথা কিপ্রকারে জানিয়াছিলেন?—কে যে বনবালার পিতা কে যে বনবালার মাতা, এপর্য্যন্ত কেহই তাহা বলেন নাই। যোগমায়া তবে কিপ্রকারে জানিলেন?

বনবালার [illegible] একখানি তাম্রকবচ বাঁধা ছিল। ভোরশাহনী [illegible] একদিন সেই কবচখানি কোথায়

খসিয়া পড়িয়া যায়। উদ্যানের সরোবরের ঘাটে যোগমায়া সেইটী কুড়াইয়া পান।—কবচখানিও পুরাতন হওয়াতে তাহার এক মুখ ফাঁক হইয়াছিল। যোগমায়া দেখেন, তাহার মধ্যে এক খণ্ড ক্ষুদ্র কাগজ। আগ্রহে আগ্রহে যোগমায়া সেই কাগজখানি গৃহে লইয়া গিয়া গোপনে পড়িয়া দেখেন। তাহাতে লেখা ছিল, "কন্যারাশি, নরগণ, বন-মল্লিনী।—পিতার নাম রাজা মৃত্যুঞ্জয়।—গর্ভধারিণী জননীর নাম রাণী মহাদুর্গা। বসতি ৺ বৃন্দাবনধাম।"

যোগমায়া সেই কবচখানি সদাশিবকে দেখাইয়াছিলেন। আশ্চর্য্য সঙ্ঘটনে সেই রাজা মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে সদাশিবের পরিচয় ছিল। তিনি তাঁহাদের ইতিহাস জানেন। ভারতীয় রহস্যের এ খণ্ডে সে ইতিহাসের স্থান নাই।

রাঘব চক্রবর্ত্তীর মৃত্যু হইয়াছে। বনবালা যেদিন পুত্র আনিতে যান, সেদিন সকলে মিলিয়া রাঘবের ধর্ম্মপত্নীকে এক শত স্বর্ণমুদ্রা প্রণামী দিয়া আসিয়াছেন। রাজা ভোগানন্দ তাহাই পর্য্যাপ্ত বিবেচনা না করিয়া, আর এক কাজ করিলেন। যে বাটীতে চক্রবর্ত্তীমহাশয়ের গৃহিণী বাস করিতেছিলেন, অন্য কোন সদভিপ্রায়ে ভোগানন্দ স্বয়ং মাসিক ত্রিশ টাকা ভাড়ায় সেই বাড়ীখানি পাঁচ বৎসরের জন্য পাট্টা লইলেন। ভোগানন্দের সাধুতা বিস্ময়। ব্রাহ্মণের গৃহিণীকে আপন বাটীতে আনিয়া রাজা ভোগানন্দঠাকুর বৃদ্ধা মাতার ন্যায় সেবাভক্তি করিতে লাগিলেন। মহিষীরাও সমান ভক্তিমতী।'

রাজা ভোগানন্দ একদিন নগরভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন, পথে একটী লোকের সঙ্গে তাঁহার [illegible]। সেই

লোক তাঁহার কাছে অত্যন্ত কষ্ট জানায়। দয়াপরবশ হইয়া ভোগানন্দ তাহাকে বাটীতে লইয়া যান।—দয়াপরবশ হইয়া প্রচুর মিষ্টান্ন ভোজন করান, বস্ত্র দান করেন, পাঁচসাত দশদিন রীতিমত অন্নদান করিয়া বাটীতে স্থান দেন। সেই লোক এক দিন ভোগানন্দের তোষাখানা হইতে সহস্রমুদ্রা মূল্যের জহরাৎ চুরী করিয়া গোপনে রাত্রিকালে বাটী হইতে পলায়ন করিতেছিল, একজন দাসী তাহাকে ধরে। সে রাত্রে বেশী গোলযোগ হয় নাই, পরদিন প্রাতঃকালে ভোগানন্দ তাহার চৌর্য্য অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহাকে বাটী হইতে বিদায় করিবার সংকল্প করেন। কথাটা অন্তঃপুরেও প্রচার হইয়া পড়ে। রাণীরা চোরটাকে দেখিতে চান।

কোথাকার ঘটনা কোথায় দাঁড়ায়, আগে থাকিতে প্রায় কেহই তাহা বুঝিতে পারে না। রাজা ভোগানন্দের মহিষীরা অন্দরের গবাক্ষপথ দিয়া সেই জহর-চোরকে দর্শন করিলেন। তিনটী মহিষীর মধ্যে মহিষী বনবালা জহরচোরের প্রতি এক দৃষ্টে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। যোগমায়াদেবী বনবালার ভাবভঙ্গী কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, বিস্মিত নিস্তব্ধ-ভাবে বনবালার পানেই চাহিয়া রহিলেন। বনবালা কেবল নির্নিমেষে জহরচোর দর্শন করিতেছেন। মন তর্কিল! কলেবর শিহরিল!—আপনার মনেই বনবালা চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ঐ সেই!"

আরও বিস্ময়ে অধীরা হইয়া যোগমায়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে সেই?—কে সে?—কোথায়?"

বনবালা [illegible] লেন, যোগমায়ার বিস্ময়। নিজেও

মনে মনে বিস্ময় মানিতেছেন। উত্তর করিতেছেন না। যোগমায়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাহার কথা?"

বনবালা ভাবিয়া ভাবিয়া অন্যমনস্কভাবে উত্তর করিলেন, "লোকটাকে যেন কোথাও দেখিয়াছি!"

যোগমায়া কহিলেন, "দেবি! তোমার দেখা আশ্চর্য্য কি? সাত দেশের সাত হাজার ব্যাপারীর কাণ কাটো তুমি!—দেবি! এই বয়সে যত দেশ তুমি ভ্রমণ করিয়াছ, আমরা তাহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারি না! তুমি ত চিনিবেই!—বল তো দিদি! কোথায় দেখেছ?—লোকটা কে?—কোথাকার মানুষ?"

লোকটার বয়স কিছু বেশী নয়। অনুমানে ত্রিশ বৎসরের অধিক বোধ হয় না। বনবালা আবার তাহাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দর্শন করিলেন। চঞ্চল হইয়া যোগমায়াকে কহিলেন, "কাছে আনিয়া দেখিব! লোকটাকে ধরিতে বল!—আটক্ করিতে বল! আমি উহাকে চিনি!—আমি উহার চেহারা চিনিয়াছি! বল,—শীঘ্র বলিয়া পাঠাও! লোকটা যেন পালায় না!"

যোগমায়া হাস্য করিয়া কহিলেন, "পালাবে কি?—চোর! বাঘে ধরিয়াছে!—রাজা যদি ছাড়িয়া দেন, বাঘেরা ছাড়িবে না!—তুমি অমন করিতেছ কেন?—পালাবে কি?—বাঘেরা ছাড়িবে না! তাহাতে আবার তোমার হুকুম!"

হুকুম তৎক্ষণাৎ রাজদরবারে পৌঁছিল। রাজা স্বয়ং একজন দ্বারপালের সহিত সেই জহরচোরকে লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। চোর গিয়া রাণীদের সম্মুখভাগে দাঁড়াইল। মহিষীরা তিনজনেই তাহার বিকৃত চক্ষু দর্শনে একটু একটু ভয় পাইয়া, একটু একটু পশ্চাতে সরিয়া দাঁড়াইলেন।

তিনজনেই সেই লোকটাকে দেখিলেন। বেশ দেখা হইল। বনবালার দেখাই আসল দেখা।

আরও অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া বনবালা তাহাকে স্পষ্টই চিনিয়া ফেলিলেন। সবিস্ময়ে উচ্চকণ্ঠে কহিলেন, "চিনিয়াছি! চিনিয়াছি !!—চিনিয়াছি !!!"

ভোগানন্দ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "চিনিয়াছ? তুমি?—তুমি ইহাকে চিনিয়াছ?—কে এ?"

পতির প্রশ্নে উত্তর প্রদান না করিয়াই বনবালাদেবী একটু হাস্য করিলেন।—হাস্য করিয়াই বক্রভাবে চোরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমাকে চিনিতে পার?"

চোর উত্তর করিল না। বনবালা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথাও কোন দলীলের কথা তোমার মনে পড়ে?"

চোরটা ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। বনবালা কহিলেন, "বাঘের মতন জ্বলন্ত নয়নে দর্শন করিতেছ, তথাপি চিনিতে পারিতেছ না?"

তথাপি চোর উত্তর দিল না!

পাঠকমহাশয়! জানিয়া রাখুন, এই চোর সেই হুগলী-জেলার হরিণবাড়ীর তরুণবাবু।—এই ব্যক্তিই কাঁচা ঘুমে উঠিয়া গিয়া হরিণবাড়ীর ফাঁড়ীঘরে বনবালার দলীল পড়িয়া দিয়াছিল। এখন সেই তরুণবাবু এই চম্পানগরীতে উপস্থিত। বনবালা তাহাকে দেখিবামাত্র চিনিয়াছেন। হরিণবাড়ীর ফাঁড়ীতে এই ব্যক্তি যখন ফাঁড়ীদারের কাছে দলীল পড়ে, বাক্যহীনা বনবালা তৎকালে ইহার প্রতি ঘন ঘন কটাক্ষপাত করিয়াছিলেন। সে কটাক্ষপাতের কারণ কি?—কারণ অনেক।

জহরচোরকে পুনঃ পুন সম্বোধন করিয়া বনবালা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন "দলীলের কথা তোমার মনে পড়ে ?"

লোকটা থতমত খাইয়া গেল। একদৃষ্টে কট্ মট্ করিয়া বনবালার মুখপানে চাহিয়া রহিল। সকল লোকেই বিস্ময়াপন্ন! স্বয়ং রাজাও বিস্ময়াপন্ন! যোগমায়া এবং ভবরঞ্জিকা কিছুই বুঝিলেন না। একবার বনবালার প্রতি, দ্বিতীয়বার সেই জুয়া-চোরের প্রতি নেত্রসঞ্চালন করিতে লাগিলেন মাত্র।

চোরকে সম্বোধন করিয়া বনবালা পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসিলেন, "আচ্ছা, সে কথা মনে না পড়ে, অন্যকথা বল। প্রয়াগধামে তুমি কখনো গিয়াছিলে ?"

চোর যেন আরও অধিক ভয় পাইয়া, আরও অধিক সন্দেহ টানিয়া,সচঞ্চল নয়নে ঘনঘন ইতস্তত দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। কপাল হইতে উদর পর্য্যন্ত অনবরত ঘাম ঝরিতে লাগিল! চোরের মুখে একটীও বাক্য নাই! শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন, চোরেরা ভারি বুদ্ধিমান হয়! সংসারতত্ত্বে অভিজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলিয়া গিয়াছেন, চোরের বল কেবল মিথ্যাকথা! এ চোরটা সত্যকথাও বলে না, মিথ্যাকথাও বলে না, কিছুই বলে না!

রাজা ভোগানন্দঠাকুর বনবালাকে কহিলেন,"ইহাকে বিচারে সমর্পণ করা যাক্।" বনবালা কহিলেন, "আমিই বিচার করিব। আমিই ইহাকে চিনি, এই লোক প্রয়াগধামে আমার পুঁটুলী চুরি করিয়াছিল! যেদিন আমি প্রয়াগে প্রথম উপস্থিত হই, সেই দিন এই ব্যক্তি আমারে প্রথম দেখিতে পায়। তখন আমি কথা কহিতে পারিতাম না। লোকটা আমারে নূতন বাসা দিবে বলিয়া সঙ্কেতে সঙ্কেতে একখানা খালীবাড়ীতে লইয়া

যায়। তাহার পরেই ঠকায়! চোর কি না, দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিল, আমারে ঠকাইয়া লওয়া বড়ই সহজ! কাজেও তাহাই করিয়াছিল! অযোধ্যার রাখালবালক নহবৎলালের হস্তে আপনি আমারে যে কটী মোহর পাঠাইয়াছিলেন, তাহার একটীমাত্র আমার খরচ হয়, বাকী সমস্তই সেই পুঁটুলীতে ছিল, বস্ত্রাদিও ছিল। ভাগ্যে ভাগ্যে আমার মূলাধার পত্রিকা দুখানি অঞ্চলে বাঁধিয়া রাখিতাম।—তাহাতেই রক্ষা হইয়াছে। নতুবা এতদিনে কবে আমি মরিয়া যাইতাম! এ শুভদিন এজন্মে আর আমারে দেখিতে হইত না! এই সেই জুয়াচোর!

রাজা ভোগানন্দ কহিলেন, "এই সেই জুয়াচোর! ইহাকে তবে কিপ্রকার দণ্ডদান করা তোমার ইচ্ছা?" বনবালা উত্তর করিলেন, "দণ্ড দিবার ক্ষমতা আমার হাতে নয়, যাহা যাহা আমার লইয়াছে, এব্যক্তি যদি তাহা ফিরাইয়া দেয়, আর কথনো কাহারও কিছু চুরী অথবা জুয়াচুরী করিয়া না লয়; এমন যদি জামীন দিতে পারে, তাহা হইলে ——"

জুয়াচোরটা রাজা ভোগানন্দের পায়ে জড়াইয়া ধরিল। ভোগানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুই, নাম কি, কোথায় থাকিস্, কাহার কত চুরী করিয়াছিস্, সব কথা যদি আমার কাছে কবুল করিস, আর কখনও তেমন কাজ করিব না বলিয়া যদি সহস্তে মাপিয়া সাত হাত নাকেখৎ দিস্, আমার এই মহিষীর যাহা চুরী করিয়াছিস্, তাহা যদি ফিরাইয়া দিস্, তবেই ত দেখি তোর পরিত্রাণ; নতুবা—"

জুয়াচোরটা কাঁদিয়া ফেলিল। এপ্রকার মায়াবী লোকের ক্রন্দনটা সর্ব্বক্ষণ মুখাইয়া থাকে। সেপ্রকার ছলের রোদন

অনেকস্থলে অনেকেই দর্শন করিয়াছেন। সেটা আরও পাকা রকম জুয়াচুরীর ভূমিকা! সেপ্রকার মায়াকান্নায় যাঁহারা ভোলে, তাহারাই ঠকে। বনবালা তাহার নাম জানিতেন না। ফাঁড়ীঘরে নাম প্রকাশ পাইয়াছিল, কিন্তু বনবালার তখন শ্রবণ-শক্তি ছিল না। আরও একটা ভয়ানক কথা! লোকটা যখন সেই রাত্রিকালে হরিণবাড়ীর ফাঁড়ীঘরে ফাঁড়ীদারের কাছে প্রথম দাঁড়ায়, তৎকালে বনবালা নতমুখী ছিলেন। নতমুখেও একটু একটু কটাক্ষ ছিল, তাহাতেই তিনি দেখেন, ঐ লোকটা তাঁহার প্রতি দুষ্টকটাক্ষ সন্ধান করিতে ভুলে নাই। প্রয়াগের চেনা চোর ভাবিয়া, দলীলপড়ার সময় বনবালাও তাহার প্রতি সভয় সতৃষ্ণনয়নে ঘনঘন চাহিয়াছিলেন। বনবালা যখন রাঘবচক্রবর্ত্তীর বাটীতে, তখনও এই লোকটা দুষ্টঅভিপ্রায়ে রাঘবের বাটীর চতুর্দ্দিকে গীত গাইয়া বেড়াইত! বনবালা ইহা জানিতেন না। রাঘবের পত্নীর মুখে শেষকালে উহা প্রকাশ পাইয়াছিল। বনবালা যাহা যাহা জানিতেন, তাহা যোগমায়াকে বলিয়াছিলেন, যে ভাবটী বুঝিতে পারেন নাই, তাহা কেবল বনবালার মনেই ছিল। এখন প্রকাশ হইয়া পড়িল।

লোকটার নাম তরুণবাবু। নবাবী আমলের শেষকালটায় এদেশে বাবুচোর, বাবু জুয়াচোর বিদ্যমান ছিল, ইহা শুনা যায়, কিন্তু এখন যত বেশী হইয়াছে, এতটা ছিল না। তরুণবাবু পূর্ব্বে এলাহাবাদে চাকুরী করিত, মাসে আটদশটাকা রোজগার ছিল, বাকী রোজগার কেবল চুরীতে আর জুয়াচুরীতে!

রাজা ভোগানন্দঠাকুর সমস্ত পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া সেই জুয়াচোরকে পুনর্ব্বার সদরমহলে লইয়া গেলেন। আজ্ঞামাত্র

তাঁহার অনুচরেরা সেই চোরটাকে পিছমোড়া করিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। একদিন একরাত্রি পরেই থানায় চালান। এস্থলে তরুণবাবুর এমন পরিণাম কেন হইল, তাহা কেহ জিজ্ঞাসা করিবেন না। পূর্ব্বেই প্রকাশ পাইয়াছে, সেই মুসলমান ফাঁড়ীদারের সঙ্গে এই লোকটার বড়ই সম্প্রীত ছিল। দেশের পুলিসপ্রসঙ্গেই আমরা বলিয়াছি, দস্যুতস্করাদি বদ্‌মাস্‌লোকের সঙ্গে অনেক পুলিস-আম্‌লার বাছা বাছা গোপনীয় বন্দোবস্তে বিলক্ষণ গা-শোঁকাশুঁকি থাকে। দৃষ্টান্তও অনেক। বনবালা তাঁহার একটীমাত্র দেখাইলেন। এই পর্য্যন্ত তরুণবাবুর জুয়াচুরির উপসংহার।

পাঁচসাতদিন গেল। একদিন রাজা ভোগানন্দ প্রকাশ্যরূপে কাছারী করিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় দুইজন ভিক্ষুক আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহাদের মধ্যে একজনের নাম দুর্লভ, এক জনের নাম গোবর্দ্ধন। একটু চিন্তা করিলেই পাঠকমহাশয় ইহাদিগকে চিনিতে পারিবেন। বর্দ্ধমানে ইহারা নরোত্তম হালদারের পিতৃশ্রাদ্ধের কাঙালী হইয়াছিল। দ্বারকা-দাসের বন্ধু জটাধর,—আসল নামে রাজা ভোগানন্দের প্রিয়বন্ধু সদাশিব মিশ্র বর্দ্ধমানে এই দুই বদ্‌মাস ভিক্ষুকের আগাগোড়া পরিচয় পাইয়াছিলেন। যে লোকটা হুগলী জেলার হরিণবাড়ী গ্রামে নবাব রামহরি সাজিয়াছিল,—নবাব রামহরি সাজিয়া যে লোকটা আপনাকে যোগমায়াদেবীর পিতা বলিয়া পরিচয় দিত, এই সেই গোবর্দ্ধন। দ্বিতীয় লোকটা হরিণবাড়ীর জবরদস্ত দলপতি বিশ্বদুর্লভ চৌধুরী।

যোগমায়া জানিতেন না, রামহরির নাম গোবর্দ্ধন। যখন

তিনি শুনিলেন, ঐ ভিখারীদের মধ্যে একজন সেই রামহরি, যাহার গৃহে, যাহার আশ্রয়ে, বিবাহকাল পর্য্যন্ত স্নেহযত্নে প্রতি-পালিতা হইয়াছেন, দয়াময়ী যখন শুনিলেন, সেই আশ্রয়দাতা রামহরিই এই গোবর্দ্ধন, তখন তাহাকে কাছে ডাকিয়া লইয়া বিস্তর দুঃখ প্রকাশ করিলেন। স্বামীর চক্ষের উপরেই তখন যোগমায়ার চক্ষে জল পড়িল। স্বামীও জানিতেন, রামহরি নামে ঐ ব্যক্তি তাঁহার শ্বশুর বলিয়া পরিচিত। পরিচয় শুনিয়া ঘৃণা হইল বটে, তথাপি দয়া হইল। নিজেরও দয়া, তাহার উপর যোগমায়ার অনুরোধ। রাজা ভোগানন্দ সেই ভিখারী গোবর্দ্ধনকে আপনার অতিথিশালায় স্থান দিলেন। লোকটা যে কটাদিন বাঁচে, বিশেষ কষ্ট না পায়, তাহারও উপায় করিয়া দিলেন। বিশ্বদুর্ল্লভ চৌধুরীকে নগদ পঞ্চাশটী টাকা দান করিয়া বিদায় করিলেন। বিশ্বদুর্ল্লভ অন্ধ হইয়াছিল। ডাকাতেরা মশালের আগুনে তাহার পাপচক্ষু পোড়াইয়া দিয়াছিল। এ কথাও পূর্ব্বে প্রকাশ পাইয়াছে। রাজদত্ত ভিক্ষার পঞ্চাশটী টাকা লইয়া, অভাগা দুর্ল্লভ চৌধুরী রাস্তায় বাহির হইয়া, একটা বৃক্ষতলে বসিল। ইতিপূর্ব্বে দুইতিনদিনের উপবাস, শরীর অত্যন্ত অবসন্ন, বৃক্ষতলেই শুইয়া পড়িল। আর বেশীক্ষণ বাঁচিতে হইল না। দেহের অবসাদে ক্ষণকাল ধনুষ্টঙ্কার রোগীর ন্যায় হাতপা খেঁচিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুম আর ভাঙ্গিল না। এ জন্মে আর জাগিল না।

গোবর্দ্ধন অতিথিশালায়।—একমাস দুইমাস তিনমাস গেল, গোবর্দ্ধনের আহারাদির বন্দোবস্ত খুব ভাল। কিন্তু অদৃষ্টই মূল। ভিখারী হইয়া অবধি গোবর্দ্ধনের পেটে মাসের মধ্যে প্রায় তিন

সপ্তাহ অন্ন জুড়ে নাই! মরা নাড়ী! তাহার উপর নিত্যনিত্য রাজার অতিথিশালার গুরুপাক দ্রব্য ভোজন করিয়া গোবর্দ্ধনের পেট ফুলিয়া উঠিল। হাঁইফাঁই করে, নিশ্বাস ফেলিতে পারে না! পেট ছাড়িয়া দিল! নূতন প্রকার ওলাউঠা! একরাত্রেই গোবর্দ্ধনের রক্তজল! প্রস্রাব করিতে উঠিবার সময় হোঁচট খাইয়া দ্বারের চৌকাটের উপর পড়িয়া গেল। সেই পতনেই দুরাচার মেয়েচোর ধূর্ত্ত গণক গোবর্দ্ধন আচার্য্যের জন্মশোধ জীবনের যবনিকা পতন!

রাজা ভোগানন্দঠাকুর তিনটী মহিষী লইয়া পরমসুখে ঐশ্বর্য্যভোগ করিতে লাগিলেন। পুত্রকে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া ধর্ম্মাত্মা আত্মানন্দঠাকুর সস্ত্রীক কাশীবাসী হইলেন। রাজা ভোগানন্দ এদিকে সর্ব্বেশ্বর হইয়া প্রতিনিয়তই দানধ্যানাদি নানা পুণ্যকর্ম্মে সংসারক্ষেত্রে দিন দিন অধিকতর যশস্বী হইতে লাগিলেন। তিনটী মহিষীর মধ্যে যাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন, আহ্লাদপূর্ব্বক আদর করিয়া তাঁহাকেই তখনি স্নেহভরে হাসিয়া সম্বোধন করেন, "তুমি আমার মহিষী!"

আত্মানন্দঠাকুর কাশীবাসী হইলে পর রাজা ভোগানন্দ একদিন তিনটী মহিষীকে সমভিব্যাহারে লইয়া কাশীধামে যাত্রা করেন। বারাণসীতে তিনদিন তিনরাত্রি অবস্থানপূর্ব্বক অন্নপূর্ণাবিশ্বেশ্বর দর্শন করিয়া রাজা ভোগানন্দঠাকুর অযোধ্যায় যাত্রা করিলেন। সঙ্গে কেবল বনবালা।

বনবালার সঙ্গে ভোগানন্দ আবার অযোধ্যাপুরীতে কি নিমিত্ত গমন করিলেন, এ প্রশ্নের উত্তর বোধ হয় একান্ত আবশ্যক হইবে না। ভোগানন্দের হৃদয় চিরদিন ধর্ম্মমার্জ্জনে সুপবিত্র।

তাদৃশ হৃদয়েই কৃতজ্ঞতার চিরবাস। অযোধ্যার রাখা বালক নহবৎলাল এবং মুদিখানার জটাইদিদি অভাগি বনবালার অনেক উপকার করিয়াছে। ভোগানন্দ উপকার ভুলেন নাই। উপকার ভুলিবার লোক তি ছিলেন না।

বনবালাকে সঙ্গে করিয়া রাজা ভোগানন্দঠাকুর অযোধ্যা উপস্থিত হইলেন। জটাইদিদির মুদিখানায় গেলে জটাইদিদির সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল না। জটাইদিদি অযোধ্যা নাই। পৃথিবীতেই নাই! জটাইদিদি মরিয়াছে! এ সংবাদে বনবালা অত্যন্ত কাতরা হইলেন। রাজাও উত্তরী বসনে পুনঃপুন অশ্রুমার্জ্জন করিলেন। আর অযোধ্যা থাকিলেন না। উপকারী বালক নহবৎলালকে সঙ্গে লই পুনর্ব্বার তিনি বারাণসীধামে উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে পিতৃদেবের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক মহিষীগণের সহিত স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। নহবৎলাল রাজবাটীতেই স্থান পাইল তাহার আর কিছুমাত্র কষ্ট রহিল না।

পিয়ারবাণুদেবী পাটনায় নাই। তাঁহার অসাধারণ মমতা অসাধারণ বদান্যতা, আর অসাধারণ মনস্বিতা তাঁহাতেই রহিয়া গেল। যে রাত্রে বনবালা একাকিনী বালক সাজিয়া, বৃষ্টিতে ভিজিয়া, পিয়ারবাণুর বাটীতে আশ্রয় পান, অশ্বারোহী কর্ত্তা সে রাত্রে বাহির হইতে একটী স্ত্রীলোকের নাম ধরিয়া ডাকিয়াছিল। সে স্ত্রীলোক ঐ বাড়ীর ধাত্রী। সে তখন কার্য্যান্তরে বাহিরে ছিল, সুতরাং পিয়ারবাণু স্বয়ং আসিয়া দরজা খুলিয়াছিলেন। পিয়ারবাণুর আসল পরিচয় এ পুস্তকে

নাই। ফলে তিনি অতি দয়াবতী মহিলা। সকলেই প্রার্থনা করেন, তাঁহার মঙ্গল হউক।

পাঠকমহাশয়! আর অধিক অগ্রসর হওয়া নিষ্প্রয়োজন। সাধুপথের পুরস্কার, পাপপথের দণ্ড, এই সংসারে কেমন হয়, এই ক্ষুদ্র আখ্যায়িকায় তাহার কেবল একটী ক্ষুদ্র ছবিই প্রদর্শন করা হইল। ক্ষমা করিবেন, এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় হয় ত আপনাদের চিত্তরঞ্জন করিতে পারিলাম না। এই আখ্যায়িকার সঙ্গে যে যে স্থলে যে যে লোকের সংস্রব, তাহারা সকলেই যথাপ্রাপ্য মিষ্টতিক্ত ফলভোগ করিল। নির্ব্বিরোধে সুখী ভোগানন্দঠাকুর।

পাঠকমহাশয়! এই বার শেষ দর্শন। সুখময় চম্পানগরেই সুখময় শুভসন্দর্শন। রাজা ভোগানন্দঠাকুর তিনটী মহিষীকে সাদরসম্ভাষণে কহিলেন, "ভবরঙ্গিকা! প্রিয়তমে! তুমি আমার মহিষী!—দেবী যোগমায়া! তোমার কৃপাতেই আমি রাজা। প্রাণাধিকে! তুমি আমার মহিষী!—বনমালিনী বনবালা! জীবনতোষিণি! পতিব্রতে! তুমিই আমার মহিষী!"

সম্পূর্ণ।